ভারতবর্ষ

মাঘ—১৩৪২

দ্বিতীয় খণ্ড	ত্রয়োবিংশ বর্ষ	দ্বিতীয় সংখ্যা

জৈমিনির ধর্ম্ম-মীমাংসা

শ্রীসূর্য্যকুমার তর্কসরস্বতী

মীমাংসা দর্শনের ১ম অধ্যায়ের ১ম পাদে প্রধানতঃ ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা, ধর্ম্মের লক্ষণ ও তাহার প্রামাণ্যকল্পে শব্দ এবং বেদের অপৌরুষেয়ত্ব নির্ণীত হইয়াছে। সেই অপৌরুষেয় শব্দ—বেদ, যজ্ঞকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড এই দুইভাগে বিভক্ত। যজ্ঞকাণ্ড ধর্ম্মতত্ত্ব, আর জ্ঞানকাণ্ড ব্রহ্মতত্ত্ব। ধর্ম্মতত্ত্ব-অজ্ঞাতসার মানব ব্রহ্মতত্ত্বের অধিকারী হইতে পারিবে না বিবেচনায় মহামুনি জৈমিনি পূর্ব্বে এই দর্শনে ধর্ম্মতত্ত্বের মীমাংসা করেন। সুতরাং এই শাস্ত্র পূর্ব্ব-মীমাংসা, ধর্ম্ম-মীমাংসা, কর্ম্ম-মীমাংসা, যজ্ঞবিদ্যা ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ।

ত্রিকালজ্ঞ জৈমিনি যখন বুঝিতে পারিলেন যে, শাস্ত্রে অধিকারী ভেদে যে সকল ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে, তাহা বেদ-বিহিত যজ্ঞধর্ম্মের লক্ষ্য, তখনই তিনি চোদনা-(প্রবৃত্তি) মূলক যজ্ঞানুষ্ঠানকে ধর্ম্ম নামে অভিহিত করেন এবং ভাষ্যকারও "যজ্ঞেন যজ্ঞ ময়জন্ত দেবাস্তানিধর্ম্মানি প্রথমান্যাসন্" এই উক্তি দ্বারা তাহা সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকারের ধারণা এই "ধৃ + মনিন্ ধর্ম্ম, তাহার অর্থ ধারণ। ধর্ম্ম যাগযজ্ঞই তখন মানবদিগকে ধারণ করিতে পারিত; যজ্ঞেশ্বরের উদ্দেশ্যে অগ্নিমুখে প্রদত্ত ঘৃতাদি মেঘাকারে পরিণত হইয়া মর্ত্ত্যজগতে বর্ষিত হইত ও তদুৎপন্ন শস্যাদি তখন জীবজগৎকে বাঁচাইয়া রাখিত (১)। সুতরাং সেই যজ্ঞানুষ্ঠানই মানবের আদি ধর্ম্ম।"

ত্রেতাযুগেও বেদ বা বৈদিক যাগযজ্ঞাদিতে মানবের আস্থা ছিল। এমন কি, লঙ্কেশ্বর রাবণকেও তখন বৈদিক ভাষ্য করিতে দেখা যায় (২)। তাই যাগযজ্ঞাদির সভ্যতা

(১) অগ্নৌ প্রাপ্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥
মৈত্র্যুপনিষৎ।

(২) পদচ্ছেদাদিনা বেদা ব্যাখ্যাতা রাবণাদিভিঃ।
যাস্কাদিভির্নিরুক্তাদ্যৈরঙ্গৈর্নীতাশ্চসাঙ্গতাম্॥
প্রশস্তপাদভাষ্যধৃত দেবীপুরাণ।
বিদিত্বা বেদার্থং দশবদনবাণী পরিগতম্।
পরমার্থ প্রপা, গীতাটিপ্পনী।

যে অতি প্রাচীন, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত এবং পরবর্ত্তীকালে সময় ও অবস্থা ভেদে ধর্ম্মের যে সকল প্রকার ভেদ হইয়াছে, তাহাও যজ্ঞান্ত নামে ব্যবহৃত থাকিয়া আজও সেই প্রাচীন সভ্যতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে; যেমন—পঞ্চ যজ্ঞ, পিতৃ-যজ্ঞ, ভূত-যজ্ঞ ইত্যাদি (৩)।

বেদোক্ত ধর্ম্ম—যজ্ঞ। বৈদিকযুগের মানবেরা ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু ও বরুণ দেবের উপাসনা করিতেন। সেই ধর্ম্মপদ্ধতিকে ইন্দ্র যজ্ঞ, অগ্নি যজ্ঞ ও বরুণ যজ্ঞ বলা হইত। সেই যজ্ঞানুষ্ঠানের কিছুকাল যাইতে না যাইতেই তখনকার এক অযাজ্ঞিক সম্প্রদায় বলিতে আরম্ভ করেন যে "পশু মারিয়া অগ্নিতে দিলে যদি সেই পশু স্বর্গে যায়, তাহা হইলে যজমান নিজ পিতাকে মারিয়া কেন স্বর্গে প্রেরণ না করেন (৪)? কাজেই যাগযজ্ঞ ধর্ম্ম নহে।" এই প্রকার অপসিদ্ধান্তে মানবীয় চিত্তের ধারণা বিলুপ্ত-প্রায় হওয়ায় আর যখন যজ্ঞাদির ফল প্রত্যক্ষ হইত না, তখনই সমাজে শ্রুত্যুক্ত ধর্ম্মের প্রচলন হয়।

শ্রুত্যুক্ত ধর্ম্ম—ব্রহ্মযজ্ঞ। আদি সৃষ্টিতে মানবের দৃষ্টি অন্তর্ম্মুখী থাকায় তাঁহারা বেদের উপদেশ যেমন সহজে ধারণা করিতে পারিতেন, সৃষ্টি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বহির্ম্মুখী মানব আর তেমন ধারণা করিতে পারিতেন না। কাজেই বেদমন্ত্রজ্ঞ ঋষিরা তখন বেদকে গ্রন্থাকারে পরিণত করতঃ মানবদিগকে শুনাইতে আরম্ভ করেন। গুরুমুখে বেদপাঠ শুনিয়া ধারণা করায় তখন বেদের নাম শ্রুতি এবং তাহা উপাসক সম্প্রদায়কে ব্রহ্মের সমীপবর্ত্তী করিত বলিয়া তাহার অপর নাম উপনিষৎ বা ব্রহ্মবিদ্যা।

তখন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরা উপদেশ করেন যে 'ওঁ' এই অনাহত শব্দের নাম ব্রহ্মবীজ। আর্য্যর্ষি শৌনক যেমন প্রণবরূপ ধনুর সাহায্যে জীবরূপ শরকে ব্রহ্মে নিয়োজনা করতঃ ব্রহ্মজ্ঞ হইতে পারিয়াছিলেন (৫), সেইরূপ তোমরাও ব্রহ্মাগ্নিতে কর্ম্মাহুতি প্রদানে ব্রহ্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান কর, ব্রহ্ম হইতে পারিবে। অধ্যাত্মতত্ত্বের অনুসন্ধানে দৃষ্ট হয় যে, শ্রীভগবদ্গীতাও এই মুণ্ডক বাক্যের সমর্থন করে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদের আধ্যাত্মিক আভাষ এই—অর্জ্জ ধাতুর অর্থ প্রাণধারণ; অর্জ্জ+উনন্—অর্জ্জুন (প্রাণধারি-জীব সমষ্টি) এবং কৃষ্+ণক্—কৃষ্ণ (পরব্রহ্ম)। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—জীবগণ! তোমরা সংসারী মানব; তোমাদের সম্প্রতি ধর্ম্মযুদ্ধ উপস্থিত। তোমরা প্রণবের অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি নাদকে গাণ্ডীব (৬) এবং বিন্দু অর্থাৎ প্রাণকে শর মনে করিয়া স্থিরভাবে ব্রহ্মকে লক্ষ্য কর; তাহা হইলে যুধিষ্ঠিররূপ ধর্ম্ম-তরুর অন্তরালে থাকিয়া প্রণব-ধনুর সাহায্যে দুর্য্যোধনাদিরূপ শত শত ক্রোধকে (অজ্ঞানাদি পাপ রিপুকে) পরাজিত করিতে পারিবে (৭)। পরন্তু তোমাদের পঞ্চজনের (পঞ্চ প্রাণের) প্রতি আমার যে উপদেশ বাক্য, তাহারই নাম পাঞ্চজন্য এবং শঙ্খের অব্যক্ত ধ্বনিতে যেমন অন্য ধ্বনি বিলীন হয় (৮), সেইরূপ সকল শব্দই পাঞ্চজন্য শব্দে (ওঁকারে) লয় প্রাপ্ত হওয়ায় তাহা

(৩) পাঠোহোমস্তাতিথীনাং সপর্য্যা তর্পণং বলিঃ।
এতেপঞ্চ মহাযজ্ঞা ব্রহ্মযজ্ঞাদি নামকৈঃ॥

(৪) পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমেন গচ্ছতি।
স পিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হিংস্যতে॥
চার্ব্বাক দর্শন।

(৫) ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং
শরংহ্যুপাস নিশিতঃ সন্ধয়িত।
আয়ম্যতদ্ভাবগতেনচেতসা
লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সৌম্য বিদ্ধি॥
মুণ্ডকোপনিষৎ, ২য় খণ্ড, ৩য় মন্ত্র।

(৬) প্রণবং ধনুঃ শরোহ্যাত্মাব্রহ্মতল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বোদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ॥
মুণ্ডকোপনিষৎ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ মন্ত্র।

(৭) যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ
স্কন্ধোঽর্জ্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখা।
মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে
মূলং কৃষ্ণও ব্রহ্মচ ব্রাহ্মণাশ্চ॥
মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১১০ শ্লোক।
দুর্য্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ
স্কন্ধঃ কর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাখা।
দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে
মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রো মনীষী॥
মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১১১ শ্লোক।

(৮) স যথা ধ্যায়মানস্য ন বাহ্যান্ শব্দান্
শরুয়াদগ্রহণায় শঙ্খস্যতু গ্রহণেন
শঙ্খধ্বস্য বা শব্দো গৃহীতঃ।
বৃহদারণ্যক ২য় অঃ ৪র্থ ব্রাহ্মণ।

শঙ্খ নামে আখ্যাত। যখন আমার পাঞ্চজন্য শঙ্খের ওঁকারাত্মক শব্দে বিভোর হইয়া দেবদত্ত শঙ্খের ধ্বনিতে তোমরা জীব জগৎকে প্রতিধ্বনিত করিবে—অর্থাৎ "দেবায় দত্ত" জ্ঞানে সমস্ত কর্ম্মই যখন ব্রহ্মে সমর্পণ করিতে পারিবে, তখনই আমার বিশ্বরূপ দর্শনে আমি কে চিনিয়া লইতে পারিবে, তখনই তোমাদের মনের সাধ মিটিয়া যাইবে।

এই প্রকারে শ্রুত্যুক্ত ধর্ম্মের প্রচলনে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে পর ভোগস্পৃহ মানব আর যখন শ্রুতির কথা শুনিতে চাহিতেন না বা শুনিয়াও ধারণা করিতে পারিতেন না। এবং অবস্থা দৃষ্টে যখন ঋষি দুঃখিত হইয়া মৈত্রেয়কে বলেন, "মৈত্রেয়! অন্তিম কলিতে সকলেই ব্রহ্মবাদ প্রচার করিবে, কিন্তু ভোগ বাসনায় মত্ত মানব আর ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্ত হইবে না" (৯) তখনই সমাজে স্মৃত্যুক্ত ধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়।

স্মৃত্যুক্ত ধর্ম্ম—পঞ্চযজ্ঞ। সংসারের অনন্ত ধারায় বিচলিত মানব যখন শ্রুত্যুক্ত ধর্ম্মে ফলের সংস্রব নাই দেখিয়া তাহাতে অরুচিসম্পন্ন হইয়া পড়েন, তখনই ঐহিক পারত্রিক ফলপ্রসূ ধর্ম্ম মানবের স্মৃতি-পথে উদিত হইবার নিমিত্ত মন্বত্রি প্রমুখ মহর্ষিবৃন্দ বেদমূলক স্মৃতিশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। যাহার সংস্কারে স্বর্গাদি ফলদায়িকা ঐশীশ্মৃতির জাগরণ হয় তাহারই নাম স্মৃত্যুক্ত ধর্ম্ম। বেদ পাঠ, হোম, অতিথি সংকার, তর্পণ ও বৈশ্বদেব বলি, এই পাঁচটি স্মৃতির পঞ্চ মহাযজ্ঞ। এই পঞ্চযজ্ঞ বর্ণন প্রসঙ্গে ইহাতে ব্যবসায়, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, সমাজ, বর্ণাশ্রম প্রভৃতির নিয়ম প্রণালী ও পরলোকের কথা বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ উপদেশ করিয়াছেন যে, "মানব! ছান্দোগ্য উপনিষদে ব্রহ্মকে পুণ্ডরীকাক্ষ বলা হইয়াছে (১০)। তোমরা শুচি কি অশুচি হও, পুণ্ডরীকাক্ষ বিষ্ণুকে স্মরণ কর, দেখিবে তখন তোমাদের অন্তঃকরণ পাবক-শোধিত কনকের ন্যায় নির্ম্মল ও পবিত্র হইয়া যাইবে (১১)। বাণিজ্যের উন্নতি-কল্পে সমবায় সমিতি-গঠন-ক্রমে জীবিকানির্ব্বাহ করিবে; কিন্তু এই সমিতির সভ্য কেহ যদি কোম্পানীর ক্ষতি-সাধন করেন, তাহা হইলে সেই সভ্যকে তাহার ক্ষতি-পূরণ করিতে হইবে (১২)। শারীরিক স্বাস্থ্য-রক্ষার নিমিত্ত (১৩) শক্ত্যানুসারে সর্ব্বদা প্রাণায়াম বা অঙ্গচালনাদি ব্যায়াম করিতে থাকিবে (১৪)। শাস্ত্রের ভবিষ্যদ্বাণীতে আমরা আরও দেখিতেছি যে, ভবিষ্যতে তোমাদের এমন দিন আসিবে, যখন বিশুদ্ধ জলের অভাবে তোমরা যন্ত্রোদ্ধৃত (কলের) জল পান করিবে (১৫) এবং কোনও রমণীকে কেহ অপহরণ বা বলাৎকারে তাহার সতীত্ব নাশ করিলে শাস্ত্রীয় বিধানে তাহাকে সমাজে গ্রহণ করিতে হইবে (১৬)। শাস্ত্রালোচনায় আরও অবগত হওয়া যায় যে, মৃত ব্যক্তির আত্মা তেজ, বায়ু ও আকাশের সমবায়ে আতিবাহিক

(৯) সর্ব্বে ব্রহ্মবদিষ্যন্তি সর্ব্বে বাজসনেয়িনঃ।
নানুতিষ্ঠন্তি মৈত্রেয় শিশ্নোদরপরায়ণাঃ॥
বৃদ্ধ যাজ্ঞবল্ক্য।

(১০) তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবাক্ষিণী।
যস্যোদিতি নাম স এষ সর্ব্বেভ্যঃ পাপেভ্য উদিতঃ॥
ছান্দোগ্য, ১ম প্রঃ, ৭ম মন্ত্র।

(১১) অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপিবা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥

(১২) সমবায়েন বণিজাং লাভার্থং কর্ম্মকুর্ব্বতাম্।
লাভালাভৌ যথাদ্রব্যং যথা বা সম্বিদাকৃতৌ॥
প্রতিষিদ্ধ মনাদিষ্টং প্রমাদাদ্ যচ্চনাশিতং।
সতর্দ্ধত্বাদ্ বিপ্লবাচ্চ রক্ষিতাদ্দশমাংশভাক্॥
যাজ্ঞবল্ক্য ২য় অঃ ২৬২, ২৬৩ শ্লোক।

(১৩) তচ্চনিত্যং প্রযুঞ্জীত যেন স্বাস্থ্যং প্রবর্ত্ততে।
অজাতানাং বিকারাণামনুৎপত্তিকরঞ্চ যৎ॥
বৃদ্ধ যাজ্ঞবল্ক্য।

(১৪) ব্যায়ামো হি সদা পথ্যো বলিনাং স্নিগ্ধভোজিনাম্।
শক্ত্যর্দ্ধেন তু কুর্ব্বীত ব্যায়ামোহন্যতো ব্যথাম্॥
কুক্ষি ললাট গ্রীবায়াং, যদা ঘর্ম্ম প্রবর্ত্ততে।
শক্ত্যর্দ্ধং তদ্বিজানীয়া দায়াতোচ্ছাসমেবচ॥
লাঘবং কর্ম্ম সামর্থ্যং স্থৈর্য্যং ক্লেশ সহিষ্ণুতা।
দোষক্ষয়ো অগ্নিবৃদ্ধিশ্চ ব্যায়ামাদুপজায়তে॥
আচার প্রবন্ধ।

(১৫) শুচিনোতৃপ্তিকুত্তোয়ং প্রকৃতিস্থং মহীগতম্।
চর্ম্মভাণ্ডস্ত ধারাভিস্তথাযন্ত্রোদ্ধৃতং জলং॥
অত্রি সংহিতা।

(১৬) বলাৎকারোপভুক্তা চ চৌরহস্তগতাপিবা।
স্বয়ং বিপ্রতিপন্নাবাপ্যথবা বিপ্রমাদিতা॥
অত্যন্ত দূষিতাপি স্ত্রী ন পরিত্যাগমর্হতি।
বাচস্পতিমিশ্রকৃত শুদ্ধিচিন্তামণি স্বভাবশুদ্ধি প্রকরণ।

(ত্রিভৌতিক) দেহে শূন্যে বিচরণ করে (১৭)। পূরক-মন্ত্রে তাহাতে ক্ষিতি ও জল পূরণ করিলে মন্ত্রশক্তির ক্রিয়ায় প্রেতাত্মা গুরুত্ব লাভে আমাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া শ্রাদ্ধীয় ভোগ্যবস্তু গ্রহণে সমর্থ হয় অর্থাৎ ক্ষিতি ও জলের অভাবে প্রেতাত্মাকে শূন্যমার্গে অবস্থিত ও ক্ষুৎপিপাসায় কাতর দেখিয়া শাস্ত্রকারগণ আতিবাহিকদেহে নীরক্ষীরাদি পূরণের ব্যবস্থা ও প্রেতাত্মার শ্রাদ্ধের বিধান করেন। এই সকল শাস্ত্রের প্রতিকূলে যখন এক সম্প্রদায় বলিতে আরম্ভ করিলেন "মৃতের আত্মা যদি পরলোকে যায়, তাহা হইলে পুত্রাদির মমতায় আবার ঘুরিয়া আসে না কেন? যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, উপবীত ও তিলকাদি ধারণ—বুদ্ধি ও পুরুষকাররহিত অলসের জীবিকা" (১৮)। তখনই সমাজে পুরাণোক্ত ধর্ম্মের প্রচলন হয়।

পুরাণোক্ত ধর্ম্ম—দৈব যজ্ঞ। বিশ্বনিয়ন্তা কালত্রয়ের অভিজ্ঞতায় যখন দেখিলেন যে, ধর্ম্মশাস্ত্রে অবিশ্বাসী মানব ধর্ম্মের ইতিহাস অবগত না হইলে ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিতে চাহিবে না এবং স্বেচ্ছাচারে ক্রমে শক্তিহীন হইয়া পড়িবে তখনই তিনি স্বয়ং ব্যাসরূপী হইয়া পুরাণশাস্ত্র এবং শিবরূপে তন্ত্রশাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়া রাখেন (১৯)। তৎপর ধর্ম্মযাজক ঋষিরা যখন বুঝিতে পারিলেন যে, বর্ত্তমানযুগের মানব কর্ম্মফলপ্রয়াসী অর্থাৎ কে কি কাজ করিয়া কিরূপ ফল পাইয়াছে তাহা জানিতে চায়, তখনই তাঁহারা বেদে যে সকল দেবতার প্রত্যক্ষ বর্ণনা রহিয়াছে তাহাদের ইতিহাস ও উপাসনাতত্ত্ব প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। অভিধানে ইতিহাসের নাম পুরাবৃত্ত বা পুরাণ। সেই ঐতিহাসিক ধর্ম্মের নামই পৌরাণিক ধর্ম্ম। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে আছে একদা অঙ্গিরা বংশজাত ঘোরনামা ঋষি অন্তকালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার নিমিত্ত "অক্ষিতমসি, অচ্যুতমসি প্রাণসংশিতমসি" এই মন্ত্রে স্তুতি করিয়াছিলেন (২০)। সেই বেদমন্ত্রের অনুরূপ ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে যে একদা অষ্টাবক্রনামা ঋষি আপনার অন্তকাল উপস্থিত জানিয়া "অক্ষিতমসি" ইত্যাদি মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করেন (২১)। সাধারণতঃ "ঘোর" অর্থে কৃষ্ণবর্ণ ও কুৎসিতাকার পুরুষকে বুঝায়। অষ্টাবক্র মুনিও কৃষ্ণবর্ণ ও কুৎসিতাকার ছিলেন সুতরাং ছান্দোগ্যের দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণই যে গীতার শ্রীকৃষ্ণ এবং ছান্দোগ্যের ঘোরনামা ঋষিই যে অষ্টাবক্র ঋষি, তাহা সহজেই অনুমেয়। এই প্রকার যেমন যযাতি ও নহুষের উল্লেখ থাকায় (২২) পুরাণে যযাতি ও নহুষের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে এবং ছান্দোগ্য ও কালিকোপনিষৎ দৃষ্টে পুরাণে কৃষ্ণ ও কালীকে কলির উপাস্য দেবতা বলা হইয়াছে। কারণ বিজ্ঞানে পাষাণ, মৃত্তিকা ও কৃষ্ণবর্ণ চক্ষুর দৃক্‌শক্তি বর্দ্ধক। কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষার ন্যায় বস্তুগুণে দিব্যচক্ষু স্ফুরণের উদ্দেশ্যে শাস্ত্রে কালী, কৃষ্ণ ও শালগ্রাম প্রভৃতি উপাসনার ব্যবস্থা। সেই জন্যই বেদে ব্রহ্মচারীর চক্ষুতে অঞ্জন ধারণের পদ্ধতি; সেই জন্যই শাক্ত ও বৈষ্ণবের ললাটে মৃত্তিকা তিলক ধারণের বিধি। তাই মহর্ষি আপস্তম্ব বলেন—ফলার্থে রোপিত

(১৭) ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি ভূতানি ত্রীণ স্যাত্তস্য বিগ্রহাৎ
প্রায়শ্চিত্তবিবেক।

(১৮) যদাগচ্ছেৎ পরং স্থানং দেহাদেষ বিনির্গতঃ।
কস্মাদ্ ভূয়ো ন চায়াতি বন্ধুস্নেহসমাকুলঃ॥
অগ্নিহোত্রাস্ত্রয়োবেদা ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।
বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকেতি বৃহস্পতিঃ॥
চার্ব্বাক দর্শন।

(১৯) নিস্তারায় চ লোকানাং স্বয়ং নারায়ণঃ প্রভুঃ।
ব্যাসরূপেন কৃতবান পুরাণানি মহীতলে॥
পদ্মপুরাণ, পাতালখণ্ড।
আগতং শিববক্ত্রে ভ্যোগতঞ্চ গিরিজামুখে।
মতং শ্রীবাসুদেবস্য তস্মাদাগমসম্মতঃ॥
আগমদ্বৈতনির্ণয়।

(২০) তদ্ধ্যেতৎ ঘোর আঙ্গিরসঃ দেবকী পুত্রায় কৃষ্ণায় আক্তোবাচ। অপিপাস এব স বভূব সোহন্ত-বেলায়ামেতত্রয়ং প্রতিপদ্যেত অক্ষিতমসি, অচ্যুতমসি, প্রাণসংশিতমসীতি।
ছান্দোগ্য উপনিষৎ।
ভাষ্য সংক্ষেপঃ।
আত্মা প্রাপ্য অক, গতাবিত্যস্য রূপম্।
কৃষ্ণায়েতি তুমর্থে চতুর্থী।

(২১) যদক্ষিতস্তত্ত্বমসি পরমাত্মা নিরাময়ঃ।
অচ্যুতাধ্যয় বিশ্বাত্মন্ ত্রাহি মাং ভবসঙ্কটাৎ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডের।

(২২) যযাতের্যোনহুষস্য বর্হিষিদেবা
আসতে তেহধিক্রুবন্ত নঃ।
ঋগ্বেদ ১০ম মং, ৩৩ সূক্ত, ১ম ঋ।

আম্রতরু যেমন প্রসঙ্গে ছায়া ও গন্ধ প্রদান করে, সেইরূপ ধর্ম্মাচরণে মানবের প্রাসঙ্গিক ফল আপনা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে (২৩)। তৎপর পৌরাণিক যুগ যাইতে না যাইতেই কলিপ্রভাবে যখন মানব ক্রমশঃ হীনশক্তি ও কৃশ-কলেবর হইয়া পড়ে, তখন লোকের আলাপ ব্যবহারে তাহা অনুভব ক্রমে আর্য্যঋষিরা তন্ত্রোক্ত ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন।

তন্ত্রোক্ত ধর্ম্ম—শক্তিযজ্ঞ। তন্ত্রতে বিস্তার্য্যতে এই বুৎপত্তিগত অর্থে তন্ত্র পদটী নিষ্পন্ন (২৪)—চৈতন্যরূপিণী শক্তির উপাসনায় মানবের একাগ্রতা জন্মিলে চিত্তের স্থৈর্য্য আসিবে, চিত্তের স্থিরতায় মানসিক বল বৃদ্ধি পাইবে, মানসিক বল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক শক্তির বিকাশ হইবে; সম্ভবতঃ এই সকল মহৎ উদ্দেশ্যেই তান্ত্রিক ধর্ম্ম বিহিত হইয়াছিল। ইহা শক্তি সাধনার মূলসূত্র হেতু এই ধর্ম্মের নাম শক্তিযজ্ঞ। তান্ত্রিক ধ্যান রহস্যের আলোচনায় দেখা যায়, আদ্যাশক্তি কালিকা যেন স্বয়ংই ব্যক্ত করিতেছেন যে "ঘটের আকাশ দৃষ্টে যেমন খণ্ড আকাশ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ আমার মূর্ত্তি দৃষ্টে উপাসকেরা আমাকে খণ্ড ব্রহ্ম বলিয়া মনে করে, কিন্তু সমষ্টির চক্ষে আমি পরব্রহ্ম। ক (ব্রহ্ম), আ (আকাশ), ল (পৃথিবী), ঈ (ঈক্ষণ) অর্থাৎ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত আমার দৃষ্টি গোচর হওয়ায় আমি কালী নামে আখ্যাত। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি—এই উভয় পন্থীর কথাই আমার কাণে আসে বলিয়া বড়শাকৃতি শরযুগ্ম (প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি) আমার কর্ণভূষণ। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই পুরুষার্থ চতুষ্টয় প্রদানের নিমিত্ত আমি চতুর্ভুজা। আমার দ্বারা ভক্তের কেশ পাশ (মায়া-জাল) বিদূরিত হওয়ায় আমি মুক্তকেশী। পরব্রহ্মের পরিচারিকা অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির ন্যায় কুরুকুল্লাদি অষ্ট-নায়িকা আমার অষ্টশক্তি; বেদান্তের শম-দমাদি অষ্টাঙ্গ-যোগ আমার অষ্ট ভৈরব। এইভাবে শক্তি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে সাধকেরা সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইতে পারিবে।" কিন্তু কলি-কলুষিত মানব যখন কালক্রমে অত্যধিক ভোগী ও দুর্ব্বল হইবে, তখন তন্ত্রোক্ত সাধনাও তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না বুঝিয়া ত্রিকালদর্শী শাস্ত্রকারগণ তান্ত্রিক সাধন প্রণালীর ভিতর দিয়াই ভগবদুপাসনার আরো সহজ ও সংক্ষিপ্ত পদ্ধতির বিধান করিয়া রাখেন। ইহার আভাষ পরবর্ত্তী বৈষ্ণবধর্ম্ম, সেবাধর্ম্ম ও ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিতর দিয়া পরিলক্ষিত হয়।

(২৩) আম্রফলার্থে রোপিতে যথাচ্ছায়া গন্ধাবনুৎপদ্যেতে।
এবং ধর্ম্মং চর্য্যমানমর্থাঅনুৎপদ্যন্তে॥
আপস্তম্ব।

(২৪) তনোতি বিপুলানর্থান্ নানাশাস্ত্রসমন্বিতান্।
ত্রাণঞ্চ কুরুতে যস্মাঔতন্ত্রমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥
কালিকাগমতন্ত্র।

চৈতন্য ধর্ম্ম—নামযজ্ঞ। তান্ত্রিক যুগের মধ্য সময়েই শক্তি সাধনার উপাসনাপদ্ধতি আর মানুষকে ধারণ করিতে পারিত না। অধিকাংশ মানবের চিত্তে যখন শক্তিযজ্ঞ কঠিন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, সম্ভবতঃ তখনই চিন্ময় ব্রহ্মকে প্রেমভাবে ধরিয়া লইবার নিমিত্ত মহাত্মা চৈতন্যদেব রাধাতন্ত্রোক্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা পদ্ধতি (২৫) এবং ষোড়শবিকারবিনাশক হরেকৃষ্ণ নাম জগতে প্রচার করেন (২৬) এই ধর্ম্ম চৈতন্যদেবের মুখে প্রচারিত হওয়ায় তাহা চৈতন্য-ধর্ম্ম নামে অভিহিত। ইহাতে যজ্ঞানুষ্ঠানের বিধি বিধান না থাকিলেও বৈষ্ণব সম্প্রদায় এই ধর্ম্মকে নামযজ্ঞ বলিয়া থাকেন। যেহেতু "যাগযজ্ঞ কিছু নাই, নামযজ্ঞ কর ভাই" ইহা তাঁহাদেরই গীতি।

ব্রাহ্মধর্ম্ম—জ্ঞানযজ্ঞ। যখন পৌরাণিক ভবিষ্যদ্-বাণী মানব জগতের ভিতর দিয়া অক্ষরে অক্ষরে ফলিত হইতে আরম্ভ হয়, যখন অর্থকরী শিক্ষার প্রভাবে মানবকে ধর্ম্মশিক্ষা না করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণের অভিলাষী হইতে দেখা যায় (২৭), যখন বর্ণাশ্রমধর্ম্মে বহু লোকের অনাস্থা ঘটিয়াছিল (২৮) বোধ হয় তখনই মহাত্মা রামমোহন রায় মহানির্ব্বাণ-

(২৫) কামবীজং সমুদ্ধৃত্য বাগ্‌ভবং তদনন্তরং।
রাধাপদং চতুর্থ্যন্তমুদ্ধরেদ্বরবর্ণিনি॥
রাধাতন্ত্র ৩২ পটল ৭ম প্রঃ।
মন্ত্রচূড়ামণি প্রোক্তং সর্ব্বমন্ত্রৈক কারণম্।
সর্ব্বদেবস্য মন্ত্রাণাং কৃষ্ণ মন্ত্রস্তজীবনম্॥
রাধাতন্ত্র ১৭শ পটল ৬১ প্রমাণ।

(২৬) হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে॥
রাধাতন্ত্র ২য় পটল ৮ম প্রঃ।

(২৭) অর্থশাস্ত্রং পঠিষ্যন্তি ধর্ম্মশাস্ত্রং বিহায় চ।
নিত্যমুদ্বিগ্ন মনসো ভবিষ্যন্ত্যন্তিমে কলৌ॥
খিলহরিবংশ।

(২৮) বর্ণাশ্রমাচারবতী প্রবৃত্তি র্ন কলৌ যুগে॥ বৃদ্ধযাজ্ঞবল্ক্য।

TIGHT BINDING.

তন্ত্রোক্ত (২৯) ব্রহ্মোপাসনার সহজপদ্ধতি প্রচার করেন। ইহা ব্রহ্মোপাসনার প্রণালীহেতু পরে ব্রাহ্মধর্ম্ম জ্ঞানযজ্ঞ নামে অভিহিত হইয়া থাকিবে।

সেবাধর্ম্ম—ভূতযজ্ঞ। শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মমতের প্রাবল্যে মানবের চিত্ত যখন উদ্বেলিতপ্রায়, এমন কি কোন ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রকৃত মঙ্গল হইবে তাহা অবধারণ করা অনেকের পক্ষে সুকঠিন হইয়া পড়িল, মনে হয় তখনই পরমহংস রামকৃষ্ণদেব সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ে একপ্রকার মিশ্র ধর্ম্মের প্রচার করেন (৩০)। এই ধর্ম্ম মহাত্মা রামকৃষ্ণের মুখ হইতে প্রচারিত হওয়ায় তাহা "রামকৃষ্ণ মিশন" নামে প্রসিদ্ধ। কার্য্য কারণে বোধ হয় এই "মিশন" শব্দটী ইংরেজীতে বাণী প্রচার এবং বঙ্গ ভাষায় মিশ্র অর্থে প্রযুক্ত। ভগবান্ মনু এই শ্রেণীর ধর্ম্মকে ভূতযজ্ঞ (জীবসেবা) নামে অভিহিত করেন।

উপর্য্যুক্ত শাস্ত্রীয় আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, সময় এবং অবস্থাভেদে যুগে যুগে যে সকল ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে, তাহা জৈমিন্যুক্ত যজ্ঞধর্ম্মেরই প্রতিধ্বনি। কারণ বেদে যে যজ্ঞের নাম আদিধর্ম্ম, সেই যজ্ঞকে ভিত্তি রাখিয়া বৈদিক যুগে যেমন যাগ যজ্ঞের বিধি, সেইরূপ শ্রুতির যুগে ব্রহ্মযজ্ঞ, স্মৃতির যুগে পঞ্চমহাযজ্ঞ, পুরাণের যুগে দেবযজ্ঞ, তন্ত্রের যুগে শক্তিযজ্ঞ, তৎপরবর্ত্তী যুগে নামযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, ও জ্ঞানযজ্ঞের বিধান করা হইয়াছে। গীতা এবং মনুতে এই সকল বহুবিধ যজ্ঞের কথা উল্লিখিত হইয়া থাকিলেও মূলতঃ সকল যজ্ঞই জৈমিনির কথিত চোদনা লক্ষণ (প্রবৃত্তি মূলক) এক যজ্ঞধর্ম্মেরই বাচ্য। এই গ্রন্থে যজ্ঞধর্ম্ম সুমীমাংসিত হওয়ায় ইহাকে কোনও সম্প্রদায় ধর্ম্মমীমাংসা এবং কোনও সম্প্রদায় অধ্বর-মীমাংসা বলেন।

(২৯) নাত্রবর্ণ বিচারোঽস্তি নোচ্ছিষ্টাদি বিচারণম্।
নকাল নিয়মোঽপ্যত্র শৌচাশৌচং তথৈবচ ॥
কিন্তস্য বৈদিকাচারৈস্তান্ত্রিকৈর্ব্বাপিতস্য কিং।
ব্রহ্মজ্ঞানস্য বিদুষঃ স্বেচ্ছাচারবিধিঃস্মৃতঃ ॥
অস্মিন্ ধর্ম্মে মহেসি স্যাৎ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
পরোপকার নিরতো নির্ব্বিকারঃ সদাশ্রয়ঃ ॥ মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

(৩০) ধ্যায়ন্তি তং বৈষ্ণবাশ্চ কৃষ্ণং শ্যামলসুন্দরং।
ত্রিশূলধারিণং কেচিৎ পঞ্চবক্ত্রং দিগম্বরং ॥
নানারূপঞ্চ পশ্যন্তি ধ্যানানুসারতশ্চ যাং।
সা দেবী প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা তেজোমণ্ডলবাসিনী।
আকাশো ভিদ্যতে যাদৃগ্ ঘটস্থাদিস্তথাচ সা ॥ ব্রহ্মাণ্ডতন্ত্র।

দূরের বাউল ডাকে !

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

অশ্রুমতীর তীরে
ক্লান্ত হিয়ার কালো যবনিকা নামে ওই ধীরে ধীরে !
আঁধারে সন্ধ্যা বাজায়ে শঙ্খ এল যে খেয়ার ঘাটে,
বন্ধু আমার ! আর কি গগনে বসিবে সূর্য্যপাটে ?
দূরের বাউল ডাকে,
পারের মালিক বেয়ে এসে তরী নদীর ধারেতে হাঁকে।

গ্রামের বিসারী ক্ষেতে,
দীঘির কোলেও হিজল বনেতে হারাণো লিপিরেঁ পেতে,
ব্যাকুল হইয়া ভ্রমিয়াছি আমি দীর্ঘ বরষ মাস ;
আমার নয়ন ছিল যে ভিখারী, নাহি ছিল অবকাশ,
দিবানিশি চঞ্চলি—
প্রেমের পূজার ফুরালো লগন, হোলোনাক অঞ্জলি।

ভগ্ন বুকের কূলে,
কোন্ অতীতের সাগর বাহিয়া ঢেউ আসে দুলে দুলে !
বহুকাল পরে সেই লিপিখানি কুড়ায়ে এনেছ তুমি,
ওষ্ঠ কাঁপে যে বিদায় বেলায় কেসনে তাহারে চুমি !
আঁখি মোর জলভার,
জীবন পথের পাপিয়া দোয়েল করে এবে হাহাকার।

ছিঁড়ে ফেল কাজ নাই
যাবার সময়ে তোমাদের কাছে পরম শান্তি চাই।
তুমি তো জানো না কোনো বসন্তে জীবনের মধুমাসে,
পথিক বধূরে পেয়েছিনু আমি মাধবী লতার পাশে
তাহারি খোঁপার কোণে,
সোহাগ আখরে ছিল এই লিপি হারায়ে গেল যে বনে।

উপন্যাস

মাটীর দেবতা

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(২৮)

সৈকত ড্রয়ার পরিষ্কার করছিল।

আজকাল পাকা গিন্নি সে, সংসারের ছোট বড় সব জিনিসেই তার দৃষ্টি, অনেক হিসাব করে সে চলে। কয়টা বছর আগে যে কেউ সৈকতকে দেখেছে, তারা আজ তাকে দেখে মোটেই বিশ্বাস করতে পারবে না।

হাঁ, সংসারের কাজেই সে আরাম পায়, যতটুকু শান্তি ওতেই মেলে।

অনেকদিন হতে ঝোঁক ছিল ড্রয়ারটা গুছিয়ে ফেলবে, কি কুঁড়েমী আসে—কিছু হয়ে ওঠে না। আজ ইন্দ্রনীল একখানা কাগজ টানতে একরাশি চিঠিপত্র বার হয়ে পড়েছিল, সৈকত তা দেখেছিল।

ইন্দ্রনীল বার হয়ে যেতেই সে ড্রয়ার পরিষ্কার করতে ঢুকলো।

চাবি দেয়ালের গায়ে ব্র্যাকেটের ওপর থাকে, সৈকত চাবি দিয়ে ড্রয়ার খুলে ফেললে।

মাগো, কি অপরিষ্কার। এখানে কতকগুলো কাগজ ছড়ানো, ওখানে কতকগুলো চিঠি তালপাকানো অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

সৈকত ড্রয়ারের ভেতরে যা কিছু ছিল সব বার করে ফেললে। সন্ধ্যা বেলায় বাড়ী ফিরে ইন্দ্রনীল যখন ড্রয়ার খুলবে তখন সে আশ্চর্য্য হয়ে যাবে ও তার মুখখানা তখন কি রকম হবে সেইটাই কল্পনা করে সৈকতের মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

কিন্তু তাল পাকানো পত্রগুলো তার দৃষ্টি আকৃষ্ট করে কেন ?

মেয়েদের মনে কৌতূহল স্বভাবসিদ্ধ, একবার জাগলে কিছুতেই দমন করা যায় না ; ওইটুকুই ওদের বিশেষত্ব। বিশেষ করে যে কোন মেয়ের সম্বন্ধে বিশেষ খবর নেওয়ার ইচ্ছা তাদের দুর্নিবার ; এর পরেও কথা আছে—যে খবর নিচ্ছে সে যদি নিজে দেখতে কুৎসিত হয়। নিজের সম্বন্ধে সৈকত বড় বেশীরকম সচেতন নয় ; সে জানে সে কুশ্রী, মানুষকে আকৃষ্ট করতে তার কিছু নেই, না রূপ—না গুণ।

তবু ইন্দ্রনীল তাকে সত্যই ভালোবাসে—এ ছিল তার পক্ষে অসীম সান্ত্বনা। তুলনা করতে গেলে সে ভারি সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে নিজের কাছে, তাই ইদানীং সে তুলনা করা ছেড়ে দিয়েছে।

একখানা পত্র বিশেষ করে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, পড়বে না মনে করেও সে পড়ে ফেললে।

পত্র আসছে রেঙ্গুন হতে, লিখছে মিস পার্ক নামে একটী মেয়ে—

অগ্রে প্রণয় নিবেদন, বিগত দিনের সুখস্মৃতি ভরা। সে যথেষ্ট দুঃখ করেছে—ভারতীয়েরা এমনই হয়—একবার পেছন ফিরলে আর কোন কথা তাদের মনে থাকে না। যাই হোক মিস পার্ক শিগ্গীরই ভারতে আসবে, তখন মিঃ চ্যাটার্জ্জি যে নিস্তার পাবে না এ কথা ঠিক।

শুধু কি এই একখানি ?

কৌতূহল দমন করতে উপদেশ দেওয়া খুবই সহজ, কাজে কেউ প্রতিপালন করতে পারে না এই যা দুঃখ। পরের বেলায় সৈকতও অনেক উপদেশ দিয়েছে, হয় তো ভবিষ্যতে আরও অনেককে উপদেশ দেবে, কিন্তু নিজের বেলা সে উপদেশ তার কার্য্যকরী হয় নি।

একটার পর একটা—সে অনেকগুলি পত্র পড়ে গেল। অধিকাংশই বিলেতের মেয়েদের হাহুতাশপূর্ণ, অনেকেই আশা করছে—তারা সুযোগ পেলেই ইণ্ডিয়ায় আসবে, সে দিন মিঃ চ্যাটার্জ্জির মুক্তি নেই।

মেরুর হাতের লেখা অথচ নামহীন পত্রও পাওয়া গেল, —উচ্ছ্বাসপূর্ণ পত্র।

স্তব্ধ হয়ে সৈকত ভাবছিল—বিয়ের পরও এ দেশের মেয়ে এমন মন রাখতে পারে—স্বামীর প্রাণভরা ভালবাসা স্নেহ তার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত করতে পারে না। মনে পড়ল সেদিন কি একখানা পত্রিকায় জনৈক বিখ্যাত ব্যক্তি ভারতনারী ও পাশ্চাত্য সম্বন্ধে একটী দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে ফেলেছেন।

সে ভদ্রলোক জোর করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন ভারতীয় আবহাওয়া এদেশে সীতার মত সতী মেয়ে, রামের মত সৎ ছেলে তৈরী করতে পারে। যখন বৈদেশিক শিক্ষা ও সভ্যতা তার চাকচিক্য নিয়ে এদের সামনে এসে দাঁড়ায়, প্রথমটায় এরা মুগ্ধ হলেও শীঘ্রই নিজেদের ভুল বুঝতে পারে এবং যতই বিপথে যাক শেষে চলে আসে নিজের স্থানে।

সৈকত ভাবছিল এ কথা কি সত্য? মানুষ তর্কের সময় অনেক কিছু অসম্ভবকে সম্ভব বলে প্রতিপন্ন ক'রে, অনেক মিথ্যাকে তারা যেমন মেনে নিতে চায় কেবল জিতবার জন্যে—এও ঠিক তাই। মিথ্যাকে মিথ্যা জেনেও সে ভদ্রলোক জোর করে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন সে মিথ্যা নয়—সে সত্য।

হায় রে, জোর করলেই যদি মিথ্যা সত্য হতো—তা হলে তো কথাই থাকতো না, অনেক কিছুই সত্য হয়ে থাকত। ঐশ্বরিক শক্তিতেই হোক বা প্রকৃতির নিজের বিধানেই হোক—মিথ্যা—চিরকাল মিথ্যাই থেকে যায়। অতি ক্ষীণ সত্য ও টিঁকে থাকে অসীম শক্তিশালী মিথ্যার রাজত্বে, তবু সে বেঁচে থাকা সপ্রমাণ করে।

মেরু কি পায় নি? অসীম প্রেমময় স্বামী। সুন্দর সাজানো সংসার, সকলের ওপর তার ছেলে। তবু আজও সে লুব্ধার মত হাত বাড়াতে চায়, চাঁদ ধরার নেশা তার আজও কাটে নি।

এ পত্রখানাও সৈকত ভাঁজ করে গুছিয়ে রাখলে।

আর একখানা বাংলা লেখা পত্রও বিশেষ করে তাকে আকৃষ্ট করলে,—নীচে খাম লেখা অভ্র।

এ কি পত্র—

পড়তে পড়তে সৈকতের সমস্ত দেহ, সমস্ত মন বার বার শিউরে উঠতে লাগল।

অভাগিনী—অভাগিনী—

বাংলার মেয়ে এমনি করেই বুঝি নিজের সর্ব্বস্ব হারিয়ে ভিক্ষা চায়?

দেহের রক্ত গরম হয়ে ওঠে, বুকের রক্ত টগবগ করে ফোটে।

এই মেয়েটিকে একদিন ইন্দ্রনীল তার আত্মীয় স্বজনের কাছ হতে ঠিক সৈকতের মতই ছিনিয়ে এনেছিল, দুনিয়ায় তার স্থান কোথাও রাখে নি, মুখ দেখাবার পথ পর্য্যন্ত রাখে নি। এ মেয়েটিও সৈকতের মত সর্ব্বস্ব দিয়ে ইন্দ্রনীলকে ভালবেসে এসেছে, আজ এত দুঃখকষ্টের মধ্যেও তার সে ভালোবাসা মিলিয়ে যায় নি।

সন্তানের মা সে—কেউ তাকে আশ্রয় দেয় নি, সে যেখানে গেছে সেখান হতে তাড়িতা হয়েছে, তার সন্তানকে কেউ মেনে নিতে চায় নি, দুনিয়ায় তার হতভাগ্য সন্তানের স্থান নেই।

আজ সে তার সন্তানের জন্যে ভিক্ষা চাচ্ছে—যা হয় কিছু দাও, সে সন্তানের ক্ষুধা আর সহ্য করতে পারছে না, কারণ সে মা। তার সর্ব্বস্ব বিনিময়ে যাকে সে কুড়িয়ে পেয়েছে, তাকে সম্বল করেই পথ চলবে—চাই শুধু তার খাদ্য।

সে সন্তান কার—অভ্রের, না ইন্দ্রনীলের? সে আজ আইনের সহায়তায় তার সন্তানের আহার্য্য আদায় করতে পারত, কিন্তু সে তা চায় না। ইন্দ্রনীল তাকে ভুলে গিয়ে থাকতে পারে—সে ইন্দ্রনীলকে ভোলে নি, তাই সে দুনিয়ার সামনে ইন্দ্রনীলকে হেয় অপদস্থ করবে না।

ইন্দ্রনীল সুখী হোক, স্বচ্ছন্দে থাক, সে গাছতলায় পড়ে থেকে ঘৃণিত জীবন যাপন করবে, কাউকে কোনদিন বলবে না এ সন্তান কার। শুধু সে চায় কয়টা করে টাকা—আজ তাই হবে তার নারীত্ব বিসর্জ্জনের চরম পুরস্কার।

সৈকত দুই হাতে মাথাটাকে চেপে ধরলে।

পৃথিবী কি ঘুরছে—এর রং কি বদলে গেছে? কোথায় গেল সব—বাড়ী, ঘর, মানুষ, পথ, ঘাট?

সৈকত টলতে টলতে এসে একখানা সোফায় বসে পড়ল।

নিঝুম—নিস্তব্ধ—তার দেহটাই শুধু নয়, মনটা পর্য্যন্ত এমনই নিঃসাড় হয়ে গেছে সে কিছু ভাবতে পারলে না। অতীত ও বর্ত্তমান কোথায় যেন অন্ধকারে লীন হয়ে গেল, ওদের আর হাত বাড়িয়ে যেন ছোঁওয়া যায় না।

কিন্তু বেশীক্ষণ নয়, মুহূর্ত্তমান হয়ে বেশীক্ষণ থাকা সৈকতের পোষায় না, তাই সে মুহূর্ত্তে নিজের দুর্ব্বলতা জয় করে ফেললে।

সে সুন্দরী নয়—তাই বোধ হয় আঘাত সইবার অপর্য্যাপ্ত ক্ষমতা তার আছে। এই বয়সখানির মাঝে সে চলতে গিয়ে অনেক হারিয়ে এসেছে, সম্বল করার জন্য আজ কিছু নেই। হোক সে রিক্তা, হোক তার অন্তর মুহ্যমান, তবু সে দাঁড়াবে। ওই মিথ্যার মাঝে যেটুকু সত্য মিশিয়ে আছে সেটুকু সে নেবে।

দাঁতে ঠোঁটটা সে বড় বেশী জোরেই চেপে ধরেছিল, যাতে তার ঠোঁট কেটে খানিকটা রক্ত বার হয়ে যাওয়ায় সে সত্যই আরাম পেলে। এই রক্তই তার মাথায় উঠে বিপ্লব বাধিয়ে দিয়েছিল, সে কি করবে তা ঠিক করতে পারছিল না।

কেবল এই পত্রখানা নিজের কাছে রেখে আর সবগুলো সে যেমন তেমন করে ড্রয়ারে তুলে ফেলে চাবি দিলে, তারপর নিজের ঘরে ফিরে এল।

বিছানায় শুয়ে পড়ে সৈকত ভাবতে লাগল সেই অভাগিনী মেয়েটির কথা—

যতই ভাবতে লাগল—কেবল ইন্দ্রনীলের ওপরই নয়, সেই মেয়েটির ওপর পর্য্যন্ত দুর্জ্জয় রাগে সে ফুলতে লাগল।

এত নিঃসহায়—কেন? সৈকত এত অপমান সইতে পারে না, সইতে পারবে না—। যে সেই মেয়েটির নারীত্বকে অবহেলিত—পদদলিত করে চলে এসেছে, তারই কাছে সে কাতরভাবে তার সন্তানের জন্যে আহার্য্য চায়—কি নিষ্ঠুর এই নমনীয়তা, কি ভয়ানক এই সহ্যশীলতা, কি মর্ম্মঘাতী এই বর্ব্বর ভালবাসা। মানুষের মনুষ্যত্ব হয়ে গেল এখানে হীন—অতি ঘৃণিত, মানুষের কাছে মানুষের দাম রইল না।

কিন্তু উপায়—উপায়ই বা কি?

আজ যদি সৈকতের অদৃষ্টেও এ দিন আসে?

আসতে পারে কি—আসবে। সৈকত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে দিন এসেছে। কিন্তু সৈকত এমন দীনার মত চলে যাবে না, যা হয় কিছু করবে। কি করবে তার আজ কিছু ঠিক না থাকলেও সে একটা কিছু করবে। আত্মহত্যা নিশ্চয়ই করবে না, জীবনটা এমন কিছু সস্তা নয় যে একবার হারিয়ে আবার ফিরে পাবে।

হাতের পত্রখানার ওপর সে আবার চোখ রাখলে—তারপর দারুণ ঘৃণাভরে সেখানা ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

প্রার্থনা করতে এসেছ নারী—প্রার্থনা? একদিন যেখানে ছিল অধিকার—যেখানে ছিল অক্ষুণ্ণ প্রতাপ, সেখানে আজ হাত বাড়িয়ে অতি সঙ্কোচের সঙ্গে পায় পায় এগিয়ে আসছ—চাচ্ছ অনুকম্পা? ধিক—ধিক। এ রকম ভাবে দীনতা প্রকাশ করার চেয়ে তোমার মরণই যে ছিল অতি বাঞ্ছনীয়, তার চুম্বনই যে ছিল অতি সুন্দর—অতি রমণীয়। ধিক্,—মরণকে বরণ করতে পারলে না—চাইলে ভিক্ষা?

মানুষের বাঁচতে হবে একথাটা সত্য, কিন্তু সে কি এমনি করে—এমনি দয়ার দানের ওপর নির্ভর করে?

সৈকত দুইহাতে মুখখানা ঢেকে পড়ে রইল, তার নিজের অবস্থা সে ভাবছিল, আর ভাবছিল—যদি সেদিন তার ভাগ্যে আসে, সে নীরবে সয়ে যাবে না, আত্মহত্যা ও করবে না, নেবে নির্ম্মম প্রতিশোধ।

তার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

(২৯)

একদিনের জন্যে বার হয়ে ইন্দ্রনীল ফিরে এল চারদিন পরে।

সৈকতের কাছে সে যখন এসে দাঁড়াল, তখন ঘৃণায় সৈকতের পা হতে মাথা পর্য্যন্ত রি রি করে উঠল, সে চোখ তুলে তার পানে চাইলে না।

অনুতপ্তভাবে ইন্দ্রনীল জিজ্ঞাসা করলে "আমার ওপর রাগ করেছ—অভিমান করেছ সৈকত? মাত্র একদিনের জন্যে গিয়ে চারদিন দেরী হয়ে গেছে, কিন্তু এ দোষ আমার নয়। মিঃ মিটার কিছুতেই—"

সৈকত বাধা দিয়ে বললে "থাক, কৈফিয়ৎ না দেওয়াই ভাল, আমি তো কৈফিয়ৎ চাই নে। তুমি যা করছ তা বেশ ভালই—অতি চমৎকার, কিন্তু তারই জন্য কৈফিয়ৎ দেওয়ার দরকার দেখছি নে।"

তার কথার সুরে ঝাঁজের আভাষ পেয়ে ইন্দ্রনীল খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল।

তারপরই হো হো করে হেসে উঠল, দুই হাতে সৈকতকে ধরে বুকের কাছে টেনে এনে বললে "বুঝেছি অভিমান, কিন্তু—"

জোর করে নিজেকে তার আলিঙ্গনপাশ হতে মুক্ত করে তফাতে সরে গিয়ে সৈকত বললে, "না, অভিমানও নয়, দুঃখও নয়, কিছু নয়। আমি তোমায় ক্ষমা করতে পারব না, কিছুতেই না, তাই তুমি আমার কাছে কোন কৈফিয়ৎও দিয়ো না,—আমার কাছেও আর এসো না।"

মুহূর্ত্তমাত্র তার পানে নিষ্পলকে চেয়ে থেকে ইন্দ্রনীল বললে "তোমার কথার মানে কিছুই বুঝতে পারলুম না, সৈকত।"

সৈকত উত্তর না দিয়ে কেবল ড্রয়ারটা দেখালে।—

ইন্দ্রনীল জিজ্ঞাসা করলে, "মানে—?"

আরক্তমুখে সৈকত বললে, "মানে ওর মধ্যেই রয়েছে, আমায় কষ্ট করে বুঝাতে হবে না।"

ইন্দ্রনীল অকস্মাৎ হো হো করে হেসে উঠল, তার সে হাসি আর থামে না—।

সৈকত কয়েক মুহূর্ত্তমাত্র তার পানে চেয়ে থেকে মুখ ফিরালে। দারুণ ঘৃণায় তার মুখখানা তখন বিকৃত হয়ে উঠেছিল।

ইন্দ্রনীল হাসি থামিয়ে বললে, "বুঝেছি তুমি কি বলতে চাও। ওই পত্রগুলোর কথা বলছো তো, তোমার চোখে পড়েছে তাই? সত্যি যদি ওগুলো আমার লুকিয়ে রাখারই মতলব হতো সৈকত, আমি ড্রয়ারে কখনও রাখতুম না অমন করে ফেলে—এটা বেশ জেনে রাখো। কোন অতীত যুগের কি কয়টা চিহ্ন, তাই নিয়ে তুমি যে আজ এমন কাণ্ড বাধাবে তা কি আমি জানি?"

"অতীতের ঘটনা—?"

সৈকত আর বলতে পারলে না।

ইন্দ্রনীল বললে, "তা নয় তো কি? জানো না, বিলেতে যারা যায় তাদের জীবনে এমন অনেক কাণ্ডই ঘটে থাকে, কেবল আমারই একা নয়। তোমার দাদা শিগ্‌গীরই আসছে, যদি পার তার—জীবনের খোঁজ নিলে এমন অনেক কাহিনী পাবে। দোষ বিশেষ আমাদের নেই। এ দেশ হতে সমুদ্র পারে গিয়ে যখন পড়ি, তখন আমরা মনে করি পুরাণ-বর্ণিত স্বর্গে এসে পড়েছি। ওখানকার মেয়েরা—এ দেশে যাদের আমরা দশ হাত তফাতে রেখে চলি, তারা এমন কাছে আসে—এমন আপনার লোক হয়ে যায়, যাতে আমরা আর নিজেদের সংযত রাখতে পারি নে। পুরুষকে দোষ দেবে—নিশ্চয়ই দেওয়া উচিত; কারণ সত্যই তারা উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির, সত্যই তাদের মধ্যে সংযম নেই—কিন্তু তবু তারা সংযত থাকতে পারে যদি মেয়েরা সংযমী হয়। কিন্তু ওখানে এ দেশের সতীত্বের আদর্শ খুঁজে মেলে না সৈকত, পড়েছ তো—তবু আসল রূপটা ওদের চোখে দেখ নি। ওই যে পত্রগুলো ড্রয়ারের মধ্যে পেয়েছ, সে এই রকম সব মেয়েদের পত্র। যখন সামনে ছিলুম খেলেছি, পেছন ফেরার সঙ্গে আমি ওদের কথা ভুলে গেছি, ওদের কথা মন হতে মুছে ফেলেছি।"

সৈকত রুষ্টকণ্ঠে বলে উঠল, "থাক থাক,—এখানা কার পত্র বল তো?"

সে উপাধানের তলা হতে একখানা পত্র ইন্দ্রনীলের সামনে ছড়িয়ে দিলে।

কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে ইন্দ্রনীল বলল, "বাঃ, এখানাও যে পেয়েছ দেখছি। নাঃ, এমন করে সব যদি এনকোয়ারি করতে সুরু কর সৈকত, সত্যি আমি বেচারা মারা যাব।"

সৈকত পলকহীন নেত্রে তার পানে তাকিয়ে রইল, তার চোখ দিয়ে আগুন ঝরছিল।

ইন্দ্রনীল একটু হেসে বললে "এখন তোমার এ-সব নিয়ে মাথা ঘামানো সত্যই অন্যায় সৈকত—"

"অন্যায়—"

দাঁতের ওপর দাঁত রেখে সৈকত বললে "অন্যায় অন্যায়ই বটে। ভণ্ড, কাপুরুষ—"

ইন্দ্রনীল হেসে উঠল।

সৈকত কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল—"হাসতে লজ্জা করছে না—ভীরু, কাপুরুষ? একটি মেয়ের সর্ব্বনাশ করে, একটি নির্দ্দোষ শিশুকে পৃথিবীর বুকে টেনে এনে, তাদের সম্পর্কে এই নিস্পৃহতা প্রকাশ করতে একটু লজ্জা করলে না?"

ইন্দ্রনীল মাথা দুলিয়ে বললে, "না, কেন না তাতে লজ্জা করবার কিছু নেই। আমি যা করেছি সৈকত, অনেকেই তা করে থাকে, এর চেয়েও বেশী করে তা জানো? আজ ওই মেয়েটি তার ছেলের জনকত্বের দোহাই দিয়ে আইনের সাহায্যে আমার কাছ হতে ভরণ-পোষণের খরচ আদায় করতে পারে। বিলেত হলে কি করত জানো—ওই শিশুটা যাতে পৃথিবীর বুকে না থাকে—"

সৈকত দুই হাত কাণে চাপা দিয়ে আর্ত্তভাবে বলে উঠল, "থাক থাক—"

টেবিলের ওপরেই ইন্দ্রনীলের রিভলভারটা পড়ে ছিল, সৈকত হঠাৎ হাত বাড়িয়ে সেটা তুলে নিলে—

ইন্দ্রনীলের বুক লক্ষ্য করে সে গর্জ্জে উঠল "তোমায় গুলি করে মারব, প্রস্তুত হও। যেমন করে লোকে শেয়াল কুকুর মারে, তেমনি করে তোমায় মারব।"

ইন্দ্রনীল নিজের মনে একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললে "আঃ, সত্যি তা হ'লে খুবই ভালো হয় সৈকত। মারতে পারবে—হাত একটু কাঁপবে না? ধরলুম—গুলি না হয় করলে, তখন হয়তো মনে পড়ল না—গুলি করার পরের দৃশ্যটা কি রকম হয়; কিন্তু তার পরেই পাঁচ মিনিটের মধ্যে যে দৃশ্যটা চোখের সামনে ফুটে উঠবে, একবার সেটার কথা ভাবো। রক্তে চারিদিক ভেসে যাচ্ছে, সে রক্ত—আমার বুকের রক্ত, যাকে তুমি নাকি প্রাণাপেক্ষা ভালবাস—তারই বুকের রক্ত। চমৎকার—গুলি করতে ভাল, চোখ বুজে ফায়ার করলেই হল, কিন্তু তার পরই দেখতে পাবে জগতে তোমার সবচেয়ে বেশী নির্ভয়ের স্থান—আরামের স্থান—এই বুকটাই তুমি বিদ্ধ করেছ। মরতে আমার এক বিন্দু কষ্ট নেই, কারণ আমার সব সাধ পূর্ণ হয়ে গেছে, আর কোন আকাঙ্ক্ষা আমার নেই। তার পরও বড় কথা, তোমার হাতের গুলি আমার বুকে বিঁধবে, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাব—সে আমার হবে শেষকালের সান্ত্বনা, কিন্তু বেঁচে থেকে আজীবনব্যাপী কি সান্ত্বনা তুমি লাভ করবে সৈকত?"

সৈকত নির্নিমেষ চোখে তার পানে চেয়ে রইল—তার হাত হতে কাঁপতে কাঁপতে রিভলভারটা সশব্দে মাটিতে পড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে গুড়ুম করে শব্দ হল, গুলিটা ছিটকে দেয়ালে গিয়ে বিঁধল।

সৈকত বসে পড়ল, দুই হাতে মুখ ঢেকে সে থর থর করে কাঁপতে লাগল।

এগিয়ে গিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ইন্দ্রনীল বললে, "ভয় কি সৈকত, তোমার হাতের গুলি আমার বুক বিঁধতে পারে নি, বিঁধেছে দেয়ালটা—"

সৈকত জোর করে তার হাতখানা ছুড়ে ফেলে কম্পিতকণ্ঠে বললে "তা আমি জানি,—তোমায় বাঁচতে দিলুম। জগতে আরও অনেকদিন তোমার কাজের জের টেনে চলতে দিলুম। কিন্তু মনে হয় আজই তোমার শেষ করে দিলেই ভাল ছিল, অনেকগুলি মেয়ে বাঁচত।"

ইন্দ্রনীলের মুখে তার চিরাভ্যস্ত সুন্দর হাসি আবার ফুটে উঠল—

"বার বার একই কথা বলো না সৈকত, দোষ শুধু আমাকেই দিয়ো না, দোষ তোমাদেরও। তোমরা এসেছ কেন, কেন আমার পরে নির্ভর করতে চেয়েছ, নির্ভর করেছ? সকল মেয়েই তো মরে না—মরেও নি। বলতে পার—সুব্রতা মরেছে, সুমিত্রা মরেছে; সুব্রতাকে চেন—কিন্তু সুমিত্রাকে চেন না, তবু মিসেস সাহা সোমকে চেন। ওদের কাছে ইন্দ্রনীল ব্যর্থ হয়ে গেছে—ইন্দ্রনীল ওদের কাছে জয়লাভ করে সুখী হতে চায় নি, পরাজয়ের মধ্যে অসীম শান্তি, অসীম আনন্দ, অসীম সুখ পেয়েছে। তোমরা যদি সামান্য একটুও দিতে সৈকত—ওই ব্যর্থতা যদি আমায় দিতে—আমার জীবন সত্যকার সফলতায় ভরে উঠত।"

মুহূর্ত্ত মাত্র নীরব থেকে হাতের সিগারেটটা দূরে ছুড়ে ফেলে ইন্দ্রনীল বললে "কিন্তু পারলে না—তোমাদের ঘৃণা আমায় মানুষ করতে পারলে না, আমার পথ তাই পরিষ্কার হল না, পথে আরও কাঁটা বিছিয়ে পড়ল। ভেব না সৈকত—আমি তোমার কথা ভাবি নে। সারাদিন ছদ্মবেশে থেকে তোমাদের সঙ্গে মিশে নিস্তব্ধ রাত্রে বিছানায় যখন ক্লান্ত দেহখানা বিছিয়ে দেই, তখন অতীত আর বর্ত্তমানের অনেক কথাই মনে পড়ে, কত ছবি আমার মনে জেগে ওঠে জানো? অবিশ্রান্ত ঘটনা—ঠিক যেন বায়স্কোপের ছবি—আসছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। দাগ তারাও রেখে যায়; সে রেখা ভেসে ওঠে সেই একান্ত আমার একা-বিছানাটিতে। ভবিষ্যতের ভাবনা তোমরা সবাই ভাব, আমি ভাবতে পারি নে—আমার যে ভবিষ্যৎ আমার অজ্ঞাতে মনের মাঝে ছায়া ফেলতে আসে, তাকে দেখে আমি শিউরে উঠি—আমি ভয় পাই। আমার উজ্জ্বলতম ভবিষ্যৎ এমন ভীষণভাবে চিত্রিত করলে কে জানো—তুমি একা নও, তোমারই মত উচ্ছৃঙ্খল, আত্মসংযমহীন কতকগুলো মেয়ে—"

সৈকত একেবারে বিবর্ণ হয়ে বলে উঠল—"উচ্ছৃঙ্খল, আত্মসংযমহীন—?"

ইন্দ্রনীল বললে, "সহস্রবার—লক্ষবার। তোমাদের শিক্ষা তোমাদের সৎপথে চালনা করতে যে পারে নি, একথা অতি পামর—অতি নরাধম আমি, আমি পর্য্যন্ত জোর করে বলছি; তোমার শক্তি থাকে তুমি আমায় বাধা দাও, প্রমাণ কর আমার কথা মিথ্যে। তোমাকে দিয়েই বলছি সৈকত, তোমার শিক্ষা যদি যথার্থ সৎশিক্ষা হতো—কুমারী তুমি, আমার সঙ্গে দূরদেশে গিয়ে স্বামী-স্ত্রী-রূপে বাস করতে পারতে না। না, খুব গৌরবের কথা এটা ভেব না সৈকত, মেয়েদের পক্ষে কতখানি অপমানের, কতখানি অগৌরবের সত্যকার শিক্ষালব্ধ জ্ঞান দিয়ে যদি সেটা একবার ভাবতে। আমি অকস্মাৎ তোমায় ত্যাগ করব না; কিন্তু যদিই ত্যাগ করি, আজই সামনে যে রাত আসছে সে রাতে তোমায় কে আশ্রয় দেবে সৈকত? তুমি যেখানে এসে আজ দাঁড়িয়েছ—আশ্রয় মিলবে আমারই মত লোকের কাছে, যাঁরা মেয়েদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। কিন্তু মাঝে আর দুটো মাস মাত্র, তার পরেই তুমি যাকে এই পাঁকের মাঝে কুড়িয়ে পাবে।"

"তুমি—তুমি এ কথা বলছ—তুমি—"

দুর্ণিবার বেদনায় দুই হাতে বুকখানা চেপে ধরে সৈকত উপুড় হয়ে পড়ল। চোখে জল এল না,—তার চোখ চির-দিনই শুষ্ক,—সে শুধু ছটফট করতে লাগল।

(৩০)

ইন্দ্রনীল অপলক দৃষ্টিতে তার পানে খানিক চেয়ে রইল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়তে পড়তে সে সামলে নিলে, স্থিরকণ্ঠে বললে "হ্যাঁ, আমিই বলছি। বলতুম না সৈকত, কারণ এত সুন্দরী মেয়ের মধ্যে কুৎসিতা তুমি—তবু তোমায় আমি সত্যকার ভালবাসি। তবু বললুম, কারণ তুমি আমায় নির্দ্দয়ভাবে আঘাত দিয়েছ।"

খানিক চুপ করে থেকে সে বললে, "যাক, এ কথার মীমাংসা এখানেই হয়ে যাক। মোট কথা এটুকু জেনো—আজ আর তোমার কোথাও যাওয়ার পথ নেই। আমার ঘৃণা অবজ্ঞা, আদর অনাদর সব সয়েও তোমায় এখানে থাকতে হবে—"

সৈকত উঠে বসল। চুলগুলো খুলে গিয়ে তার বুকে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল, দুই হাতে সেগুলো পেছনে সরাতে সরাতে সে গর্জ্জে উঠে বললে "কখনও না, আমি—"

বাধা দিয়ে মৃদু হেসে ইন্দ্রনীল বললে "কিন্তু আর উপায় নেই সৈকত,—পথ নেই। তোমার সন্তান অনাগত নয়, এসে পড়েছে, দুমাস পরে সে ভূমিষ্ঠ হবে। কোথায় দাঁড়াবে, কে তোমায় অন্ততঃ তখনকার মত আশ্রয় দেবে?"

সৈকত নতমুখে কি ভাবছিল।

ইন্দ্রনীল বললে, "এই খানটাতে এসেই মেয়েরা চমকে যায়, এই ভবিষ্যতের কথা ভেবেই তাদের বিয়ে করতে হয়, তাদের পরাধীনা হতে হয়, এ কথাটা এবার বুঝতে পারছ সৈকত? সন্তান আসে বলেই তারা আগে হতে এত পরম স্নেহময়ী, অনাগত ভবিষ্যতের ভাবনাও তাদের ভাবতে হয়। এ দেশ বিলেত নয়, জারজ সন্তানদের জন্যে দেশে দেশে হোম এখনও তৈরী হয় নি। যা দুই একটা আছে, সেখানে যে সব শিশু লালিতপালিত হয়—বিশ্বে তারা চির পা ত্যক্তই থেকে যায়। তোমার সে ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান হয়ে সামনে এসেছে—তোমার সন্তানকে রক্ষা করতে, তাকে জনসমাজে পরিচিত করতে এখন আমার আশ্রয়ে থাকার দরকার।"

সৈকত মুখ তুললে—

ধীরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে "আমার সন্তান কি নামে পরিচিত হবে?"

ইন্দ্রনীল আর একটী সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললে "যে নামেই হোক, পরিচিত হবেই।"

সৈকত তবু জিজ্ঞাসা করলে "তোমার ধর্ম্মপত্নী বলে আমায় গ্রহণ করতে পারবে, আমার সন্তান ধর্ম্মসঙ্গতভাবে তোমার সন্তান নামে পরিচিত হতে পারবে?"

ইন্দ্রনীল হেসে উঠল—

"কি বাজে বকছো সৈকত, আজ তোমার কি হয়েছে বল দেখি? যত রাজ্যের ভাবনা সব এসে জমা হয়েছে তোমার মাথায়, অথচ সে সব ভাবনার মাথামুণ্ড কিছু নেই। ধর্ম্মপত্নী কাকে বলে—দুটো মন্ত্র পড়া, বাহ্যিক অনুষ্ঠান করা; আজ তারই জন্যে এত লালায়িত হয়ে পড়লে? আমাদের অন্তরে যে মিলন হয়েছে, সেটাকে তা হলে সত্য বলে মানতে তুমি রাজি নও?"

মুক্তকণ্ঠে সৈকত বললে, "না, আজ রাজি হতে পারছি না। যতদিন নিজের জন্যেই নিজের দরকার বুঝেছি, ততদিন খুসির খেয়ালে চলেছি, পেছন ফিরে কোনদিকে চাইবার দরকার হয় নি। কিন্তু আজ আমি নিজের দরকার বুঝছি মায়ের প্রয়োজন হয়েছে বলেই—তাই নিজের চেয়ে মায়ের দাম এখানে বেশী হয়েছে।"

একমুহূর্ত্ত নীরব থেকে ইন্দ্রনীল বললে "কিন্তু আমার পিতৃত্বের দাবী—"

বাধা দিয়ে ঘৃণাভরে সৈকত বললে "নেহাৎ মিছে কথা, আমায় উপস্থিত প্রবোধ দেওয়ার কথা। পিতৃত্ব, কিন্তু সে তো তোমার এই নতুন নয়। একটি অভাগিনী মেয়ে একটি শিশুকে নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে—সে শিশুর আশ্রয় নেই, খাওয়ার সংস্থান নেই—মনে কর, সে সন্তান তোমার। আজ আমার কোলে যে আসছে, কে বলতে পারে—পাছে সে দাবী করে এই ভয়ে কাছে পেয়ে কোনদিন তুমি তার গলা টিপে দেবে কিনা, তাকে কিছু খাইয়ে দেবে কিনা।"

ইন্দ্রনীল হাসতে লাগল—

"বাঃ, এই যে, মা না হয়েই সন্তানের ভাবনা ভাবতে শিখেছ। সত্যি সৈকত, এই জন্যেই মেয়েদের আমার বড় ভাল লাগে। মাকে আমি আমার প্রাণের শ্রদ্ধা ভক্তি নিবেদন করে দেই। সন্তান জন্মের সম্ভাবনা হতে মেয়েরা কতখানি উদ্বেলিত হয়ে ওঠে তার জন্যে। তখন সে সব ভুলে যায়—মনে হয় না তখন সে মেয়ে, বোন, স্ত্রী—তখন হয় সে শুধু মা। চমৎকার—সত্যি বড় চমৎকার—"

সৈকত উত্তর দিলে না, তার পা হতে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলে যাচ্ছিল। নিদারুণ অপমানে রাগে দুঃখে সে কি করবে—তা ভেবে পাচ্ছিল না।

ইন্দ্রনীল টোকা দিয়ে সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বলে "কিন্তু দোহাই তোমার, আমার সম্বন্ধে অতখানি কুৎসিত ধারণা তুমি করো না। ছোট ছেলেমেয়েদের সত্যি আমি ভালবাসি। ওরা মোমে তৈরী হাত পা নেড়ে কি চমৎকার খেলা করে, কি চমৎকার হাসে, কাঁদে; কি চমৎকার চীৎকার করে। এতটুকু একটি শিশুকে তুলতে পারলেও তার খেলা দেখতে, হাসি কান্না দেখতে সত্যি কি ভাল লাগে। মিছে কথা বলছি নে সৈকত, আমার মত লোকও পথ চলতে চলতে কোন শিশুকে কাঁদতে দেখলে থমকে দাঁড়িয়ে যায়। অতটুকু শিশু—দেবতার পবিত্র আশীষ, তার আমি ক্ষতি করতে পারি, তাকে আমি মেরে ফেলতে পারি, এ ধারণাটাও তোমার মনে এল—এই আশ্চর্য্য।"

সৈকত এ লোকটির নির্জ্জলা ন্যাকামো আর সইতে পারলে না, শক্তভাবে বললে "হ্যাঁ, এ ধারণা আমার মনে আসে—আমার মনে হয়—তুমি সব পার—সব করতে পার, তোমার অসাধ্য কিছু নেই।"

ইন্দ্রনীল বললে, "আর তোমাদের অসাধ্য—?"

কথাটা বলেই সে সৈকতের পানে চাইল।

সৈকত আশ্চর্য্য হয়ে গিয়ে বললে, "আমাদের সাধ্য—"

ইন্দ্রনীল বললে "আমাদের অসাধ্য কিছু নেই। একা তুমি নও সমস্ত মেয়েরাই এ কথা বলে থাকে; তেমনই আমরাও একথা বলতে পারি সৈকত—তোমরা মেয়ে, কিন্তু তোমাদের অসাধ্যও তো কিছু নেই সৈকত, বরং অতি অসম্ভবকে তোমরাই সম্ভব করে আনো। পৃথিবীর ইতিহাস খুলে তার পাতা উল্টে গেলে দেখা যাবে—দুনিয়ায় যা কিছু অকল্যাণ, সবই সাধিত হয়েছে তোমাদের দ্বারা। অত বড় দেশ ট্রয় ধ্বংস হয়ে গেছে, গ্রীস রোম ভারতবর্ষ, কোন জায়গাতেই তোমাদের ধ্বংসলীলা ফুটে উঠে নি? যাঁরা তোমাদের চিনেছেন তাঁরা তোমাদের প্রাণপণে এড়িয়ে গেছেন, তোমাদের জাতিটাকে আমল দিতে চান নি। ইতিহাস পড়েছ সৈকত—মনে করে দেখ দেখি, কোন জায়গায় তোমরা নেই—বাদ গেছ?"

সৈকত অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল, হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল "তুমি যাও,—যাও তুমি এখান হতে, আমি আর তোমার কোন কথা শুনতে চাই নে, একটি কথাও না—"

ইন্দ্রনীল সোজা হয়ে দাঁড়াল—

"চমৎকার, আমি এখনই চলে যাচ্ছি, কিন্তু একেবারেই যাব না, আবার খানিক পরে তোমার রাগটা পড়ে গেলেই আসব। যাই বল—যাই কর, এটুকু মনে করো সৈকত—আমি তোমায় বাস্তবিক ভালবাসি। তোমার জন্যে আমায় অনেক ক্ষতি সইতে হয়েছে, অনেক বন্ধু আমি হারিয়েছি, যেখানে গেছি সেখানে বিদ্রূপ শুনেছি—তবু

তোমায় আমি ছাড়তে পারি নি। আমাদের মত অপদার্থ লোকেরা এমন কাজ অনেকেই করে থাকে, আমিও যে করি নি তা নয়—সে প্রমাণ তুমি যথেষ্ট পেয়েছ। তবে এমন করে কাউকে কেউ একান্ত সান্নিধ্যে রাখে নি,—আমিও রাখি নি—যেমন করে তোমায় রেখেছি। তাই বলছি সৈকত, আমায় যতটা ভয়াবহ মনে করেছ, হয় তো ততটা নই, ওই সামান্য কোমলতাটুকু আমার মধ্যে থেকে আমায় নষ্ট করে ফেলেছে, নচেৎ বেশই থাকতুম। সংস্কার জিনিসটাই এমনি—ছাড়ালেও ছাড়তে চায় না, চিরন্তন অভ্যাসের মত অত্যন্ত সহজভাবে সঙ্গে থেকে যায়, সে যে আছে সে অস্তিত্ব শেষটায় আর জানাই যায় না। আচ্ছা, তোমায় আর বিরক্ত করব না এখন, খানিকটা একা থাক, তারপর আবার যখন দেখা হবে তখন নিশ্চয়ই তোমায় স্বাভাবিকভাবে দেখতে পাব।"

আস্তে আস্তে সে বার হয়ে গেল।

বদ্ধদৃষ্টিতে সৈকত দরজাটার পানে তাকিয়ে রইল, তারপর হঠাৎ দুই হাতে মুখ ঢেকে বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়ল—উচ্ছ্বসিতভাবে সৈকত কাঁদতে লাগল।

এমনভাবে সর্ব্বহারার মত কান্না তার জীবনে এই প্রথম।

ইন্দ্রনীল যদি থাকত সে নিশ্চয়ই আশ্চর্য্য হয়ে যেত।

(৩১)

রাত্রে এসে ইন্দ্রনীল যখন দরজা ঠেললে—সৈকত কোনও সাড়া দিলে না।

তাকে বিশ্রাম দেওয়া আবশ্যক ভেবে ইন্দ্রনীল নিজের ঘরে ফিরে গেল।

জানালার ধারে চেয়ারখানা টেনে এনে সে বসে পড়ল—

নীচে বাগানটা ভরে গেছে চাঁদের আলোয়—বড় চমৎকার দেখাচ্ছে। ওপরে আকাশে হাসছে শুক্লা দশমীর চাঁদ, আশে পাশে জেগে আছে কত লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র।

আজই সুমিত্রার একখানা পত্র পাওয়া গেছে।

অনেকদিনই চলে গেছে সে চলে যাওয়ার পরে—ইন্দ্রনীল তখন ব্লকে কখানা ঘর নিয়ে ছিল, তার এ বাড়ী তখনও ভাড়া দেওয়া ছিল। বিলেতে যাওয়ার সময় কয়টা বছরের মত বালিগঞ্জের এ বাড়ীখানা সে ভাড়া দিয়ে গিয়েছিল, মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে সে নিজের বাড়ীতে এসে উঠেছে।

সুমিত্রার কথা আজও তার মনে পড়ে।

দীর্ঘনিশ্বাস সে রোধ করতে পারে না।

সত্যই মানুষের চৈতন্য ফেরে অবশ্য অনেক পরে, অনেক আঘাত সহ্য করে। অনেক ঠেকে যে অভিজ্ঞতা মানুষ লাভ করে, তার দাম অনেক—

সুমিত্রা সেই অভিজ্ঞতাই লাভ করেছে। জীবনভোর সে শান্তি ও তৃপ্তির আশায় কেবল মরীচিকার পেছনেই ছুটে বেড়িয়েছে, তৃষ্ণায় তার বুক ফেটে গেছে, অথচ এক ফোঁটা জল সে পায় নি।

ইন্দ্রনীল তুলনা করে সাহা সোমের সঙ্গে।

বেচারা ডাক্তার সোম—ভারি কষ্টই পাচ্ছেন। আজ কয়দিন হতে তাঁর অসুখ, কলকাতায় এসেছেন। খবর পেয়ে ইন্দ্রনীল কাল হতে তাঁকে দেখতে যাচ্ছে।

ওই আত্মভোলা লোকটির গভীর বুকের তলায় সর্ব্বত্যাগিনী স্ত্রীর জন্যই যে এতটা স্নেহ ভালবাসা আছে, তা ইন্দ্রনীল জানত না।

মিসেস সোমের কাছে বরাবরই সে শুনে এসেছে—তাঁর স্বামী তাঁর সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন। অসুখ হলেও কোনদিন জিজ্ঞাসা করেন নি—কেমন আছ। অতি বড় দুঃখেই তিনি স্বামী সঙ্গ ত্যাগ করেছেন। সুখী হয়েছেন কি?

কে জানে সে কথা। হয় তো সেই কঠিন হৃদয়ের তলায় অনেকখানি প্রেমই জমা হয়ে আছে, বাইরে হতে কেউ তার সাড়া পায় না—মাঝে মাঝে তর্কের মুখে অতি গোপনীয় কথা দুই একটা প্রকাশ হয়ে পড়ে।

মেয়েদের মনের আড়ালে অনেক কিছুই চাপা থাকে; ইন্দ্রনীল জানে তার নাগাল পাওয়া যায় না।

সুমিত্রা আজ পত্র দিয়েছে—

জানিয়েছে সে তার এ স্বামীকে ডাইভোর্স করেছে। জীবনে সে যথেষ্ট ভুল করেছে, জ্ঞান যে তার ফিরেছে তাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। সে পবিত্র জীবন যাপন করতে মনস্থ করেছে, পরীক্ষা করে দেখেছে তার বর্ত্তমান জীবনটাই সব চেয়ে শান্তিজনক।

একটা নিশ্বাস ফেলে ইন্দ্রনীল ভাবছিল—হয় তো মানুষ

সত্যই সত্যপথ চিনতে পারে, ভুলের পথে জীবন নাট্যের যবনিকা দেয় না।

জীবনের পরে সত্যই ইন্দ্রনীলের বিতৃষ্ণা জেগে উঠেছে, ভোগ-বিলাসে তার অতৃপ্তি এসেছে। কৌষিকী, হিন্দোল, মেরু, স্বর্ণ প্রভৃতি মেয়েরা আজ তার কাছ হতে চিরবিদায় নিয়েছে—ওরা সব আজ তার কাছে মরে গেছে।

ওদের যৌবন যেন আর নেই—মেয়েদের মধ্যে বিশেষত্ব আজ সে খুঁজে পায় না। একান্তভাবে তার মন পেতে চাইছে এমন একটি মেয়েকে—যে সত্যকার নারী, মা, গৃহিণী। কিন্তু কোথায় সে, কোথায় সে মেয়ে?

হয় তো আছে। ইন্দ্রনীলের মন সে মেয়ের উপস্থিতি মেনে নেয়, কিন্তু তার থাকার জায়গাটা কল্পনা করে সে বিবর্ণ হয়ে ওঠে, মলিন হয়ে যায়। সে মেয়ে রয়েছে দুর্ভেদ্য দুর্গের মাঝখানে অত্যন্ত নিরাপদভাবে। সেখানে যাওয়ার যে পথ আছে সে পথও তেমনি দুর্গম,—সে দুর্গে পৌঁছাবার আয়াস সহ্য করার ক্ষমতা থাকা চাই, ধৈর্য্য থাকা চাই, সাধনা থাকা চাই।

কল্পনায় ইন্দ্রনীল সেই মেয়েটির মূর্ত্তি মনে আঁকে।

সে গৃহশ্রী, সে লক্ষ্মীমূর্ত্তি, সে অন্নপূর্ণা। বাইরের ভোগ-বিলাস তাকে স্পর্শ করতে পারে না—নিজের প্রাচুর্য্যে সে পূর্ণ হয়ে উঠেছে, তার চারিদিকে তাই শূন্যতা নেই, আছে পূর্ণতা।

রিক্ততা তাকে স্পর্শ করতে পারে নি, বেদনা তার অনুভূতি নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে—ফাঁক পায় না, এতটুকু অবকাশ সে মেয়ে কাউকে দেবে না।

ইন্দ্রনীল দেখতে পায় লাল শাঁখাপরা তার হাত দুখানি সুন্দর, পা দুখানি আলতায় লাল, আরও দেখতে পায়—তার সিঁথায় সিঁদুর জ্বল জ্বল করে জ্বলছে—

অকস্মাৎ সে চমকে ওঠে—এ কি, কার কথা বলছে সে—এ যে সেই মেয়েটি, যে আহত মেয়েটিকে বুকে চেপে ধরেছিল—

ইন্দ্রনীল নিজেকে ফিরানোর চেষ্টা করে।

সামান্য পল্লীবাসিনী সে—

কিন্তু মিথ্যা সান্ত্বনা—মন বলে ওরই মধ্যে সব মেলে,—সাহস, শক্তি, সংযম, শিক্ষা—

ছলনা নাই, চাতুরী নাই, আছে মুখের ওপর স্পষ্ট উত্তর দেওয়া—

কিন্তু সৈকত—

ইন্দ্রনীল অকস্মাৎ আড়ষ্ট হয়ে যায়।

নিজের ওপরও রাগ হয় কম নয়।

বেচারা সৈকত—কোথায় ছিল, কোথায় এসেছে। আজ যে মাতৃত্ব সে লাভ করছে, এ সে মেনে নিতে পারছে না—একে পেয়ে সে সঙ্কুচিত—লজ্জিত হয়ে উঠেছে।

অবহেলিত—ঘৃণিত মাতৃত্ব—

যখন সন্তান বড় হয়ে জানতে চাইবে তার বাপ কে—সৈকত যাকে দেখাবে সে খুসিমত বাপ হতে পারে মাত্র, অধিকার বোধ নেই।

চাঁদ ক্রমে পশ্চিমে ঢলে পড়ছিল, নারিকেল গাছটার আড়ালে পড়েছিল—বাতাসে সরু সরু পাতাগুলি ঝির ঝির করে কাঁপছিল, তারই ফাঁকে চাঁদটাকে দেখে নেওয়া যাচ্ছিল মন্দ নয়।

ইন্দ্রনীল তার দিকে তাকিয়ে ভাবছিল।

আকাশের বা চাঁদের সৌন্দর্য্য নয়, ভাবছিল সৈকতের কথা।

সত্যই সে সৈকতকে ভালবাসে। সে কুশ্রী হলেও তার অন্তর আছে, প্রাণের বিকাশ তার মধ্যে ফুটতে সে দেখেছে, ইন্দ্রনীল তার কাছে নিজেকে ধরা দিয়েছে।

আর সৈকত?

সেও কি নিজের সর্ব্বস্ব ইন্দ্রনীলকে দেয় নি? ইন্দ্রনীলের আজ জগতে আশ্রয় মিলবে, কিন্তু সৈকতের আশ্রয় কোথায়? ইন্দ্রনীলের সব দোষ আবার ঢাকা পড়ে যেতে পারে কারণ সে পুরুষ, কিন্তু সৈকত—তার দোষ তো ঢাকবে না।

মেয়েরা পুরুষদের সমান অধিকার পেতে যতই দাবি দাওয়া করুক, তবু ওরা পুরুষদের সমান হতে পারবে না, তবু তাদের অনেক পেছিয়ে থাকতে হবে, কারণ তারা মা।

তারা জগতে এসেছে কুড়াতে—সঞ্চয় করতে—নিজের সমস্ত দিয়ে তারা যা পায় তা অতি সামান্য; কিন্তু তাই হয় তাদের শৃঙ্খল—কারণ সে তাদের মাতৃত্ব।

অভাগিনী সৈকত—

আজ তারই জন্য ইন্দ্রনীলের প্রাণটা কাঁদছিল। না, ওকে ইন্দ্রনীল কোথাও যেতে দেবে না, যাতে ওর কষ্ট হয়

তা সে করতে দেবে না ; তার স্নেহ দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে—সে তাকে ছেয়ে রাখবে।

চাঁদ আস্তে আস্তে ডুবে গেল, আকাশটা তখনও উজ্জ্বল রঙ্গে রঞ্জিন হয়েছিল।

দূরে পথ দিয়ে দুই একখানা মোটর ছুটছিল, হর্ণের শব্দটাই কাণে আসছিল মাত্র। বাড়ীর সামনে গেটের দুধারে কয়েকটি বড় বড় ঝাউ গাছের পাতা হতে অতি মিষ্ট সন সন শব্দ ভেসে আসছিল। রাত্রিচর দুই একটা পাখী অন্ধকারে গাছের পাতায় বসতে পাতার শব্দ শোনা গেল।

একটা নিশ্বাস ফেলে ইন্দ্রনীল উঠে দাঁড়াল।

আবার আস্তে আস্তে এসে সে সৈকতের ঘরের রুদ্ধ দরজার সামনে দাঁড়াল, কাণ পেতে শুনতে চেষ্টা করলে ভেতর হতে অন্ততঃপক্ষে নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দটা শোনা যায় কিনা।

দরজায় টোকা দিয়ে ডাকলে—"সৈকত—"

উত্তর পাওয়া গেল না।

কি একটা অজানিত আশঙ্কায় হৃদয় মন পূর্ণ হয়ে উঠেছিল—ইন্দ্রনীল আবার দরজায় ধাক্কা দিলে,—ডাকলে "সৈকত"—

ভেতর হতে বিকৃত কণ্ঠে সৈকত উত্তর দিলে, "আছি, তোমায় মিনতি করছি আর আমায় বিরক্ত করো না, তুমি আজ রাত্রের মত আমায় নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে দাও।"

ইন্দ্রনীল অনুনয়ের সুরে বললে "তবু একটিবারের জন্যে দরজা খোল, আমার একটা দরকার আছে।"

সৈকত তেমনই আর্দ্রকণ্ঠে বললে "দরকার কাল হবে, আজ তুমি যাও।"

ব্যগ্রকণ্ঠে ইন্দ্রনীল আবার ডাকলে "সৈকত—"

সৈকত উত্তর দিলে "ভয় নেই, আমি মরব না, আত্ম-হত্যা করব না। একবারও সে কথাটা যে মনে হয় নি তা নয়, কিন্তু তারপরই ভাবলুম তোমার মত একটা খেয়ালীর খেয়ালে পড়ে নিজের জীবন বিসর্জ্জন দেওয়ার মত বোকামী আর নেই। অনেক ভেবে সে সঙ্কল্প ত্যাগ করেছি,—আমার সন্তানের জন্য আমায় বাঁচতেই হবে—যতদিন তার আমাকে দরকার হয় অন্ততঃ ততদিনের জন্য। যাও, আর আমায় বিরক্ত কর না।

ইন্দ্রনীল একটা নিশ্বাস ফেলে সরে এল।

পাগল মেয়ে—কেবল তোমারই সন্তান—ইন্দ্রনীলের কেউ নয় ?

কেউ নয়—সত্যই কেউ নয়। ইন্দ্রনীল কেবল সেই শিশুকে কেন, সৈকতকে পর্য্যন্ত অস্বীকার করতে পারবে। এমন কোনও আইন নেই—

কিন্তু ছি, এ সব চিন্তাই বা তার মনে জাগছে কেন ?

ইন্দ্রনীল জোর করে অন্য চিন্তা মনে জাগাবার চেষ্টা করতে লাগল।

(ক্রমশঃ)

জৈত্র-যাত্রা

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

হয় নাই কভু জড়ের মরণ, নাইরে মরণ চেতনার ;
সবাই অমর, বিকশিত নর—মথি' অন্তর বেদনার
যুদ্ধের পর আসিছে যুদ্ধ জাগে প্রবুদ্ধ সুরবীর,—
উদয়ের পর আসিছে উদয়—উজ্জ্বল' তার দূর তীর।

ব্রজে প্রহত বিজয়-ডঙ্কা স্থিতি ভূকম্পে আগুয়ান,
ঝড়ের বাতাসে আসিছে শুদ্ধি ; ক্রুদ্ধ নহে রে ভগবান।
চূর্ণ রেণুর কণায়-কণায় গড়িয়া উঠিছে অসীমায়,
ভিত্তির পরে নূতন ভিত্তি অশেষ কীর্ত্তি মহিমায়।

গতিবিভঙ্গে বাড়িছে চেতনা বাধার আঘাতে আঘাতে,
মথিত ধারায় প্রেমের ঊর্ম্মি নাচিছে তাহায় জাগাতে।
বিরহে মিলনে শিহরি'-শিহরি' উথলে মাধুরী জীবনের,
উদিছে বৃদ্ধ—আসিছে ঋদ্ধি—সাধিছে সিদ্ধি ভুবনের।

ভাঙ্গিয়া রুদ্ধ গুহার দুয়ার উৎসরে প্রীতি-নির্ঝর—
করিছে সিক্ত তৃষিত কণ্ঠ, করিছে জীর্ণে নির্জ্জর ;
দুহিয়া পীযূষ বক্ষে-বক্ষে তুলিছে দুঃখ-নবনী—
চোখের ধারায় করুণা গড়ায় প্রেমেতে জড়ায় অবনী।

সীমায় অধীর চলে সুরবীর জয়ের পতাকা তুলিয়া—
প্রসারিয়া প্রাণ কর গো মহান্, বাধা-ব্যবধান ভুলিয়া।

স্মৃতি-তর্পণ

শ্রীজলধর সেন

এবার যাঁহার স্মৃতি তর্পণ করে ধন্য হব, কৃতার্থ হব, তিনি বাঙ্গালা দেশের নেতৃবর্গের অন্যতম ছিলেন, দেশের লোক তাঁহাকে দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা করত, ভক্তি করত। তিনি পরলোকগত মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত। বরিশালের অশ্বিনীবাবুকে কে না জানত, কে না চিনত ? তিনি ছিলেন বরিশালের মুকুটহীন রাজা ; বরিশালের আবালবৃদ্ধ-বনিতা, ধনী নির্ধন সকলের তিনি পরমাত্মীয় ছিলেন,—সমস্ত বরিশাল জেলার লোক অশ্বিনীবাবুর কথায় উঠিত বসিত—তাঁহার জন্য প্রাণ দিতে পারিত। পূর্ব্ববঙ্গের সে সময়ের যুবক দলের কমাণ্ডার-ইন-চিফ ছিলেন অশ্বিনীবাবু। বরিশালে যত কিছু অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সকলের অগ্রণী ছিলেন অশ্বিনীকুমার। অশ্বিনীকুমারই ছিলেন বাঙ্গালার স্বদেশী যজ্ঞের প্রথম পুরোহিত ; তাঁহারই প্রেরণায় বাঙ্গালা দেশে সর্ব্বপ্রথম স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের আন্দোলন আরম্ভ হয়। তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, তাঁহার দেশহিতে উৎসর্গীকৃত জীবন, তাঁহার অকপট ধর্ম্মনিষ্ঠা, তাঁহার মহানুভবতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা সত্যসত্যই তাঁহাকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এতকাল পরে আমার সেই সোদরাধিক প্রীতিভাজন, আদর্শস্থানীয় সুহৃদের স্মৃতি-তর্পণ করছি।

সে ইংরাজী ১৮৮৭ অব্দের কথা—প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। আমি তখন এল-এ ফেল করে ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দে মাষ্টারী করি। মাষ্টারী করা ছাড়া তখন আমার উপায়ান্তর ছিল না ; একটু রয়ে-বসে চেষ্টা-চরিত্র করলে, কিছুদিন কোন সরকারী আফিসে ঘরের খেয়ে শিক্ষানবিশী করলে হয় ত কোন একটা ভাল চাকুরী জুটতে পারত। কিন্তু তখন আমি এমনই বিপন্ন, আমার তখন অর্থের এমন প্রয়োজন হয়েছিল যে, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে এল-এ ফেল করে তার পরবৎসরই আমাকে চাকুরীতে প্রবিষ্ট হ'তে হয়েছিল। যে বৎসর আমি এল-এ ফেল করলাম, সেই বৎসরই আমার একমাত্র কনিষ্ঠ সহোদর শশধর আমাদের গ্রামের ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। আমি বৃত্তি পেয়েছিলাম, তাই দুই বৎসর কলেজে পড়বার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল ; আমার ভাই শশধর বৃত্তি পান নাই। তাঁরই পড়াবার খরচ সংগ্রহের জন্য আমাকে মাষ্টারী চাকুরী গ্রহণ করতে হয়েছিল। আমার ছোট ভাই শশধর খুব বুদ্ধিমান ছিলেন। কেন যে তিনি ভালভাবে পাশ করতে পারলেন না, তা আমি বুঝতে পারলাম না।

আমরা দুই ভাই ; শশধর আমার আড়াই বছরের ছোট ছিলেন। তাঁর বয়স যখন ছয় মাস, তখন আমরা পিতৃহীন হই ; বড় হয়ে তিনি আমাকে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভাই বলে যে শ্রদ্ধা করতেন তা নয়, আমাকে তিনি তাঁর জীবনের অবলম্বন বলেই মনে করতেন। তাই, আমি যখন ফেল হলাম, আর তিনি পাশ হলেন, তখন তিনি জেদ করতে লাগলেন যে, আমি আর এক বৎসর পড়ি। তিনি পড়াশুনা ত্যাগ ক'রে পনর কুড়ি টাকার একটা মাষ্টারী কি অন্য চাকুরী নিয়ে আমার পড়ার খরচ চালাবেন এবং নিজেও ঘরে পড়াশুনা করে মোক্তারী পরীক্ষা দেবেন। পিতৃহীন একমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতার এ প্রস্তাব আমি গ্রহণ করতে পারি নাই—আমি যে তার দাদা—সে যে আমার বড় আদরের পিতৃহীন ছোট ভাই। আমাদের সংসারের কর্ত্তা, আমাদের বড় দাদা শশধরের এই প্রস্তাব অনুমোদন করেছিলেন ; কিন্তু আমি আমার পর পূজনীয় বড় দাদার আদেশ অমান্য করেছিলাম।

তখন বড় দাদা গোয়ালন্দের ফৌজদারী আদালতের পেস্কার ছিলেন, পরে হেড ক্লার্ক হন। তিনি চেষ্টা করে আমাকে গোয়ালন্দ স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক পদে নিযুক্ত করিয়ে দিলেন। বেতন হোলো ন দ চব্বিশ টাকা পনর আনা—অর্থাৎ বেতন পঁচিশ টাকাই হোলো, তার থেকে মাইনে প্রাপ্তির রসিদ ষ্ট্যাম্পের দাম এক আনা কেটে নিয়ে স্কুলের কর্ত্তারা আমাকে চব্বিশ টাকা পনর আনা দিতেন। কলেজে পড়বার সময় সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ, কালীচরণের বক্তৃতা শুনে, স্বদেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করব, ম্যাট্‌সিনি গারিবল্‌ডি হব, দেশের মধ্যে দশজনের একজন হব বলে আকাশে যে

বাড়ী তৈরী করতাম, এক আঘাতে তা চূর্ণ হয়ে গেল—ভবিষ্যৎ দেশ-সেবার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল—বিধাতার বিধানে আমি হলাম এক গ্রামের স্কুলের পঁচিশ টাকা বেতনের থার্ড মাষ্টার। কি করব, ঐ কয়টী টাকা না হলে যে আমার ছোট ভাইয়ের কলেজে পড়া বন্ধ হয়। তাই, আমি ঐ ready-made চাকরী নিতে বাধ্য হয়েছিলাম—অপেক্ষা করবার আমার সময় ছিল না।

আর এই মাষ্টারী চাকুরীটি বেশ! ও-কাজের জন্য কোন প্রকার আয়োজন করতে হয়না, শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় না। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষায় পাশ বা ফেল হ'লেই মাষ্টারী করবার সনন্দ পাওয়া যায়। অমন সোজা চাকুরী আর নেই; একদিনের জন্যও মাষ্টারীর শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় না। ছেলে পড়ানো বিদ্যাটা আমরা এতই সহজ করে নিয়েছিলাম! ওর জন্য সাগরেদী করতে হয় না—একেবারে ওস্তাদ শিক্ষক। তা, যাই বলি না কেন, ঐ সহজপ্রাপ্য (এখন কিন্তু দুষ্প্রাপ্য) চাকুরীর পথ খোলা ছিল ব'লে আমাদের মত ফেল করা মূর্খেরাও পার হয়ে গিয়েছিল।

থাকুক সে কথা। ১৮৮১ অব্দে পঁচিশ টাকা বেতনে গোয়ালন্দ স্কুলে থার্ড মাষ্টার হয়েছিলাম। দাদার কাছে থাকি, কোন ভাবনা নেই। মাইনের টাকা এনে বৌদিদির হাতে দিই; তিনি আমার ছোট ভাইয়ের পড়ার খরচ পাঠিয়ে দেন। খাই দাই, ছেলে পড়াই, পূর্ব্ব সংস্কার-বশে স্বদেশীও করি, ছেলেদের নিয়ে সভাসমিতি করি, বড়দের সঙ্গে মিশে দেশোদ্ধারেরও পাণ্ডাগিরি করি। গোয়ালন্দের উকিল মোক্তার, বড় বড় কর্ম্মচারী সকলেই আমাকে ভালবাসতেন ও আদর করতেন, কারণ আমি বাল্যকাল থেকেই গোয়ালন্দে ছিলাম। গোয়ালন্দের মাইনর স্কুল থেকেই পরীক্ষা দিয়ে পাঁচ টাকা বৃত্তি পাই, তারপর অবস্থা-বিপর্য্যয়ে সেই মাইনর স্কুল এণ্ট্রান্স স্কুলে পরিণত হলে আমি শিক্ষক হয়ে আসি। এই জন্যই আমি সকলের কাছে আবদার করতে পারতাম এবং তাঁরা সানন্দে আমার অনুরোধ রক্ষা করতেন।

সেই যে ৮১ অব্দে ২৫৲ টাকা বেতনে মাষ্টারী আরম্ভ করেছিলাম, ৮৫ অব্দের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত আমার সে মাইনে আর বাড়েনি। ঐ সালের শেষ ভাগে স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষের শুভদৃষ্টি আমার উপর পড়ল। তাঁরা আমার বেতন ৫৲ টাকা বাড়িয়ে দিলেন। এ যে আমার যোগ্যতার পুরস্কার, সে কথা মনে করবেন না বন্ধু! পাড়াগাঁয়ের স্কুলের মাষ্টারদের যোগ্যতার পুরস্কার তখনও কেউ দেয়নি; এখনও দেয় না। আমার এ বেতন বৃদ্ধির কারণ এই যে স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষরা নানাভাবেই জানতে পেরে ছিলেন যে আমাদের দরিদ্র সংসারে আর একটী লোক বৃদ্ধি হয়েছে। সেই নবাগত লোকটীর খোরাকি বাবদ তাঁরা আমার ৫৲ টাকা বেতন বৃদ্ধি করে দেন। সে নবাগত আর কেহ নন—আমার স্ত্রী। সেই বৎসরের প্রথম ভাগে আমি বিবাহ করি।

এইবার আসল কথা বলি। ১৮৮৬ অব্দের শেষ ভাগে ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা নগরীতে জাতীয় মহাসমিতির (কংগ্রেসের) দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনে আমি গোয়ালন্দের জনসাধারণ কর্ত্তৃক প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়ে যাই। তখনও কিন্তু আমার মধ্যে ম্যাট্রিনি, গ্যারিবল্ডির অস্তিত্ব লোপ পায়নি। ১৮৮৫ অব্দে বোম্বাইতে প্রথম কংগ্রেস্ হয়। আমাদের দেশপূজ্য উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Bonnerji) সেই কংগ্রেসের সভাপতি হন। তিনিই দ্বিতীয় বৎসরের কংগ্রেসকে কলিকাতায় আহ্বান করেন। দ্বিতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হন সর্ব্বজনমান্য দাদাভাই নৌরজী মহাশয়, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়। দেশের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এই কংগ্রেসে যোগদান করেন, এমন কি মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় পর্য্যন্ত এই কংগ্রেসে বক্তৃতা করেন। আমি গণ্যমান্য না হলেও আমার প্রবাস-স্থানের প্রতিনিধি হয়ে এই কংগ্রেসে যোগ দিই।

প্রথম দিনের কংগ্রেসের অধিবেশন হয় টাউন হলে। কলিকাতার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি মনে করেছিলেন নানা স্থানের প্রতিনিধি ও দর্শকে এত অধিক লোক হবে যাদের স্থান ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে না হতে পারে।

কোন প্রকারে প্রথম দিনের কার্য্য শেষ হয়ে গেল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও মূল সভাপতি তাঁদের অভিভাষণ পাঠ করলেন। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন গৃহে হল। সেইদিনের সভা শেষ

হওয়ার পূর্ব্বেই সুরেন্দ্রনাথ জলদগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করলেন যে পরদিন টাউন হলে আবার কংগ্রেসের অধিবেশন হবে।

পরদিন যথাসময়ের পূর্ব্বেই টাউন হলে গেলাম। পূর্ব্ব দুই দিন যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলাম, তারি জন্যই সভারম্ভের প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে টাউন হলে উপস্থিত হ'য়েছিলাম। আর সেই জন্যই প্রতিনিধিদের নির্দ্দিষ্ট আসনের প্রথম শ্রেণীতেই স্থান সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম। তাতে আমার পক্ষে দেখা-শোনার যথেষ্ট সুবিধা হয়েছিল। প্রথম দিনের অধিবেশন আরম্ভ হবার প্রায় আধ ঘণ্টা পূর্ব্বেই দেখতে পেলাম একটী গৌরবর্ণ যুবক মঞ্চের উপর এবং মঞ্চের চারিপাশে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছেন। যুবকটী দেখতে যেমন সুন্দর, তাঁর পরিচ্ছদও তেমনি পরিপাটী; দেখলেই বুঝতে পারা যায় তিনি খুব সম্ভ্রান্ত ঘরের সন্তান। চোখে সোণার চশমা, গায়ে লম্বা একটা কোট, গলায় একটা আলোয়ান জড়ানো—সেই আলোয়ানের উপর দু-দুটো ব্যাজ্—একটী অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যের, আর একটী প্রতিনিধির। আর তিনি যে ভাবে বড় বড় রথীদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, সম্ভ্রান্ত অভ্যাগতদিগকে অভ্যর্থনা করছিলেন, তা দেখে বুঝতে পারলাম যে তিনি যুবক হলেও কংগ্রেসের একজন বড় পাণ্ডা। আমার পার্শ্বে যে বাঙ্গালী প্রতিনিধিটি বসে ছিলেন, তাঁকে ঐ যুবকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে তিনি অবাক্ হয়ে বল্লেন, সে কি মশায়!—ওঁকে আপনি চেনেন না। উনি বরিশালের অশ্বিনীবাবু। আমি বিনীতভাবে বল্লাম, ওঁর নাম অনেক শুনেছি, কিন্তু পাড়া-গাঁয়ে থাকি, তাই চিনতে পারি নি।

অনেকের স্বভাব আছে লোকের সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ করে। আমার সে স্বভাব মোটেই তখনও ছিল না, এখনও নেই। আমি কারও সঙ্গে আপনা হ'তে আলাপ জমাতে পারিনে, এখন তো মোটেই পারিনে,—যৌবন কালেও পারতাম না। কাযেই দেশমান্য অশ্বিনীবাবুর সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমার হোলো না। আমি সেই সৌম্যমূর্ত্তি যুবককে দূর থেকে দেখেই তৃপ্তি লাভ করলাম।

যথাসময়ে সভা আরম্ভ হ'ল। সেইদিনের দুইটি ঘটনা আমার বেশ মনে আছে। তার মধ্যে একটী—উত্তরপাড়ার অশীতিপর বৃদ্ধ অন্ধ জমীদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সভায় আগমন। দুইজন লোকের স্কন্ধে ভর দিয়ে মুখোপাধ্যায় মহাশয় যখন মঞ্চের উপর এলেন তখন সকলেই দণ্ডায়মান হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। আমি তাঁকে চিনতাম না—তবুও সকলের দেখাদেখি আমিও দাঁড়িয়ে নমস্কার করলাম। আমার পাশের সেই ভদ্রলোকটীকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম—ইনিই সুপ্রসিদ্ধ জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ক্ষীণ কণ্ঠ হ'তে যে বাণী প্রদত্ত হোলো, তার একটী কথা উদ্ধৃত করবার প্রলোভন আমি সংবরণ করতে পারছিনে। অশীতিপর অন্ধ বৃদ্ধ বল্লেন—It is no wonder that objects such as these should have drawn distinguished gentlemen from all parts of the country when you find a blind old man like myself of 79 years of age bending under the infirmities of age, taking a part in the deliberations.

আর একটী যুবক সেদিন সত্যসত্যই আমাকে অভিভূত করে ফেলেছিলেন। একটী প্রস্তাব সমর্থন করবার জন্য যখন তিনি মঞ্চের উপর এসে দাঁড়ালেন তখন সমবেত প্রতিনিধি ও দর্শক মণ্ডলী অবাক হয়ে সেই মূর্ত্তির দিকে চেয়ে রইলেন। যুবকের বয়স তখন পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর। পায়জামা-পরা, গায়ে লম্বা সাদা চাপকান, একখানি সাদা চাদর গলায় জড়িয়ে তার দুই প্রান্ত বুকের উপর দুইপাশে ঝুলিয়ে দিয়েছেন, মাথায় পাগড়ী, কপালে শ্বেত চন্দনের ফোঁটা। সত্যসত্যই অপূর্ব্ব-দর্শন মূর্ত্তি। তিনি এসে দাঁড়াতেই আমি পাশের সেই ভদ্রলোকটীকে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলাম,—তিনি বল্লেন—চিনিনে মশায়, বোধ হয় পাঞ্জাবী কেউ হবে। তখন আর কাউকে জিজ্ঞাসা করবার অবকাশ পেলাম না। যুবকটী গম্ভীর স্বরে টাউন হলের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত করে বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। আর বক্তার কি উদাত্ত স্বর।—এই বৃদ্ধ বয়সেও সে দৃশ্য যখন মনে করি তখন আমি অতুল আনন্দ উপভোগ করি। এই যুবকের নাম অধুনা বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় মহাশয়। তিনি তখন এলাহাবাদ হাইকোর্টের উদীয়মান ব্যবহারাজীব।

কংগ্রেসের কথা এইখানেই শেষ করি।—ভারত উদ্ধার করে যথাকালে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলাম।

আবার সেই শিক, সেই দাঁড়, সেই একঘর। রাজনীতি তখন ধামা-চাপা রইল। সংসারযাত্রা যথানিয়মে চলতে লাগলো।

ডিসেম্বর মাসের শেষে কংগ্রেস হয়ে গেল। জানুয়ারীর প্রথম ভাগে একদিন বিকেল বেলা আমার একটী প্রিয় ছাত্র আমার কাছে এসে বললেন যে, তিনি বরিশালের অশ্বিনী বাবুর কাছ থেকে একখানি পত্র পেয়েছেন। আমার এই ছাত্রটির নাম শ্রীমান পঞ্চানন ব্রহ্মচারী। এঁর বাড়ী বরিশালে এবং ইনি অশ্বিনীবাবুর অতি প্রিয় শিষ্য ছিলেন। তাঁর মাতুল বা কেউ গোয়ালন্দে ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন, পঞ্চানন সেইখানে থেকে আমাদের স্কুলে পড়তো। তারি কাছেই ইতঃপূর্ব্বে অশ্বিনীবাবু সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছিলাম। সে সময়ে একটী ব্যাপার দেখতে পেতাম, অশ্বিনী বাবুর ছাত্র, বন্ধু ও শিষ্যেরা যেখানেই যেতেন সেখানকারই আবহাওয়ার একটা পরিবর্ত্তন সাধিত করতেন—এমনই তাঁদের চরিত্রবল ছিল—এমনই উচ্চ আদর্শে তাঁরা গঠিত হয়েছিলেন।

শ্রীমান পঞ্চাননও সেই প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান আচার্য্য, আমার পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় এখনও কলিকাতায় এলে আমার সঙ্গে দেখা করে পঞ্চাননের গুণগান করেন। আর তার চরিত্র-মাধুর্য্য যে আমিই বিকশিত করে দিয়েছিলাম এ-কথা বলে আমাকে লজ্জিত করেন। প্রকৃতপক্ষে পঞ্চাননের জীবন অশ্বিনী বাবুর আদর্শেই গঠিত হয়েছিল।

যাক্ সে কথা। পঞ্চানন আমাকে বললেন যে, অশ্বিনী বাবু কংগ্রেসের মত প্রচারের জন্য অতি শীঘ্রই ফরিদপুর ও ঢাকা অঞ্চলে আসবেন। তাঁর ইচ্ছা যে গোয়ালন্দে একদিন সভা করে কংগ্রেসের বার্ত্তা প্রচার করেন। তিনি লিখেছেন যে, গোয়ালন্দে তাঁর পরিচিত কেউ নেই, তবে বিগত কংগ্রেসে গোয়ালন্দ থেকে আমি প্রতিনিধি হয়ে গিয়েছিলাম—কংগ্রেসের কাগজপত্রে এ-কথা তিনি দেখেছেন। আমি তাঁকে সাহায্য করতে পারি কি না এই কথা তিনি জিজ্ঞাসা করে পাঠিয়েছেন এবং এক দিনের জন্য তাঁর অবস্থানের কি সুবিধা হবে সে কথাও পঞ্চাননের কাছে জানতে চেয়েছেন। এ নিতান্তই অপ্রত্যাশিত অভাবনীয় ব্যাপার। যে অশ্বিনীকুমারকে কংগ্রেসমণ্ডপে দেখে তাঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করবার বাসনা আমার মনে উদিত হয়েছিল, সেই অশ্বিনীকুমার অযাচিতভাবে আমার সাহায্য চান এবং আমার আতিথ্য গ্রহণ করতেও উৎসুক।

অশ্বিনীকুমারের নির্দ্দিষ্ট দিনে গোয়ালন্দে সভার ব্যবস্থা আমি অনায়াসেই করতে পারি। কিন্তু তাঁর মত বড়-মানুষের ছেলেকে আমার ক্ষুদ্র কুটীরে একদিনের জন্যও আতিথ্য গ্রহণ করবার অনুরোধ করতে আমার সঙ্কোচ বোধ হ'ল। তখন পঞ্চাননকে বাইরের ঘরে বসিয়ে রেখে আমি বাড়ীর ভিতর বড়দাদার কাছে গেলাম। তাঁকে সব কথা বলতে তিনি বল্লেন—তাই তো—কি করা যায়! আমাদের এই ছোট চালা ঘর—খড়ের চাল—দরমার বেড়া। এ কুঁড়ে ঘরে তাঁর মত মহামান্য অতিথিকে ডেকে আনি কি করে?

বড়বৌদিদি বল্লেন—তাতে কি হয়েছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে বিদুরের ক্ষুদ খেয়েছিলেন। ঠাকুরপো, তাঁকে আসতে লিখে দাও। আমরা প্রাণপণে তাঁর অভ্যর্থনা করব। কি বলিস সেজো। এই বলে তিনি তাঁর পশ্চাতে দণ্ডায়মান আমার স্ত্রীর গায়ে ঠেলা দিলেন। বড়দাদার সম্মুখে তো তিনি আর কথা বলতে পারেন না—ঘাড় নেড়ে বৌদিদির প্রস্তাবে সম্মতি দান করলেন। আমি উৎফুল্লচিত্তে বাইরে এসে পঞ্চাননকে বললাম—দেখ পঞ্চানন, অশ্বিনীবাবু হয় ত মনে করেছেন—আমি গোয়ালন্দের অতি গণ্যমান্য পদস্থ ব্যক্তি। তুমি তাঁর সে ভ্রম ঘুচিয়ে দাও। তাঁকে লেখ, আমি ২৫ টাকা মাইনের গরীব স্কুল-মাষ্টার। আমার ঘর সত্যসত্যই কুটীর। তিনি এই সব শুনে যদি আমার বাড়ীতে পদধুলি দেন—আমি ধন্য হয়ে যাব—কৃতার্থ হয়ে যাব। তুমি তাঁকে চিঠি লেখ—আমিও কাল তাঁকে চিঠি লিখবো।

পঞ্চানন অশ্বিনীবাবুকে কি লিখেছিল জানিনে—খুব সম্ভব আমি যা বলেছিলাম তাই লিখেছিল। আমিও ঐভাবেই বরিশালে অশ্বিনীবাবুকে পত্র লিখেছিলাম। তার উত্তর তিনি আমাকে যা লিখেছিলেন—সে কথাগুলো ঠিক ঠিক বলতে পারব না—তবে এটুকু বেশ মনে আছে যে তিনি আমাকে "তুমি" বলে সম্বোধন করে লিখেছিলেন যে, গোয়ালন্দে যদি ঢাকার মাননীয় নবাব বাহাদুরের রাজপ্রাসাদ থাকতো—আর সেখান থেকে তাঁর নিমন্ত্রণ

আসতো, তা হলেও তিনি সে নিমন্ত্রণ অস্বীকার করে আমার ক্ষুদ্র কুটীরে আসতেন।

তার পাঁচ ছয় দিন পরে এক বুধবারে অশ্বিনীবাবুর পত্র পেলাম। তিনি পরবর্ত্তী শনিবার প্রাতঃকালে গোয়ালন্দ ষ্টেশনে উপস্থিত হবেন, আমি যেন সেইদিন অপরাহ্নে সভা করবার ব্যবস্থা করি এবং তাঁকে আমার বাড়ীতে নিয়ে আসি।

যথানির্দ্দিষ্ট শনিবারের প্রত্যূষে মেল গাড়ীতে অশ্বিনীবাবু গোয়ালন্দ ষ্টেশনে পৌঁছিলেন। একটী চাকর ব্যতীত সঙ্গে আর কেহ ছিল না। তাঁর আসবার দুইদিন আগে থেকেই আমরা সভার বিজ্ঞাপন ও নিমন্ত্রণ-পত্র সকলকেই দিয়েছিলাম। বাজারের নিকট প্রশস্ত ময়দানে সভার স্থান ধার্য্য হয়েছিল। আমরা স্থির করেছিলাম উন্মুক্ত আকাশতলেই সভা হবে. কিন্তু বাজারের আড়তদার ও দোকানদারগণ সে প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। তাঁরাই সভামণ্ডপ প্রস্তুত করার ভার নিলেন, আর আমার প্রকাণ্ড রেজিমেণ্টাল স্কুলের ছাত্ররা তাঁদের সহায়তা করতে লাগলেন। নিমন্ত্রণ-পত্র ও বিজ্ঞাপন প্রচারের ভার স্কুলের ছাত্ররাই গ্রহণ করেছিলেন।

গোয়ালন্দের সর্ব্বপ্রধান উকিল যাদবচন্দ্র সরকার মহাশয় সভাপতির পদ গ্রহণ করতে স্বীকৃত হয়েছিলেন ও শনিবার প্রত্যূষেই ষ্টেশনে গিয়ে তিনিই সর্ব্বপ্রথম অশ্বিনীবাবুকে অভ্যর্থনা করবেন এ কথাও স্থির হয়েছিল। আমাদের আরও একটা সুবিধা হয়েছিল। শনিবার কি উপলক্ষে অফিস আদালত স্কুল সমস্তই বন্ধ ছিল। তার জন্য আমাদের লোকবলও বেড়েছিল এবং ষ্টেশনে অশ্বিনীবাবুর সংবর্দ্ধনার বিপুল আয়োজনও আমরা করতে পেরেছিলাম।

শনিবার প্রত্যূষে সত্যসত্যই ষ্টেশনে লোকারণ্য হয়েছিল। গোয়ালন্দের গণ্যমান্য ব্যক্তি সকলেই সেই শীতেও ষ্টেশনে সমবেত হয়েছিলেন। আড়তদার, দোকানদার মুটে মজুর সবাই বরিশালের অশ্বিনীবাবুকে অভ্যর্থনা করতে এসেছিল, আর আমাদের স্কুলের আড়াই শত ছেলে লাল নিশান হাতে করে ষ্টেশনের সম্মুখে সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছিল। যথাসময়ে গাড়ী ষ্টেশনে পৌঁছিলে একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী থেকে নামবার পূর্ব্বেই যাদববাবু গাড়ীর ভিতর উঠে তাঁর গলায় মালা দিয়ে অভ্যর্থনা করে প্লাটফরমে নামালেন। তখনও বন্দে-মাতরম্ দেশে আসে নি, কাযেই সমবেত জনমণ্ডলী করতালি দিয়েই এই মহামান্য অতিথিকে অভ্যর্থনা করলেন।

অশ্বিনীকুমার গাড়ী থেকে নামলে, সুমুখে যাঁরা ছিলেন যাদববাবু তাঁদের সঙ্গে অশ্বিনীবাবুর পরিচয় করিয়ে দিলেন। শিষ্টাচার বিনিময়ের পর অশ্বিনীবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—কই, জলধর কই? এ সমস্ত ব্যাপারে আমি কোনদিনই এগিয়ে দাঁড়াই নে—তখনো দাঁড়াতাম না, এখনও না। আমি সে সময় কতকগুলি লোকের পিছনে দাঁড়িয়েছিলাম।

অশ্বিনীবাবুর প্রশ্ন শুনে যাদববাবু এদিক ওদিক চেয়ে দেখলেন যে আমি পিছন দিকে দাঁড়িয়ে আছি। তিনি তখন দৌড়ে গিয়ে আমাকে টেনে অশ্বিনীবাবুর সম্মুখে এনে বললেন—এই নিন আপনার জলধর।

অশ্বিনীবাবু সহাস্যমুখে বললেন—কথাটা ঠিক হোলো না—বলুন, এই নিন আমাদের জলধর। সকলে আনন্দধ্বনি করে উঠলেন। আমি তাঁর পায়ের ধুলো নিতে গেলাম। তিনি হো হো করে হেসে বললেন—পায়ে কি আর এখন ধুলো আছে ভাই—এই বলেই আমাকে কোলের ভিতর জড়িয়ে ধরলেন—প্রণাম আর করা হোলো না।

ষ্টেশনের বাইরে এসে কে একজন বললেন, আপনার জন্য পাল্কীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই সদা-প্রফুল্ল-বদন অশ্বিনীকুমার জিজ্ঞাসা করলেন—জলধরের বাড়ী এখান থেকে ক' ক্রোশ?

যাদববাবুই জবাব দিলেন—ক্রোশ তো নয়—আধ মাইলেরও কম।

অশ্বিনীবাবু বললেন—আপনারা ভুলে যাচ্ছেন আমি বরিশালের বাঙ্গাল অশ্বিনী দত্ত। এখনও প্রতিদিন সকালে উঠে আমি তিন চার ক্রোশ হাঁটি। তখন সকলে মিলে হাঁটতে হাঁটতেই আমার বাসায় এলেন। আমার বড় দাদা ষ্টেশনে যান নি, বাড়ীর ব্যবস্থাতেই ব্যস্ত ছিলেন। তিনি আমাদের বাসার সম্মুখেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমরা সকলে নিকটস্থ হলে যাদববাবু দাদাকে দেখিয়ে বললেন—ইনিই জলধরের দাদা দ্বারিকবাবু—আজ আপনি এঁরই অতিথি। বড়দাদা নমস্কার করবার জন্য হাত তুলতেই অশ্বিনীবাবু

নতজানু হয়ে তাঁর পদধূলি গ্রহণ করলেন। তার পরই দাদা অতি মৃদু স্বরে বললেন—আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনি দয়া করে আমাদের বাড়ীতে এসেছেন।

সে কথার উত্তরে তিনি যা বললেন তা তাঁর মত সদাশয় মহৎ হৃদয় ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। তিনি বললেন—আমি কি আপনার বাড়ী এসেছি। আমি আমার বাড়ীতেই এলাম—কোন শিষ্টাচার দেখাবেন না দাদা। আমি আপনার ছোট ভাই অশ্বিনী।

এমন করে কেউ যে নিতান্ত অপরিচিত ব্যক্তিকে একান্ত আপনার জন করে নিতে পারে, এ আমি পূর্ব্বে কখনো দেখি নি। অশ্বিনীবাবুর কথা শুনে উপস্থিত সকলে ধন্য ধন্য করে উঠলেন। আমার বড়দাদাও উপযুক্ত দাদা—তিনি বললেন, আমার একটু ভুল হয়েছিল অশ্বিনীকুমার—যাও তোমার বাড়ী ঘর তুমি দেখে নাও।

তার পর আমাদের বাইরের যে ঘরে তাঁর থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল সেই ঘরে প্রবেশ করে চারিদিক একবার চেয়ে দেখে বললেন—এ কি করেছেন দাদা—এ যে রাজ-অভ্যর্থনা!

করা হয়েছিল তো ভারী! একখানা চৌকির উপর বিছানা পেতে রাখা হয়েছিল—আর প্রতিবেশীদের বাড়ী থেকে ধার করে খানকতক ভাল চেয়ার, দুখানা টেবিল ও একটা আলনা আনা হয়েছিল। এই হোলো তাঁর রাজ-অভ্যর্থনা।

দাদা বললেন, আমি ওর কিছুই করিনি। যাঁরা করেছেন, যাও তাঁদের সঙ্গে বোঝা-পড়া করো গিয়ে।

তাই যাচ্ছি বলেই কাপড়-চোপড় না ছেড়েই অশ্বিনী-বাবু ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তারপর আমার হাত ধরে বল্লেন—চল জলধর—গৃহলক্ষ্মীদের প্রতি সম্মান দেখিয়ে আসি। বাড়ীতে কে আছেন না আছেন, সে সব খবর আমি পঞ্চাননের চিঠিতে জানতে পেরেছি।

আমি তাঁকে সঙ্গে করে বাড়ীর ভেতর নিয়ে গেলাম। বড়বৌদিদি তখন বারান্দায় জলখাবার সাজাচ্ছিলেন। অশ্বিনীকুমার তাঁর সুমুখে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে বললেন—আপনি যে বড় বৌদিদি তা আমি বুঝতে পেরেছি। কথা বলে আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

বড়বৌদিদি বুঝলেন—আচ্ছা লোকের হাতে পড়েছেন। কথা না বলে পারলেন না, বললেন—আশীর্ব্বাদ করি—ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক। অশ্বিনীবাবুর সেই হাসি। বললেন—ওর একটাও আমি চাই নে। যাক, সে কথা পরে হবে। কই আর এক লক্ষ্মী কই।

বৌদি বল্লেন—আপনার আসবার সাড়া পেয়েই সে ঐ ঘরে পালিয়েছে।

অশ্বিনীকুমারের কোন দ্বিধা সঙ্কোচ নেই—আমার শয়ন-ঘরের ভিতর প্রবেশ করে আমার স্ত্রীর হাত ধরে টেনে এনে বল্লেন—আমি ও লজ্জা টজ্জা মানব না। এ স্ত্রীটিকে কোথায় পেয়েছেন বৌদিদি?

বড়বৌদিদি বল্লেন—শিবনিবাসের কাছে দাওয়ানের বেড়ে।

ওরে বাবা! শিবনিবাস! এই বলেই ছড়া কাটলেন—

"শিবনিবাসী তুল্য কাশী—
ধন্য নদী কঙ্কনা"।

বৌদিদি, আমি দাওয়ানের বেড়ের ইতিহাসও পড়েছি। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দাওয়ান রঘুনন্দনের স্থাপিত এই দাওয়ানের বেড়। বড়বৌদিদি বল্লেন—এতও আপনি জানেন।—এ সেই দাওয়ান রঘুনন্দনের প্র-পৌত্র। এখন এসে আমার স্কন্ধে ভর করেছেন।

আচ্ছা! সে পরিচয় পরে করা যাবে, এখন বাইরে গিয়ে হাত-পা ধুইগে।

বাইরে এসে সভার কথা জিজ্ঞাসা করতেই আমি তাঁকে বললাম, আজই সাড়ে তিনটেয় সভা হবে, বাজারের কাছে। সবই ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। আপনি জলটল খেয়ে বিশ্রাম করুন—আমি একবার দেখে আসি সব ঠিক হচ্ছে কি না। এই বলে আমি চলে গেলাম। যখন ফিরে এলাম তখন বেলা প্রায় একটা।

বাড়ী এসে তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়ে দেখি দাদার ঘরের বারান্দায় অশ্বিনীবাবু আহার করতে বসেছেন। তিনি তখন নিরামিষাশী ছিলেন। আমাকে দেখেই বললেন—দেখ জলধর, আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করতেই চেয়েছিলাম। তা তোমার ঐ লক্ষ্মীটী আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে তুমি হয় তো এ বেলা আসবেই না, একেবারে সভা শেষ করে আসবে। আমি ওর কথা বিশ্বাস করে তোমাকে ফেলেই খেতে বসেছি। দাদাকে বাইরের ঘরে নির্ব্বাসিত করে ওরা দুইজনে আমাকে নিয়ে পড়েছে।

বড় শক্ত বাঁধনেই ভাই ফেললে আমাকে। তারপর যে কত কথা—কত হাসি তামাসা—সে সব কথা মনে হলেও এখন আমার চোখে জল আসে।

তারপর যথানির্দ্দিষ্টসময়ে অপরাহ্ণ সাড়ে তিনটায় সভার অধিবেশন হ'ল। আমাদের স্কুলের পণ্ডিত মশায় স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক আউড়ে অশ্বিনীকুমারকে অভ্যর্থনা করলেন। অশ্বিনীবাবু আমাদের দেশের শাসন ও বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ সম্বন্ধে একঘণ্টার উপর বক্তৃতা করলেন। সকলের শেষে আমি ধন্যবাদ করলাম! সভার কার্য্য শেষ হ'ল। অশ্বিনীকুমার এই অনুষ্ঠান দেখে বড়ই সন্তুষ্ট হলেন।

তারপর আমরা বাড়ী ফিরে এলাম। অশ্বিনীবাবু বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। রাত্রে খানিকটা দুধ ব্যতীত আর কিছুই খেলেন না। গরীবের যা কিছু আয়োজন হয়েছিল আমরাই তার সদ্ব্যবহার করেছিলাম।

শয়নের কিছু পূর্ব্বে অশ্বিনীকুমার একবার বাড়ীর ভিতর গিয়ে আমারই সম্মুখে বড় বৌদিদিকে বল্লেন—বৌদি, যা মনে করেছেন—তা নয়। অশ্বিনীকুমার কাল সকালে যাচ্ছেন না।

এ কথার জবাব আমার স্ত্রী দিলেন—কে আপনাকে যেতে বলছে মশায়! থাকুন না দশ পনর দিন আমাদের এখানে। সত্যসত্যই তাই ইচ্ছে করছে, এই বলে মাথা চুলকোতে চুলকোতে অশ্বিনীবাবু বেরিয়ে গেলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে তাঁর চাকরটিকে বাড়ীতে রেখে আমাদের চাকরকে সঙ্গে নিয়ে অশ্বিনীবাবু বেড়াতে বেরুলেন। বেলা প্রায় আটটার সময় যখন ফিরলেন—তখন তাঁর পেছনে আমাদের চাকরের মাথায় একটা ঝাঁকা, আর একটা নগদা কুলীর মাথায় একটা ঝুড়ি। এই দৃশ্য দেখে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ সব কি দাদা! অশ্বিনী-কুমার হিন্দি বাত্ আওড়ালেন—তফাৎ যাও। কোহি বাত মাত্ বোলো। এই বলে লোক দুটোকে নিয়ে বাড়ীর ভেতর চলে গেলেন—আমি আর তাঁর অনুসরণ করলাম না, কারণ জানতাম তখন বড়দাদা বাড়ীর ভেতর আছেন। বড়দাদা একটু পরেই বেরিয়ে এসে বললেন—দেখ গিয়ে জলধর, তোমার পাগলের কাণ্ড। বাজারের আর কিছু বাকী রাখে নি।

তার খানিকটা পরেই বাড়ীর ভেতর গিয়ে দেখি—উঠানের দড়ীর ওপর তাঁর গরম কোট ও শাল ঝুলছে; পায়ের জুতো মোজা খুলে উঠানে ফেলে দিয়ে—মহাপুরুষ বসে কুটনো কুটছেন। পাশে আর একখানা বঁটী নিয়ে আমার স্ত্রীও তাঁর সাহায্য করছেন।

আমি বললাম, দাদা ও কি, হাত কাটবেন যে?

আমার স্ত্রী জবাব দিলেন—ভগবান, তাই যেন হয়—যতদিন কাটা-ঘা না শুকোবে ততদিন তো আমাদের কথা মনে থাকবে।

অশ্বিনীকুমার বললেন—জলধর তোর এই গৃহিণীর জ্বালায় আমি অস্থির হয়ে পড়েছি। এর কথারও অন্ত নেই—হাসিরও অন্ত নেই।

তারপর অশ্বিনীকুমার একবার রান্নায় যোগ দিচ্ছেন, আর একবার বা বাইরে এসে যাঁরা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন তাঁদের বলছেন—আমি কালকের অশ্বিনীকুমার নেই মশায়—আমি আজ এ বাড়ীর রাঁধুনী।

এই দুই দিনে অশ্বিনীকুমার আমার ক্ষুদ্র কুটীরকে একেবারে আনন্দের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। পরদিনের ভোরের ষ্টিমারে তিনি যখন ঢাকা রওনা হন, তখন তিনিও চোখের জল ফেলেন, আমার বৌদিদি ও আমার গৃহিণীও চোখের জল ফেলেন। কথা আর কেউ বলতে পারলেন না, উভয়পক্ষের চোখের জলেই বিদায় অভিনন্দন হয়ে গেল।

তার পর। তার পরের কথাও কি বলতে হবে? যখন অশ্বিনীকুমারের স্মৃতি-তর্পণ করতে বসেছি তখন আর একটী দৃশ্যের কথা অতি সংক্ষেপে বলি।

পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার নয় মাস পরে এক দিন অপরাহ্ণে গোলদীঘির ধারের ফুটপাথের উপর অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে আমার দেখা—আমি তখন হিমালয়ের যাত্রী।

অশ্বিনীকুমার সেই রাস্তার মধ্যেই আমাকে জড়িয়ে ধরে তিরস্কার করে বল্লেন, হ্যাঁরে জলধর, এত নিষ্ঠুর তুই,—এই ন' মাসের মধ্যে একটা খবরও দিলিনে। আমি শুষ্ক মুখে বল্লাম—খবর তো কিছু নেই দাদা,—সব খবর শেষ হয়ে গিয়েছে।

সে কি, আমি যে বুঝতে পারছিনে। আমি বললাম—শুনবেন দাদা! আপনার সঙ্গে শেষ দেখার চার মাস পরে

আমার একটী কন্যা-সন্তান হয়। বার দিন পরেই সেটী মারা যায়। তার বার দিন পরেই আমার গৃহিণীও সেই পথে যান। তার তিন মাস পরে আমার মাতাঠাকুরাণীও চলে গিয়েছেন। এখন আমি হিমালয়-যাত্রী।

এ্যাঁ—কি বলিস্! এই বলে সেই মানব-শ্রেষ্ঠ গোলদীঘির পার্শ্বের রেলিং-এ ভরদিয়ে নতমুখে দাঁড়ালেন। দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। আমি চুপ করে তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে রইলাম।

দুই তিন মিনিট পরেই আত্মসংবরণ করে অশ্বিনীকুমার ধীরে ধীরে বল্লেন—জলধর—এ আনন্দের হাট সকলের ভাগ্যে বেশীদিন টিঁকে না। হিমালয়ে যাচ্ছ, যাও। দেখ, যদি শান্তি পাও।

সহপাঠী

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

সামনের বার্থে বসিয়া নিবিষ্ট মনে পড়িয়া যাইতেছে, ও লোকটি কে?

এদিকে দুইটি বার্থ রিজার্ভ করা। কোনও ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ও তাঁহার স্ত্রী যাইতেছেন। মিসেস্ শোভনা মিত্র বাহিরের অপসৃয়মান পাহাড়ের দিকে তাকাইয়াছিলেন। মিঃ মিত্র শুইয়াই ছিলেন কিন্তু এখনও ঘুম আসে নাই। আলোর চারি পাশে কতকগুলি পোকা ঘুরিয়া মরিতেছে—তিনি সেই দিকেই চাহিয়াছিলেন।

শোভনা ওই কথাটাই ভাবিতেছিল—ও লোকটি কে? অমনি করিয়া নিবিষ্টমনে পড়িবার ভঙ্গিটি তাহার যেন পরিচিত; কিন্তু কবে কোথায় সে দেখিয়াছে তা মনে পড়ে না।

কি বই তাহাকে এত একমনা করিয়া রাখিয়াছে তাহাও জানা যায় না। বইটী মোটা, কিন্তু কাহার বা কি বিষয়ক তাহা জানিবার উপায় নাই। শোভনা বার বার ভাবিয়া দেখিতেছিল, কিন্তু লোকটার পরিচয় সমস্যার কিছুতেই সমাধান হইল না।

রাত্রি গভীর হইয়া উঠিল। অলস জোছনায় আবছা আলোর মাঝে দিকচক্রবাল মিশিয়া গিয়াছে। ট্রেণখানা একটানা গতিতে চলিয়াছে—

শোভনার মনে পড়িল—সে যখন এম. এ. পড়িত তখন পিছনের বেঞ্চে বসিয়া এমনি নিবিষ্টমনে একটি ছেলে কাজ করিয়া যাইত। শোভনা তখন ছিল পোষ্ট গ্রাজুয়েটের সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী ছাত্রী। সকল ছাত্রই কোন না কোন উপায়ে তাহাকে উত্যক্ত করিয়াছে কিন্তু এই ছেলেটি তাহার কৃশ দেহ ও নিষ্প্রভ চোখ লইয়া একান্তে বসিয়া থাকিত—কোন দিন ভ্রূক্ষেপও করে নাই। আনমনা অবস্থায় সামনে পড়িয়া গেলে সসম্মানে পথ ছাড়িয়া দিয়াছে। ছেলেটি তাহার ওই স্বাস্থ্য লইয়া যে পরিমাণ সিগারেট বিড়ি উড়াইত তাহাতে আশ্চর্য্য হইতে হয়। একদিন প্রফেসর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কি কচ্ছ হে? সে উত্তর করিল,—একটু কাজ করছি।—কি কাজ? সে চুপ করিয়া রহিল। অন্য একটি ছেলে জবাব দিল—ও কাগজের এডিটারী করে, সেই আফিসের কাজই কচ্ছে। প্রফেসর তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে ক্লাসে ওসব কাজ করা চলিবে না। সে অতি বিনীতস্বরে বলিল,—যদি ক্লাসে একাজ ক'রতে আপনি না দেন তবে আমার ক্লাসে আসা হবে না, আর তা না হ'লে চাকুরী ক'রবার আবশ্যকতাও কিছু নেই। প্রফেসর কিছু বলেন নাই—তারপর নিত্য পিছনের বেঞ্চে বসিয়া সে হয়ত গল্প বাছাই করিত, না হয় লিখিত। পরীক্ষা সে দেয় নাই, পরে দিয়াছে কি না কে জানে? চাকুরী করিয়া পড়িয়াই হয়ত এখন মানুষ হইয়াছে, নহিলে সেকেণ্ড ক্লাসে যাওয়া সম্ভব হইত না। এখন ও লোকটা কি করে? ওর নামও ত সে ঠিক জানে না।

যে লোকটা জগতের সব ভুলিয়া পুস্তকের হিজিবিজি

অক্ষরগুলির মধ্যে ডুবিয়া বসিয়া আছে তাহার জন্যই শোভনার মনটি আজ কৌতূহলী হইয়া উঠিল।

মিঃ মিত্র সহসা উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, শোভা—এক-কাপ চা দাও না। কিছুতেই আর ভাল লাগছে না।

শোভনা ফ্লাস্ক খুলিয়া তাহাকে এককাপ চা ঢালিয়া দিতেছিল। লোকটি সহসা তাহার দিকে না চাহিয়াই বলিল, আমাকে এককাপ দেবেন ত?

শোভনা ও মিঃ মিত্র আশ্চর্য্য হইয়া তাহার দিকে চাহিলেন। অপরিচিত মহিলার নিকট এমনভাবে চা' চাহিয়া লইতে ওর এতটুকুও সঙ্কোচ নাই কেন?

শোভনা ভাবিল, হয়ত ও তাহাকে চিনিয়াছে সেই জন্যই চা' চাহিয়া লইতে লজ্জাবোধ করে নাই। শোভনা মিঃ মিত্রের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া চা'র কাপ অপরিচিত ভদ্রলোকের সামনে রাখিয়া দিল। মিঃ মিত্র মনে মনে যা হয় একটা মীমাংসা করিয়া লইয়া চা পান করিয়া যাইতে লাগিলেন।

পুস্তকের চার পাঁচ পৃষ্ঠা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে চা' শেষ হইয়া গেল।

শোভনা আশ্চর্য্য হইল—ও কি এমনি অন্যমনস্ক, যে ধন্যবাদ দিতেও ভুলিয়া গেল!

ট্রেণ চলিয়াছে—

ও পাশের বার্থে এক ভদ্রলোক এতক্ষণ মুড়িসুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছিলেন। সহসা চোখ মুছিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ট্রেণও একটা ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। ভদ্রলোক বলিলেন,—এই ভ্যাগাবণ্ড! দু'কাপ চা খেলে কেমন হয়?

বই হইতে মুখ তুলিয়া ও বলিল—বেশ হয়।

—এত ষ্টেশন গেল, দু'কাপ চা খেতে পারলি নি? তেষ্টাও পেলো না তোর?

—চা'র তেষ্টা অনেকক্ষণ পেয়েছে, কিন্তু পেলাম কই?

—দাঁড়া, ছাখ নিয়ে আস্‌ছি—

ভদ্রলোক নামিয়া গেলেন। ও পুনরায় বই পড়িতে লাগিল।

শোভনা আশ্চর্য্য হইয়া গেল—ও যে শুধু ধন্যবাদ দিতেই ভুলিয়া গেল তাহা নয়, চা' খাইয়াছে সে কথাও ভুলিয়া গেছে।

শোভনা ব্যথিত হইল—এমন অন্যমনস্ক লোক কাহার উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া আছে! এদের বাঁচিয়া থাকাই যে একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার। ওই লোকটির ব্যক্তিগত জীবনে শোভনার হয়ত একটু কৌতূহল ছিল, তাই তাহার চা চাহিয়া পান করায় সে উত্যক্ত হয় নাই। অন্য কেহ হইলে সে ভাল রকম একটা জবাব দিয়া চা-তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া দিত।

ট্রেণ ছাড়িয়া দিতে দিতে ভদ্রলোক চা লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। চা পান করিতে করিতে বলিলেন—একটু ঘুমিয়ে নাও, সারা রাত্রি জেগে শেষে—

ও একটু রুষ্ট হইয়া জবাব দিল—স্বাস্থ্য সমাচার তোমার চেয়ে আমার কিছু কম জানা নেই। ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করার চেয়ে পড়াটাই লাভজনক।

—সেকথা সত্য; তবে ২৪ ঘণ্টা ক'রে পড়ে তিরিশ বছর বেঁচে যে জ্ঞান সঞ্চয় করা যায়, তার চেয়ে বার ঘণ্টা ক'রে পড়ে ৭৫ বৎসর বেঁচে কি বেশী জ্ঞানলাভ করা যায় না?

—এটি এরিথমেটিক নয়। তুমি ঘুমোও না কেন—৭৫ বৎসরে চেয়ে হঠাৎ লাখ টাকা পেয়ে পরদিনই ভবলীলা সাঙ্গ করাটা আমার কাছে খুব ভাল মনে হয় না। I shall drink my life to the lees.

ভদ্রলোক আর তর্ক না করিয়া শুইয়া পড়িলেন। ও বই পড়িয়া যাইতে লাগিল, শোভনার ইচ্ছা করিতেছিল ওর সঙ্গে আলাপ করিয়া তাহার সমস্ত বিষয় জানিয়া লয়। কিন্তু দ্বিধা ও সঙ্কোচের বাধা সে অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারিল না। এমনি করিয়া ভাবিতে ভাবিতে কখন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—

সকালে একটা গোলমালে শোভনার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিতেই দেখে, রাত্রের সেই আপনভোলা লোকটি রক্তচক্ষু করিয়া ক্রমাগত উচ্চৈস্বরে ইংরাজি বকিয়া যাইতেছে।

মিঃ মিত্র ততোধিক উচ্চৈস্বরে তাহার জবাব দিতেছেন। ঐ লোকটির বক্তব্য এই যে, গাড়ী হইতে তাহাদিগকে অবিলম্বে নামিয়া যাইতে হইবে। শোভনার অত্যন্ত রাগ হইল যে লোকটির বিমর্ষ ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া তাহার করুণা হইয়াছে, সে মিঃ মিত্রের মনকে উপেক্ষা করিয়া যাহাকে চা

দিয়াছে—সেই কিনা এমন ভাবে তাহাদিগকে নামাইয়া দিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে—এই প্রতিদান!

শোভনা ক্রুদ্ধ স্বরে জবাব দিল—কেন আমরা নেমে যাব? এ কথা ব'লবার আপনার কোন অধিকার নেই।

—নিশ্চয়ই আছে। জানেন, এটা ভাইস্রয়ের স্পেশাল ট্রেণ—এতে অন্য লোক নেওয়া হয় না।

ওর বন্ধু বলিল—ওঁরা যে সব এ, ডি, সি—ওঁরা যাবেনই ত।

এ, ডি, সি, অন্য গাড়ীতে যাবেন, আমার গাড়ীতে কেন?

এ, ডি, সি, বডিগার্ড—এরা সব ত সঙ্গেই যাবেন—নইলে তোমার সম্মান থাক্‌বে কি ক'রে।

ও বলিল—আচ্ছা ধন্যবাদ, আপনারা যেতে পারেন। অবশ্য মনে রাখবেন ভাইস্রয়ের ধন্যবাদের মূল্য যথেষ্ট।

শোভনা এতক্ষণ হতভম্ব হইয়া তাহাদের কথা শুনিতেছিল—ব্যাপারটার কিছুই সে সঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। কি যেন একটা জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল, ওর বন্ধু ইঙ্গিতে তাহাকে বারণ করিয়া দিল।

ওর বন্ধু স্যুটকেস হইতে দুইটি ওষুধের বড়ি বাহির করিয়া বলিল—এই ওষুধটুক খেয়ে নে ত ভাই।

—ভাইস্রয়ের ওষুধ খাওয়ার দরকার হয় না।

—বল কি? তারা ত ওষুধ খেয়েই বেঁচে থাকে।

—আমি মানি নে—

বন্ধুটি কিছুক্ষণ বিমর্ষ হইয়া বসিয়া রহিল। ও বলিতে লাগিল—কই। এক্সিকিউটিভ মিনিষ্টার সব কোথায়, স্পেশাল মিটিং ক'রবো এখন। সীমান্তপ্রদেশে বোমা-বর্ষণ করা হ'য়েছে কেন? তার জবাব আমি মিঃ চেটউডের কাছে চাই।

বন্ধু কোন জবাব না দিয়া পরের ষ্টেশন হইতে এক কাপ চা সংগ্রহ করিয়া তাহাতে অলক্ষ্যে বড়ি দুইটি মিশাইয়া ওকে দিলেন। অল্পক্ষণ বাদেই ও ঘুমাইয়া পড়িল। ওর বন্ধুটি শোভনার সামনে মিঃ মিত্রের বেঞ্চে বসিয়া বলিলেন—আমি ওর হয়ে মার্জ্জনা চাইছি—ও যে দুর্ব্যবহার করেছে তার জন্যে—

বন্ধুটির চোখ দুটি ছলছল করিতেছিল। শোভনা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। ও বলিল—ও আমার সহপাঠী, বছরখানেক হ'ল পাগল হ'য়ে গেছে। দরিদ্রের ছেলে টিউসনি করে চাকুরী করে এম, এ পাশ করেছিল কিন্তু চাকুরী মিলে নাই, অনশনে অত্যাচারে এমনি হ'য়ে গেছে—ওর অপরাধ—

শোভনা ভিজা গলায় বলিল—না আমরা বুঝিচি, আমরা কিছু মনে করিনি। ওঁকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

—রাঁচি। জগতে ওর কেউ নেই, আমার বন্ধু—কিন্তু বারমাস কে ওর পাগলামীর সঙ্গে যুঝবে? এই সেদিন আমার স্ত্রীকে কাপ ছুঁড়ে মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। ওখানেই রেখে আসি।

ক্ষণিক চুপ করিয়া বলিলেন—কে জানে! বাকী জীবন ওখানেই কাটবে কি না!

শোভনা শুধাইল—ওঁর অমন হল কেন?

—মানুষের সহন-শক্তির একটা সীমা আছে বলে মনে হয়, ও যা দুঃখ-কষ্ট পেয়েছে তা বোধ হয় সহনাতীত—নইলে ও পাগল হবে কেন?

—উনি কোন্ বছর এম, এ পাশ করেন?

—১৯৩২ খৃষ্টাব্দে।

শোভনার আর সংশয় রহিল না—তাহার পরের বৎসর তাহা হইলে পরীক্ষা দিয়াছে! ও তাহারই সহপাঠী, ওর বন্ধুও তার সহপাঠী!

বন্ধুটি আবার বলিলেন—যতক্ষণ বই পড়ে ভাল থাকে; কিন্তু বই বেশী পড়লেই অমন আরম্ভ করে—ওর ধারণা ও ভাইস্রয়। ফার্ষ্ট ক্লাস ছাড়া রাঁচি যাবে না—গরীব কেরাণী টাকা কোথায় পাই—বহুকষ্টে এনেছি। বন্ধুকে সারা-জীবনের মত পাগলা গারদে পাঠাচ্ছি—কম দুঃখে নয়।

শোভনা ছলছল চোখে বলিল—আপনি ত অনেকই করেছেন—

—কিছুই করিনি, বিবাহ করে মনটা সংকীর্ণ হ'য়ে গেছে। সংসারের জন্যে ভাবতে হয়, নইলে বন্ধুর জন্যে জীবনটা না হয় অন্যরকমই হ'তো—

সকলেই সহসা চুপ করিয়া গেলেন।

রাঁচি ষ্টেশনে গাড়ী ঠিক করিয়া বন্ধুটি ওকে ঘুমন্ত অবস্থায়ই তুলিয়া দিল।

ষ্টেশনের অদূরে শোভনার চোখের সামনেই গাড়ীখানি ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া গেল।

মাতৃজাতির শরীর চর্চ্চা

শ্রীনীলমণি দাশ (আয়রণ্ ম্যান্)

কোন ইংরাজ পণ্ডিত বলেছেন—'The wealth of a nation is truly the health of the people' আমাদের দেশ যে গরীব তার একটি কারণ দেশের লোকের স্বাস্থ্য খারাপ। পুরুষের স্বাস্থ্যোন্নতির উপায় ঠিক করবার

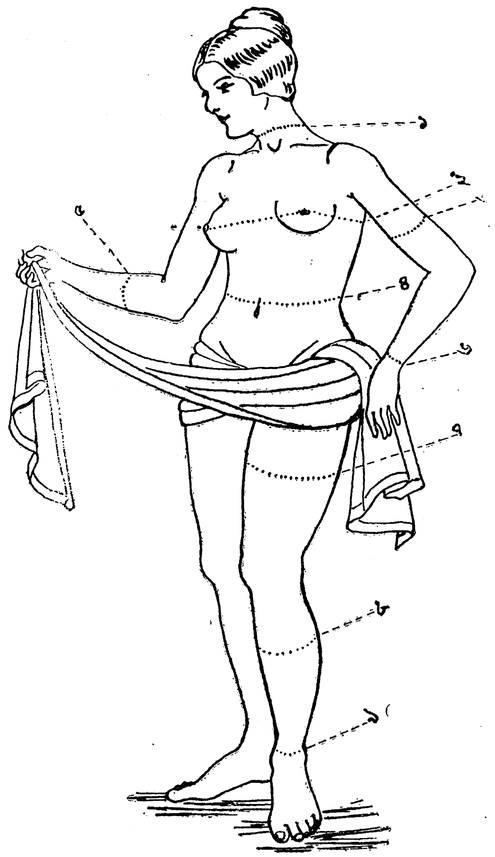

জন্যে অনেক মনীষী অনেক পরিশ্রম করেছেন ও কর্‌ছেন। কিন্তু মেয়েদের স্বাস্থ্যলাভের তেমন কোন সুব্যবস্থা নেই। সমাজ দেহে একটা অঙ্গকে চিরকাল অপুষ্ট ও রুগ্ন রেখে অপর অঙ্গ কখনও পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হ'তে পারে না। জাতির উন্নতি কামনা কর্‌তে হ'লে যাতে নরনারী উভয়ে স্বাস্থ্য ও শক্তির উত্তরাধিকারী ও উত্তরাধিকারিণী হ'তে পারে সে বিষয়ে সকলের দৃষ্টি রাখা উচিত। আমার মত ক্ষুদ্র লেখকের চেষ্টা সেতু-বন্ধে কাঠবেড়ালীর সাহায্যের ন্যায় তা জানি, তথাপি যখন মাতৃজাতির নিকট থেকে ডাক এসেছে, তখন আমার সাধ্যমত মাতৃজাতির স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য কিছু লিখব ও কয়েকটি ব্যায়ামের বিবরণ দে'ব।

১ (ক)

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য রক্ষা কর্‌তে ব্যায়াম বিশেষ প্রয়োজন। নারী পুরুষের চেয়ে অধিক সৌন্দর্য্যের পূজারী। প্রত্যেক নারীর জানা উচিত যে পাউডার, স্নো, ক্রীম্ ইত্যাদিতে সৌন্দর্য্য লাভ করা বা রক্ষা করা যায় না। ব্যায়াম কর্‌লে হাত পা পুষ্ট, গোলগাল, নিটোল হয়; কোমরে, পেটে, পাছায় অতিরিক্ত মেদ জমতে পারে না; অথচ শরীরের লালিত্য বজায় রাখতে হ'লে যেটুকু মেদের

প্রয়োজন তারও অভাব হয় না। প্রাচীন গ্রীস ব্যায়ামের প্রয়োজন এত বেশী বুঝত যে গ্রীসে অসংখ্য ব্যায়ামাগার

২ (ক)

ছিল, যেখানে নরনারী নির্ব্বিশেষে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ব্যায়াম অভ্যাস করত। তাই সৌন্দর্য্যের আদর্শ

২ (খ)

হিসাবে হার্‌কিউলিস্, এপেলো, ভেনাস্ ইত্যাদি এখনো বিরাজ করছে।

স্ত্রীলোকের ব্যায়াম প্রয়োজন কিনা, সে বিষয়ে অনেকের মতভেদ আছে। তাঁরা বলেন—ব্যায়াম কর্‌লে নারীদের হাত, পা শক্ত হ'য়ে পুরুষের মত শরীর পেশীবহুল হ'য়ে পড়বে। ফলে কমনীয়তা নষ্ট হ'য়ে গিয়ে কাঠখোট্টার মত দেখতে হবে। কিন্তু তাদের জানা উচিত যে পুরুষের শরীরের গঠন একরূপ এবং নারীর শরীরের গঠন অন্যরূপ। পুরুষের মাংস-পেশী বহির্ম্মুখী, ব্যায়াম কর্‌লে শক্ত হয় এবং ফুলে উঠে; কিন্তু নারীর মাংসপেশী ভিতরমুখী, ব্যায়াম কর্‌লে অত্যধিক মেদ নষ্ট হ'য়ে যায় এবং শরীর গোলগাল নিটোল হয়।

ইহা ছাড়া শক্তি সাহস ও আত্ম-রক্ষার জন্য ব্যায়াম প্রয়োজন। প্রতিদিন খবরের কাগজের পাতা উল্‌টালে নারীর উপর পাশবিক অত্যাচারের ২।১০টা মর্ম্মভেদী ঘটনার কথা চোখে পড়ে। অসহায় নারীর আর্ত্তনাদে বাংলার

৩ (ক)

আকাশ বাতাস যে ভোরে গেল। আজ যদি বাংলার নারী স্বাস্থ্যের অধিকারিণী হতেন—যদি তাদের শক্তি ও

৩ (খ)

সাহস থাকত, তা হ'লে কি দুর্ব্বৃত্তেরা তাদের উপর পাশবিক অত্যাচার করতে পারত। বাংলার নারী! এ বিষয়ে তো মা দের চেতনা হয় না কেন? আর কতদিন পরামুখাপেক্ষী থেকে যাতনা সহ্য করবে? উত্তিষ্ঠত! জাগ্রত! উঠ! জাগ! নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা কর—আত্মরক্ষার জন্য শক্তি অর্জ্জন কর—ব্যায়াম অভ্যাস কর।

ব্যায়াম অভ্যাস করবার পূর্ব্বে প্রত্যেক নারীর নিম্ন-লিখিত উপায়ে দেহের ওজন ও মাপ লওয়া উচিত। প্রতি মাসে না হয়, প্রতি তিন মাস অন্তর একবার ক'রে দেহের ওজন ও মাপ নিলে সহজে বুঝতে পারা যাবে, তাঁদের শারীরিক উন্নতি হচ্ছে কি না।

নাম.....

বয়স.....তারিখ.....

উচ্চতা.....ওজন.....

	(না ফুলাইয়া)		(ফুলাইয়া)	
হাতের উপরের অংশ (Biceps)	...	"	...	"
হাতের নীচের অংশ (Forearm)	...	"	...	"
কব্‌জি (Wrist)	...	"	...	"
ঘাড় (Neck)	...	"	...	"
বুক (Breast)	...	"	...	"
কোমর (Waist)	...	"	...	"
জানু (Thigh)	...	"	..	"
পায়ের গুলি (Calf)	...	"	...	"

ব্যায়াম আরম্ভ করবার পূর্ব্বে ব্যায়ামকারিণীর একটা ছবি তুলে রাখলে ভাল হয়।

ব্যায়ামকারিণীর নিজ শরীরের বিভিন্ন স্থানের মাংস-পেশীর নাম ও অবস্থানের অবগতির জন্য একটি ছবি দেওয়া গেল।

ছবির পরিচয়

(১) গলা (Neck), (২) বুক (Breast),

৪ (ক)

(৩) হাতের উপরের অংশ (Biceps), (৪) কোমর (Waist), (৫) হাতের নীচের অংশ (Forearm),

(৬) কব্‌জি (Wrist), (৭) জানু (Thigh), (৮) পায়ের গুলি (Calf), (৯) গুলফ্‌ (Ankle)।

এই ছবি দেখ্‌লে শরীরের কোন অংশকে কি বলে তা জানা যাবে এবং ইহা আরও মাপ লওয়া বিষয়ে

৫ (ক)

সহায়তা করবে। শরীরের কোন্ অংশের মাপ কোন্ স্থান থেকে নিতে হবে তা বেশ স্পষ্ট বুঝা যাবে।

নিম্নে কতগুলি সচিত্র ব্যায়ামের বিবরণ দেওয়া হ'ল।

৫ (খ)

এই ব্যায়ামগুলি মুক্ত স্থানে অথবা ঘরের মধ্যে সমস্ত দরজা জানালা খুলে অভ্যাস করা যেতে পারে।

ব্যায়াম নং ১

হাত সামনের দিকে মুঠো ক'রে এবং নীচের দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে সোজা হ'য়ে দাঁড়ান্।

পরে প্রশ্বাস নিতে নিতে ডান হাত কনুই থেকে ভেঙে তুলুন এবং ১ (ক) ছবির আকার ধারণ করুন। এই সময় হাতের উপরের অংশ বগলের সহিত সংলগ্ন রাখুন এবং কনুই একটু উপরের দিকে তুলুন। পরে নিঃশ্বাস ফেল্‌তে ফেল্‌তে হাত নামান ও পূর্ব্বের আকার ধারণ করুন। এই

৬ (ক)

রূপে বাঁ হাত প্রশ্বাস নিতে নিতে তুলুন এবং নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে নামান।

এইরূপে প্রতি হাত ১০ বার তুললে ও নামালে হাতের উপরের অংশের গঠন সুন্দর হবে এবং হাত গোলগাল নিটোল হবে।

ব্যায়াম নং ২

হাত মুঠা ক'রে ২ (ক) ছবির আকার ধারণ করুন এবং শরীর সোজা রাখুন।

পরে প্রশ্বাস নিতে নিতে দু হাতই কনুয়ের কাছ থেকে ভেঙ্গে মুড়ুন এবং ২ (খ) ছবির আকার ধারণ করুন। পরে নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে হাত প্রসারিত ক'রে ২ (ক) ছবির আকার ধারণ করুন।

এইরূপ ক্রমান্বয়ে ১০বার কর্‌লে হাতের উপরের অংশের গঠন সুন্দর হবে এবং হাত গোলগাল নিটোল হবে!

৬ (খ)

(কেহ যেন মনে না করেন—পুরুষের মত Biceps উঠে মেয়েদের কমনীয়তা নষ্ট ক'রে দেবে।)

ব্যায়াম নং ৩

হাত পিছনের দিকে মুঠো ক'রে নীচের দিকে ঝুলিয়ে দিবে ৩ (ক) ছবির মত সোজা হ'য়ে দাঁড়ান্। (হাত যাতে শরীরের সহিত সংলগ্ন থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখুন)

পরে প্রশ্বাস নিতে নিতে বাঁ হাত কনুই থেকে ভেঙ্গে উপরে তুলুন এবং ৩ (খ) ছবির আকার ধারণ করুন। পরে নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে হাত নামান, হাতের উপরের অংশ শরীরের সহিত সংলগ্ন রেখে নীচের অংশ (কনুই থেকে মুষ্টি পর্য্যন্ত) একটু পিছনদিকে ঢেলে দিন এবং ৩ (ক) ছবির আকার ধারণ করুন। এইরূপে প্রশ্বাস নিতে নিতে ডান হাত তুলুন এবং নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে নামান।

এইরূপে ক্রমান্বয়ে ১৫ বার করলে হাতের উপরের অংশ সুন্দর হবে এবং হাত গোলগাল নিটোল হবে।

৭ (ক)

ব্যায়াম নং ৪

হাত মুঠো ক'রে সোজা হ'য়ে দাঁড়ান্ এবং প্রসারিত হস্ত ভূমির সহিত সমান্তর (Parallel) রেখে ৪ (ক) ছবির আকার ধারণ করুন।

পরে হাত সোজা রেখে কব্‌জির কাছ থেকে হাতের মুঠো arrowএর নির্দ্দেশমত Circle দিয়ে ঘোরান। যাতে না কনুইয়ের কাছ থেকে হাত বেঁকে যায় সেদিকে দৃষ্টি রাখুন। এই ব্যায়াম অভ্যাসকালে সাধারণভাবে নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করুন।

এইরূপে ক্রমান্বয়ে যতক্ষণ না হাত ব্যথা হয় ততক্ষণ

করুন। এই ব্যায়াম অভ্যাস কর্লে হাতের নীচের দিকের গঠন সুন্দর হয়।

৭ (খ)

পরে প্রশ্বাস নিতে নিতে দুহাত মাথার উপরে তুলুন এবং ৬ (খ) ছবির আকার ধারণ করুন। পরে নিশ্বাস

৮ (ক)

ফেলতে ফেলতে হাত নামিয়ে ৬ (ক) ছবির আকার ধারণ করুন।

ব্যায়াম নং ৫

হাত মুঠো ক'রে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে দুহাত সামনের দিকে তুলে ৫ (ক) ছবির আকার ধারণ করুন।

পরে প্রশ্বাস নিতে নিতে দুহাত এক সঙ্গে প্রসারিত করুন এবং ৫ (খ) ছবির আকার ধারণ করুন। পরে নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে ৫ (ক) ছবির আকার ধারণ করুন।

এইরূপে ক্রমান্বয়ে ১০।১২ বার কর্লে Heart ও Lungsএর জোর বাড়ে।

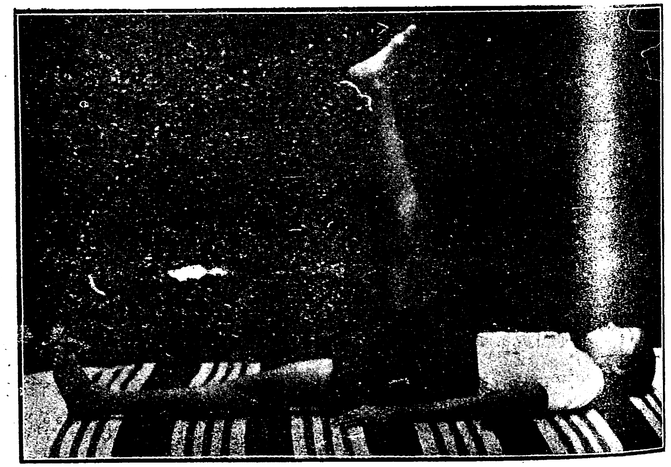

৯ (ক)

ব্যায়াম নং ৬

সোজা হ'য়ে ৬ (ক) ছবির মত দাঁড়ান।

এইরূপে ক্রমান্বয়ে ১০।১২ বার কর্লে Heart ও Lungs ভাল হয় এবং বক্ষের গঠন সুন্দর হয়।

ব্যায়াম নং ৭

সোজা হ'য়ে ৬ (ক) ছবির মত দাঁড়ান।

পরে উভয় হস্ত সম্পূর্ণ প্রসারিত ক'রে দ্রুত circle দিয়ে

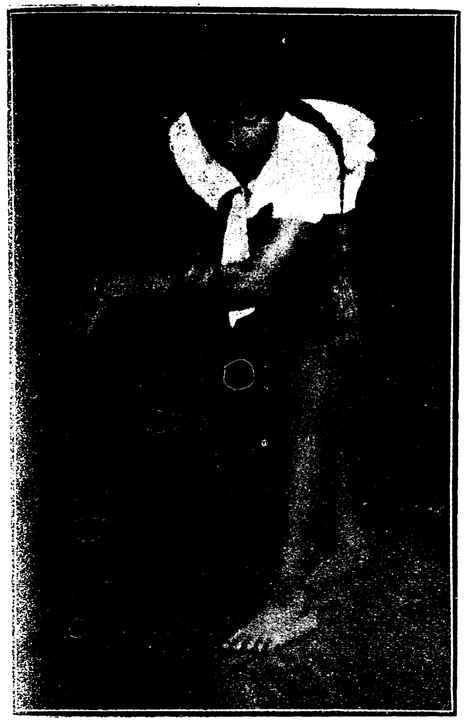

কুমারী নীলিমা চক্রবর্ত্তী লৌহপাটি বক্র করিতেছেন

(মাপ —৭ ফুট × ১ ১/২ ইঞ্চি × ৩/১৬ ইঞ্চি)

ঘোরান্। ঘোরাবার সময় হাত যখন মাথার উপরে উঠ্বে তখন ৭ (ক) ছবির আকার ধারণ করুন এবং যখন নীচের দিকে নামিবে তখন ৭ (খ) ছবির আকার ধারণ করুন।

এইরূপ ক্রমান্বয়ে ২০।২৫ বার কর্লে শরীরের উপরের অংশ—বুক, পিঠ ও কাঁধের গঠন ভাল হয়।

ব্যায়াম নং ৮

মাথার উপর হাত তুলে ৬ (খ) ছবির মতন দাঁড়ান। পরে প্রশ্বাস নিতে নিতে কোমর থেকে শরীরের অংশ বেঁকিয়ে হাত দিয়ে পা স্পর্শ করুন এবং ৮ (ক) ছবির আকার ধারণ করুন। এই অবস্থায় নিশ্বাস ছেড়ে ২ সেকেণ্ড অপেক্ষা ক'রে পরে আবার প্রশ্বাস নিতে নিতে ৬ (খ) ছবির আকার ধারণ করুন। এইরূপ ক্রমান্বয়ে

১০ (ক)

১০ বার করুন। এই ব্যায়াম অভ্যাসকালে যাতে না শরীরের নীচের অংশ (যেমন কোমর থেকে পা পর্য্যন্ত) বেঁকে, সেদিকে দৃষ্টি রাখুন।

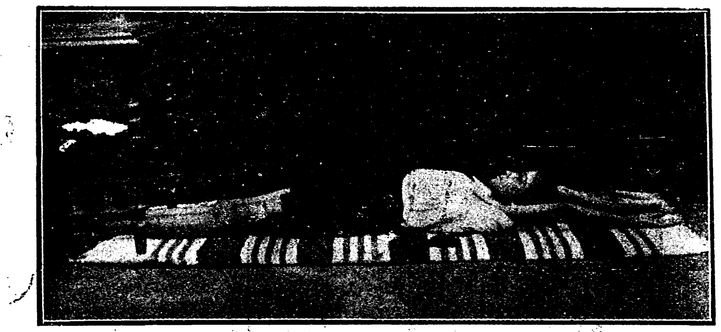

১১ (ক)

এই ব্যায়াম অভ্যাস করলে উচ্চতা ও হজমশক্তি বৃদ্ধি হয় এবং পৃষ্ঠের শিরার জোর বাড়ে।

ব্যায়াম নং ৯

ভূমির উপর চিৎ হ'য়ে শুন।

পরে প্রশ্বাস নিতে নিতে ডান পা arrowএর নির্দ্দেশমত

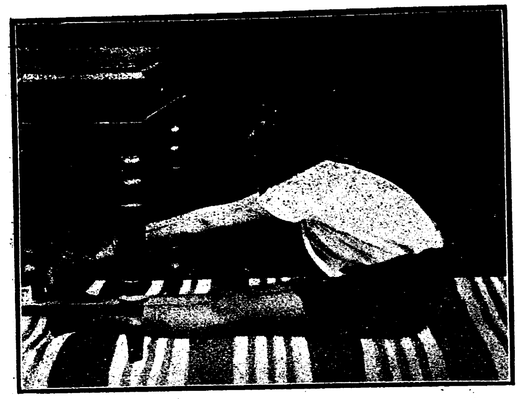

১১ (খ)

তুলে ৯ (ক) ছবির আকার ধারণ করুন। এই অবস্থায় যাতে পা শরীরের সহিত Perpendicular থাকে সে

১২ (ক)

দিকে দৃষ্টি রাখুন এবং পায়ের আঙ্গুল উপর দিকে করুন। পরে নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে পা নামিয়ে পূর্ব্বের আকার ধারণ করুন। এইরূপে প্রশ্বাস নিতে নিতে বাঁ পা তুলুন এবং নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে নামান।

এইরূপে ক্রমান্বয়ে প্রতি পা ১০ বার তুলে নামালে পেটের ও পায়ের উপরের অংশের এবং কোমরের আকার সুন্দর হয়। ইহা ছাড়া এই ব্যায়াম অভ্যাস করলে হজমশক্তি বাড়ে।

ব্যায়াম নং ১০

৯ নম্বর ব্যায়ামের মত চিৎ হ'য়ে ভূমিতে শুন।

পরে প্রশ্বাস নিতে নিতে দু-পা একসঙ্গে তুলে ১০(ক)

১৩ (ক)

ছবির আকার ধারণ করুন। পূর্ব্বের ন্যায় এই অবস্থায় পা যাতে শরীরের Perpendicular থাকে, সেদিকে দৃষ্টি রাখুন এবং পায়ের আঙ্গুল উপরের দিকে করুন। পরে নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে পা নামিয়ে পূর্ব্বের আকার ধারণ করুন। এইরূপ ক্রমান্বয়ে ১০ বার অভ্যাস করুন।

এই ব্যায়াম অভ্যাস করলে ৯ নম্বর ব্যায়ামের মত ফল হয়।

ব্যায়াম নং ১১

হাত মাথার উপরে প্রসারিত ক'রে চিৎ হ'য়ে শুয়ে ১১ (ক) ছবির আকার ধারণ করুন।

পরে প্রশ্বাস নিতে নিতে কোমর থেকে শরীরের উপরের অংশ ভূমি থেকে আস্তে আস্তে তুলে হাত দিয়ে পা স্পর্শ করুন এবং ১১ (খ) ছবির আকার ধারণ করুন। পরে নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে ১১ (ক) ছবির আকার ধারণ করুন। এই ব্যায়াম অভ্যাস কালে মাথার সহিত হাত যাতে সংলগ্ন থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখুন এবং Jerk না দিয়ে পেটের মাংসপেশীর উপর ভর দিয়ে উঠুন।

শরীরের উপরের অংশ তোলবার সময় পা প্রায় ভূমি হ'তে উঠে যায়; সেইজন্য টেবিলে বা অন্য আসবাবের তলায় পা আটকে রাখলে—ভাল হয়। ১১(ক) ও (খ) ছবিতে পা টেবিলে সংলগ্ন করা হয়েছে।

ক্রমান্বয়ে এই ব্যায়াম ১২ বার করলে পেটের নিম্ন অংশের গঠন ভাল হয়। ইহাতে পেটের সমস্ত মাংসপেশীর ব্যায়াম হয় ও হজমশক্তি বাড়ে এবং ভুঁড়ি কমে। বাল্যকাল থেকে মেয়েরা এই ব্যায়াম অভ্যাস করলে প্রসবের সময় কষ্টের লাঘব হয়।

ব্যায়াম নং ১২

সোজা হ'য়ে হাত প্রসারিত ক'রে দাঁড়ান এবং প্রসারিত হস্ত ভূমির সহিত Parallel রেখে ৪ (ক) ছবির আকার ধারণ করুন।

ব্যায়াম বিদ্যপীঠের মেয়েরা ১৩ নম্বর ব্যায়ামটি একসঙ্গে অভ্যাস করছেন

১৪ (ক)

পরে প্রশ্বাস নিতে নিতে শরীরের উপরের অংশ কোমর থেকে বাঁ দিকে বাঁকান এবং হাত ভূমির সহিত Perpendicular ক'রে ১২ (ক) ছবির আকার ধারণ করুন। পরে

১৪ (খ)

নিশ্বাস ফেল্‌তে ফেল্‌তে ৪ (ক) ছবির আকার ধারণ করুন। এই অবস্থায় ২ সেকেণ্ড থাকবার পর পূর্ব্বের ন্যায় প্রশ্বাস

১৫ (ক)

নিতে নিতে ডান দিকে বেঁকুন এবং পরে নিশ্বাস ফেল্‌তে ফেল্‌তে আবার ৪ (ক) ছবির আকার ধারণ করুন। (প্রতিবার যখন ৪ (ক) ছবির আকার ধারণ করা হবে, তখন ২ সেকেণ্ড অপেক্ষা করা উচিত।)

এইরূপে ১ বার বাঁ দিকে—আর ১ বার ডান দিকে, ক্রমান্বয়ে ১০ বার করলে কোমরের গঠন সুন্দর হয় এবং হজম্ শক্তি বাড়ে।

ব্যায়াম নং ১৩

সোজা হ'য়ে ৬ (ক) ছবির মত দাঁড়ান ও কোমরে হাত দিন। পরে কোমর থেকে শরীরের উপরের অংশ ডান দিকে দিয়ে circleএর মত ক'রে arrowএর নির্দ্দেশ মত ঘুরাতে থাকুন—যে পর্য্যন্ত না ক্লান্তি অনুভব করেন।

পরে ২ সেকেণ্ড বিশ্রামের পর বাঁ দিক দিয়ে circleএর মত ঘোরান। এই ব্যায়াম অভ্যাস কালে নিশ্বাস প্রশ্বাস সাধারণভাবে গ্রহণ করুন।

এই ব্যায়াম অভ্যাস কর্‌লে কোমরের গঠন ভাল হয়

১৫ (খ)

পেটের মাংসপেশীর শক্তি বৃদ্ধি হওয়ায় হজম্‌শক্তি ।

ব্যায়াম নং ১৪

টেবিল বা টুলের উপর হাত রেখে ১৪ (ক) ছবির ার ধারণ করুন।

পরে প্রশ্বাস নিতে নিতে হাতের কনুয়ের কাছ থেকে সমস্ত শরীরের ভার হাতের উপর দিয়ে দেহ নীচের ক নামান এবং ১৪ (খ) ছবির আকার ধারণ করুন।

১৬ (ক)

রে উঠুন এবং ১৪ (ক) ছবির আকার ধারণ করুন। খন নিশ্বাস ফেলুন। এইরূপ ক্রমান্বয়ে ১০ বার করুন।

যখন এই ব্যায়াম টুলে বা টেবিলে হাত রেখে সহজ য়ে যাবে, তখন ভূমির উপর হাত রেখে অভ্যাস করবেন।

এই ব্যায়াম অভ্যাস কর্‌লে হাতের উপরের অংশ নিটোল হয়, বুকের আকার বৃদ্ধি হয় এবং কোমরের ও পিঠের গঠন সুন্দর হয়।

ব্যায়াম নং ১৫

চেয়ার, টেবিল বা অন্য কোন জিনিষের উপর হাত রেখে সোজা হ'য়ে দাঁড়ান। পরে বাঁ-পা ভূমি থেকে তুলে পায়ের পাতা (গোড়ালি থেকে আঙ্গুল পর্য্যন্ত) নীচের দিকে করুন এবং ১৫ (ক) ছবির আকার ধারণ করুন। এই অবস্থায় ১ সেকেণ্ড থেকে পায়ের পাতা উপর দিকে করুন এবং ১৫ (খ) ছবির আকার ধারণ করুন। এইরূপে ক্রমান্বয়ে ২০ বার করুন। পরে বাঁ-পা ভূমিতে নামিয়ে ডান পা তুলে পায়ের পাতা পূর্ব্বের ন্যায় ১ বার

১৭ (ক)

নীচে আর ১ বার উপর দিকে ক'রে ক্রমান্বয়ে ২০ বার করুন।

এই ব্যায়ামকালে হাঁটু যাতে না বেঁকে, সে দিকে দৃষ্টি রাখুন। নিশ্বাস প্রশ্বাস সাধারণভাবে গ্রহণ করুন।

এই ব্যায়াম অভ্যাস কর্‌লে পায়ের পাতার গঠন ভাল হয় ও শক্তি বাড়ে।

ব্যায়াম নং ১৬

সোজা হয়ে দাঁড়ান; পরে গোড়ালি তুলে আঙ্গুলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ান এবং ১৬ (ক) ছবির আকার ধারণ করুন। এইরূপে ক্রমান্বয়ে ২০ বার করুন। এই ব্যায়াম অভ্যাসকালে নিশ্বাস প্রশ্বাস সাধারণভাবে গ্রহণ করুন।

এই ব্যায়াম অভ্যাস করলে পায়ের গঠন সুন্দর হয়।

১৭ (খ)

ঘাড়ের জন্য বিশেষ ব্যায়াম।

এইবার যে দুটি ব্যায়ামের বিবরণ দিব, সেদুটি সকলের জন্য নয়—কেবল যে সব মেয়েদের ঘাড় সরু, তাদের জন্যে। এই ব্যায়াম দুটি মাস ছয় অভ্যাস করবার পর যখন ঘাড়ের গঠন শরীরের গঠনের সঙ্গে সমতা লাভ করবে, তখন এই ব্যায়াম দুটির অভ্যাস বন্ধ করা উচিত—তা না হ'লে ঘাড় অত্যন্ত মোটা হওয়ার দরুণ মেয়েদের অত্যন্ত বেঁটে দেখাবে।

ব্যায়াম নং ১৭

ডান হাত মাথার উপর রেখে, ঘাড় বাঁ দিকে বেঁ… সোজা হ'য়ে টুলে বা চেয়ারে বসুন এবং ১৭ (ক) … আকার ধারণ করুন।

পরে প্রশ্বাস নিতে নিতে ঘাড় ডান দিকে বাঁকা… সময় হাত দিয়ে ঘাড় বাঁ দিকে আস্তে চাপুন, যাতে…

১৮ (ক)

দিকে ঘাড় বাঁকাতে একটু কষ্ট হয়। যখন ঘাড় সম্… ডান দিকে আসবে, তখন নিশ্বাস ছাড়ুন। পরে ডা… হাত নামিয়ে কোলে রেখে, বাঁ হাত মাথার উপর দি… ১৭ (খ) ছবির আকার ধারণ করুন। পরে প্রশ্বাস নি… নিতে পূর্ব্বের ন্যায় বাঁ হাতে ডান দিকে ঘাড় আস্তে ঠে… বাঁ দিকে ঘাড় বেঁকান এবং সম্পূর্ণ বাঁকান হ'লে নিশ্… ফেলুন।

এইরূপে ক্রমান্বয়ে ১৫ বার অভ্যাস করুন।

ব্যায়াম নং ১৮

…মাথার উপরে দু-হাত রেখে মাথা নীচু ক'রে চেয়ারে …বসুন এবং ১৮ (ক) ছবির আকার ধারণ করুন। …রে প্রশ্বাস নিতে নিতে মাথা উপরে তুলুন এবং …শের বা ঘরের ছাদের দিকে চান। তোলবার সময় …দিয়ে মাথা আস্তে নীচের দিকে চাপুন—যাতে ঘাড় …একটু কষ্ট হয়। এখন নিশ্বাস ছাড়ুন। পরে …মাথার উপর থেকে নামিয়ে দাড়ির নীচে রাখুন এবং

১৮ (খ)

…উপর দিকে তুলুন এবং ১৮ (খ) ছবির আকার …করুন। পরে প্রশ্বাস নিতে নিতে মাথা নীচের …নামান এবং নিশ্বাস ফেলুন। এইরূপে ক্রমান্বয়ে …বার, একবার মাথা নীচের দিকে—আর একবার উপর …করুন। এই ব্যায়াম অভ্যাসকালে মনে রাখতে …যখন মাথা নীচের দিকে আনতে হবে, তখন দাড়ির …হাত দিয়ে মাথা উপর দিকে আস্তে ঠেলতে হবে এবং যখন উপর দিকে করতে হবে, তখন মাথার উপর হাত দিয়ে নীচের দিকে চাপতে হবে।

এবার ব্যায়ামকারিণীর কতগুলি প্রয়োজনীয় বিষয়—ব'লে আমার লেখা শেষ করব। প্রত্যেক মহিলার এইগুলি অবশ্য পালনীয়—

(১) মুক্ত স্থানে ব্যায়াম করা; ঘরের মধ্যে ব্যায়াম করলে জানালা দরজা সমস্ত খুলে রাখা উচিত।

(২) অতিরিক্ত বা দ্রুত ব্যায়াম না করা।

(৩) প্রত্যহ নিয়মিত ব্যায়াম করা এবং সপ্তাহে একটা নির্দ্দিষ্ট দিন ব্যায়াম না করা।

শ্রীমতা রেবা দাশ লৌহপাটি বক্র করিতেছেন। (মাপ ৭ ফুট × ১½ ইঞ্চি × ⅛ ইঞ্চি)

(৪) মুখ দিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ বা পরিত্যাগ না ক'রে, নাসিকার সাহায্যে করা।

(৫) ঋতুকালে ব্যায়াম নিষেধ। ঋতুর আরম্ভের দিন থেকে পাঁচদিন ব্যায়াম বন্ধ রেখে ষষ্ঠ দিন থেকে ২১৩ দিন অল্প ব্যায়াম অভ্যাস ক'রে পরে পূর্ব্বের ন্যায় অভ্যাস করা।

(৬) যে সমস্ত স্ত্রীলোক প্রত্যহ ব্যায়াম করেন তাঁদের গর্ভাবস্থায়ও ব্যায়াম করা উচিত। তবে প্রসবকাল যত নিকটবর্ত্তী হবে, তত ব্যায়ামের মাত্রা কমান উচিত। ব্যায়াম অভ্যাস রাখলে অল্প প্রসবযন্ত্রণা ভোগ করতে হয় এবং দ্রুত প্রসব হয়। কিন্তু তা ব'লে যে স্ত্রীলোক কখনও ব্যায়াম করেন নি এবং অত্যন্ত দুর্ব্বল, তাঁরা যদি প্রসবযন্ত্রণা কম হ'বে মনে ক'রে প্রসবকালে ব্যায়াম আরম্ভ করেন, তা হ'লে তাঁদের শারীরিক ক্ষতি হবার সম্ভাবনা।

এই প্রবন্ধের ব্যায়াম-প্রদর্শনকারিণীদ্বয়ের নাম শ্রী রেবা দাশ ও কুমারী নালিমা চক্রবর্ত্তী। কুমারী কেবল ৯, ১০, ১১ ও ১৬ নম্বর ব্যায়ামগুলি করেছেন এবং শ্রীমতী দাশ অপর সমস্ত ব্যায়ামগুলি করেছেন। শ্রীমতী রেবা দাশ লেখকের পত্নী এবং নীলিমা লেখকের ছাত্রী। উভয়ে অল্পদিন মাত্র ব্যায়াম করেছেন। ইঁহারা শারীরিক ব্যায়াম দ্বারা এত শক্তি হয়েছেন যে অনায়াসে লৌহপাটি বক্র করতে পারেন।

মুদীর দোকান

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

সাজান রয়েছে চাল, ডাল, নুন,
ময়দা, চিনি ও সুজি;
খাঁটী সরিষার তৈল ও ঘৃত
পাই নাই যাহা খুঁজি।
আল্‌কাতরার পিপা ও রয়েছে
কেরোসিন টিন শত,
তিসি ও তামাক, খৈল, চিটাগুড়,
নাম ল'ব আর কত।
যাহা চায় লোকে—যাহা দরকারী,
সকল দ্রব্য হেরি,
ক্রেতা ও প্রচুর দোকান খানাকে
রাখিয়াছে যেন ঘেরি।
কড়া ক্রান্তির কঠিন ক্ষেত্রে
কি যেন খুঁজিছে প্রাণ,
সহসা পেলাম অনাস্বাদিত
ধূপের স্নিগ্ধ ঘ্রাণ!
আর দেখিলাম দূরে একপাশে
বসিয়া ভক্তিভরে,
বৃদ্ধ জনেক সজল নয়নে
রামায়ণ পাঠ করে।
শুষ্ক নীরস রাজপুতানার
চুঙ্গীর দপ্তরে,
জগন্নাথের 'পথাল' প্রসাদ
আসিল কেমন করে?
নর্ম্মদার এই মর্ম্মর ঘাটে
গোপী চন্দন আনি,
কর্ম্মের মাঝে ধর্ম্মের ফাগ
কে করিল আমদানী?
ব্যবসার এই তাম্রলিপ্তে,
লাভের সপ্তগ্রামে,
কোন সে ভক্ত সকল ভুলিয়া
পুজিতেছে সীতারামে?
যেথা দিবানিশি ঢোল সহরৎ
শুধু ডুগডুগি শুনি,
বুঝিনে সেখানে কেমনে উঠিল
শুভ শঙ্খের ধ্বনি!
ঠোঙার এ দেশে হাতে দিল এসে
এ যেন রে গুয়া পান,
তুলাদণ্ডের খণ্ড রাজ্যে
কাব্যের অভিযান!
বুঝিনু দয়াল যে ভাবে থাকুক
মানুষ তোমারে চায়,
তোমার চরণ সরোজের বাস
সাত তাল ভেদি' যায়।
যতই হউক কঠিন কঠোর
হউক স্বার্থপর,
তোমারে না লয়ে পারেনা, চাহেনা—
মানুষ করিতে ঘর।
ব্যস্ত কেহ বা ধান চাল লয়ে
কেহ লয়ে রূপা সোণা,
সবাকার মাঝে নীরবে চলিছে
তোমারি যে আরাধনা!

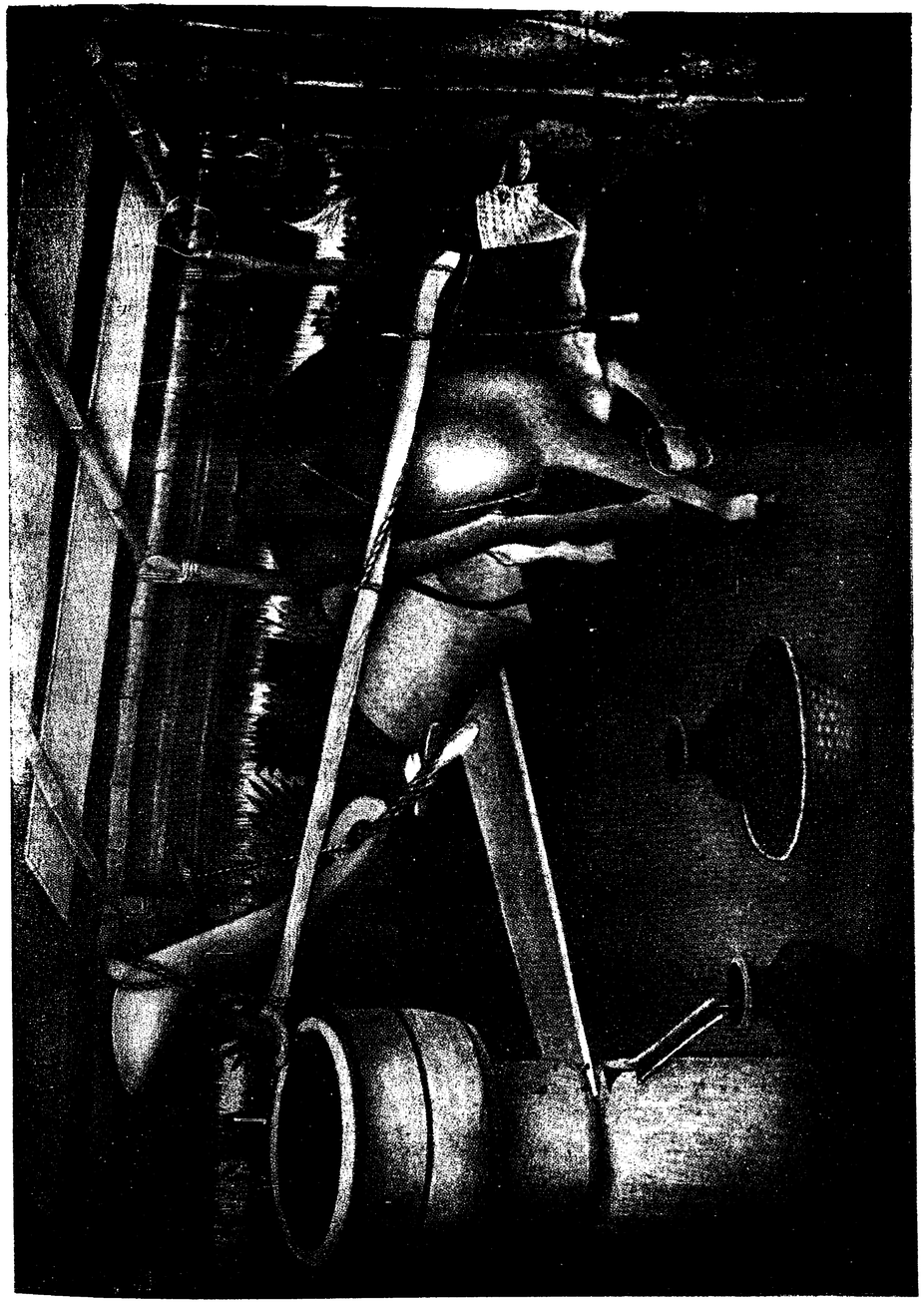

মা আমায় ঘুরাবি কত?

শিল্পী—শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ গুপ্ত

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

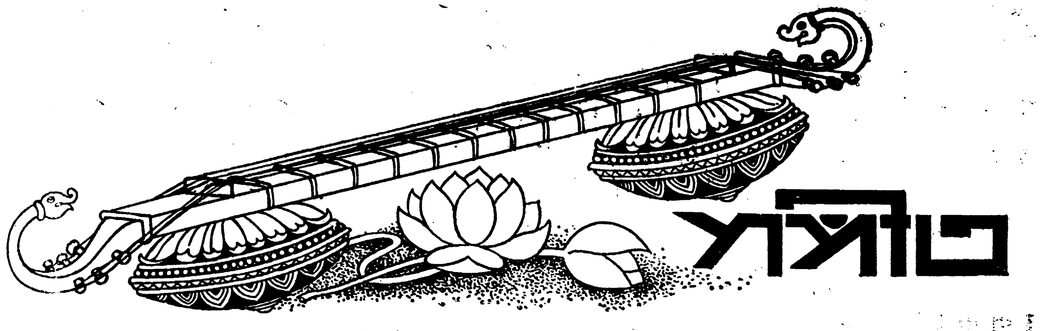

সঙ্গীত

কথা ও সুর ঃ—কাজী নজরুল্ ইস্‌লাম ।　　　　স্বরলিপি ঃ— জগৎ ঘটক

মধুমাধবী সারং—ত্রিতালী

দক্ষিণ সমীরণ সাথে বাজো বেণুকা ।
মধুমাধবী সুরে চৈত্র পূর্ণিমা রাতে
　　বাজো বেণুকা　বাজো বেণুকা ॥
বাজো　　শীর্ণ স্রোত-নদী-তীরে
বাজো　　ঘুম যবে নামে বন ঘিরে,
যবে　　ঝরে এলোমেলো বায়ে ধীরে
　　　　ফুল-রেণুকা ॥
মধু-মালতী বেলা-বনে ঘনাও নেশা,
স্বপন আনো জাগরণে মদিরা-মেশা ।
　মন যবে রহেনা ঘরে—
　বিরহ-লোকে সে বিহরে,
　যবে নিরাশার বালুচরে
　　　　ওড়ে বালুকা ॥

[ণপা]　　　　　　　　　　　　॥
II র্সণা পণর্সর্রা র্রা র্রা | র্সা র্সা ণা -পা | মা -া মর্সা -া | -া -া -া -া I
দ০ ০০০০ ক্ষি ণ　স মী র ণ　সা ০ থে ০　০ ০ ০ ০

I ণণা পা মা পা | মপা -মপমা রা -া | রা পা মা -া | রা রা সা সা I
বা০ জো বে ণু　কা ০০০ ০ ০　ম ধু০ মা ০　ধ বী সু রে

সা ন্স -রা সা | ণ্া প্া ন্া ন্া | নসা -া সা -া | -া -া -া -া I
চৈ ০০ ০ ত্র　পূ র্ ণি মা　রা ০ তে ০　০ ০ ০ ০

I সসা রা রমা মা | মপা -া -া -া | ররা মা মপা পা | প ণা -া -া -া II
বা০ জো বে　কা ০ ০ ০　বা০ জো বে ণু　কা ০ ০ ০

০১

[ণা -া ণা ণা -না না না না]
মা মা II { পা -া পা পা | ণা -পা পনা না | নর্সা -া র্সা -া | -া -া র্সা র্সা I
বা জো শী র্ ণা স্রো ০ ত ন দী তী ০ রে ০ ০ ০ বা জো

I না -র্সা র্রা র্রর্মর্গর্মা | র্রা র্রা র্সা র্সা | নর্সা -র্রা র্সর্রর্সা -া | ণা -া (-া -া) } I
ঘু ম্ য বে ০ ০ না মে ব ন ঘি ০ ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ ০

I ণা ণা I পা পর্সা র্সর্রর্সা র্সা | ণাধ ণা পা পা | পমা -মপা পা -া | -া -া -া -া I
য বে ঝ রে০ এ ০ ০ লো মে লো বা য়ে ধী ০ ০ ০ রে ০ ০ ০ ০ ০

I মা পা মা পা | মপমা -া রা পা | মপমা মা রা রা | সা -া -া -া I
ফু ল রে ণু কা০০ ০ ০ ০ বা০০ জো বে ণু কা ০ ০ ০

I সসা রা রমা মা | মপা -া -া -া | ররা মা মপা পা | পণা -া -া -া II
বা০ জো বে ণু কা ০ ০ ০ বা০ জো বে ণু কা ০ ০ ০

া া II রা পা মা -মা | রা রা সা রা | রন্া -া -া -সা | সা -া -া -া I
০ ০ ম ধু মা ০ ল তী বে লা ব ০ ০ ০ নে ০ ০ ০

I রমা রা মা মা | মপা -া -া -া | সা রা রমা মা | মপা -া পা পা I
ঘ০ না ও নে শা০ ০ ০ ০ স্ব প ন আ নো ০ জা গ

I পণা -া পা -া | -া -া -া র্সা | ণা পা মা রা | সা -া -া -া I
র০ ০ নে ০ ০ ০ ০ ০ ম দি রা মে শা ০ ০ ০

[ণা -া ণা ণা ণা -না না না
I { মা -া পা পা | পণা -পা না না | নর্সা -া র্সা -া | -া -া -া -া I
ম ন্ য বে র০ ০ হে না ঘ ০ রে ০ ০ ০ ০ ০

I না র্সা র্রা র্রর্মর্গর্মা | র্রা -া র্সা র্সা | নর্সা -র্রা র্সর্রর্সা -া | ণা -া -া -া } I
বি র হ লো০০ কে ০ সে বি হ০ ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I পা পর্রা র্সর্রর্সা র্সা | ণা ণা পা পা | পমা -গমপা পা -া | -া -া -া -া I
য বে০ নি ০ ০ রা শা র্ বা লু চ ০ ০ রে ০ ০ ০ ০ ০

I মা পা মা পা | মপমা -া রা -পা | মপমা মা রা রা | সা -া -া -া I
ও ড়ে বা লু কা০০ ০ ০ ০ বা০০ জো বে ণু কা ০ ০ ০

I সসা রা মা মা | মপা -া -া -া | ররা মা মপা পা | পণা -া -া -া II II
বা০ জো বে ণু কা ০ ০ ০ বা০ জো বে ণু কা ০ ০ ০

গল্প

চির নবীন

শ্রীমতী আশালতা সিংহ

...তকালের সকাল বেলাটি কী মধুর হয়েই না দেখা দিয়েছে। ...াণার বর্ণের রোদের ছটা এসে আমলকী তলায় পড়েচে, ...খানে বুধি গাইটা বাঁধা আছে, বেচারী রোগা হয়ে ...ছে। সুধীরা করুণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে তার ...য়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। মনে মনে ভাবচে, বেচারা খেতে ...য় না ভালো করে, তাই না রোজ রোজ এমন রোগা ...য়ে যাচ্ছে। আজ আমি যেমন করে পারি মা'র কাছ ...কে কপির পাতা চেয়ে এনে দেব। শিশির ভেজা ঘাসের ...পর ক্রমশঃ সূর্য্যের আলো ছড়িয়ে পড়েচে। সুধীরার বয়স ...টে সাত আট বছর। তার আলেষ্টারের সাত আট ...য়গায় ছিঁড়ে করা, দু'এক জায়গায় তালি লাগানো। ...বুও সে অবাক নয়নে শীতপ্রভাতের মেঘলেশহীন আকাশ ...সুপ্রচুর আলোর দিকে চেয়ে আছে। মনে এসে লাগচে ...কটা খুসীর আমেজ।

তাদের বাড়ীটা একটা পোড়ো আমবাগানের মধ্যে। ...দিকটা একেবারে ফাঁকা, লোকের বসতি প্রায় নেই ...লেই চলে। আমবাগানের ভেতর দিয়ে একটা পায়ে-...া রাস্তা গঙ্গার ধার অবধি গিয়েছে। গঙ্গা এখান ...কে এক মিনিটের রাস্তা। যেখানে বুধি গাই বাঁধা ...ছে সেইখানে দাঁড়িয়ে সুধীরা গঙ্গার শীত-সঙ্কুচিত শীর্ণ ...হারা, আর সাদা বালির চড়া স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। এই ...ান বে-মেরামত একতলা বাড়ীখানি খুব শস্তা ভাড়ায় ...য়েচেন বলে উকীল বিজয়বাবু নিয়েচেন। এই বছর ...য়ে ঠিক ছ'বছর হোল তিনি পশ্চিমের এই নামজাদা ...রটিতে ওকালতী করতে আরম্ভ করেচেন। প্রথমে ...নেক আশা ছিল, আদর্শ ছিল, আকাঙ্ক্ষা ছিল। এখন ...শার পরিধি ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়ে এমন হয়েচে যে, ...র ওকালতীর আয় থেকে তাঁর সংসারটা চলে গেলেই তিনি খুসী। আর বড় বেশি কিছু চা'ন না। অথচ তাও চলচে না। আজ ছ'মাসের বাড়ী ভাড়া বাকী, মুদীর দোকানে দেনা। ঠিকে ঝি একটা ছিল, সেটাকেও তাঁর স্ত্রী মালতী কতদিন হোল ছাড়িয়ে দিয়েচেন। নিজের হাতেই সব কাজ করেন। বাসন মাজা থেকে আরম্ভ করে—রান্না করা, কাপড় কাচা, ঘুঁটে দেওয়া, সবই। এততেও কিন্তু খরচ চালানো যাচ্ছে না।

রান্না ঘরের দাওয়ায় একখানা দীর্ণ কম্বলের আসন পাতা, সামনে কলাই করা গোটা দুই চায়ের পেয়ালা, একটা চায়ের কেট্‌লি। একটা পেয়ালায় অনেকখানি অ-পীত চা পড়ে রয়েচে। মালতী বিষণ্ণ মুখে কপির শাক এবং ডাঁটা দিয়ে একটা তরকারী বনিয়ে রাখচেন। এই একটুখানি আগেই স্বামী এসেছিলেন, এসে ঐ আসনে বসে চায়ের পেয়ালাটি সবেমাত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন। মালতী ভয়ে ভয়ে মৃদুস্বরে বললে, "ওগো, শোন, বাড়ীওয়ালার মা আজ আবার খুব ভোরে গঙ্গাস্নানের পথে এইখানে এসে আমাকে যা নয় তাই বলে গেলেন। ক'টাই বা টাকা বাকী। দিয়ে দাও না।"

বিজয়কুমারের প্রকৃতি খুব শান্ত। বিয়ের পরের প্রথম কয়েক বছর মালতী মনেও করতে পারে না, তিনি কোনদিন একটি কড়া কথা বলেচেন। কিন্তু ইদানীং হয়ে উঠেচে অন্য রকম। রাতদিন সংসারের প্রকাণ্ড দায়িত্ব এবং অর্থ কষ্টর সঙ্গে লড়াই করতে করতে তাঁর প্রকৃতি অসহিষ্ণু হয়ে দাঁড়িয়েচে। অল্পতেই হয়তো রেগে ওঠেন, হঠাৎ যা তা ব'লে ব'সেন। স্ত্রীর এই ভীত করুণ অনুযোগ শেষ হতে না হতেই তিনি বারুদের মত বিস্ফারিত হয়ে উঠ্‌লেন, হাতের পেয়ালা জোর করে সুমুখের দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, "তুমি কী মনে করেচ? আমি কি ইচ্ছে করে বাড়ী ভাড়ার টাকা

দিচ্ছিনে, তুমি কি মনে কর আমি অনেকগুলো টাকা লুকিয়ে রেখে সবাইকে ফাঁকি দিয়ে মিথ্যে কথা বলে বেড়াচ্ছি? তা মনে করবে না কেন বল? এ তোমারই উপযুক্ত কথা হয়েচে। তোমার হাড়ে লক্ষ্মী নেই। সংসারে কত কত মেয়ে দেখা যায়, যাঁরা ঘরে পা দিতে না দিতেই ঘরের অবস্থা ফিরে যায়। সংসারের শ্রী উথ্‌লে ওঠে। তাই না, কথায় বলে স্ত্রীভাগ্যে ধন। আর তোমাকে দেখো না, যখন থেকে তোমাকে বিয়ে করেচি, দুঃখ কষ্টের আর পার নেই।

বাড়ী ভাড়ার টাকা আমি লুকিয়ে রাখি নাই গো, লুকিয়ে রাখি নাই।

তোমাদের জন্যে এবারে আমাকে ছুটে কোন এক দিকে পালাতে হবে।

মালতী আর দ্বিতীয় কথা বলে নাই। চুপ করে বিবর্ণ মুখে নিজের জন্যে এক পেয়ালা চা ঢালছিল, বিজয়বাবু হঠাৎ আসন থেকে উঠে পড়ে আলনা থেকে মান্ধাতার আমলের পুরাণ গায়ের কাপড়খানা টেনে নিয়ে দ্রুতপদে বার হয়ে গেলেন। রুটির রেকাবি, আর চায়ের পেয়ালা, তাঁর অমনি পড়ে রইল। মালতীর চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যে আত্ম সংবরণ করে নিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। সংসারের শত সহস্র করাল বাহু যেখানে উদ্যত সেখানে মনভার নিয়ে বসে থাকবার, সৌখীন শোক করবার অবসর তাদের মত অবস্থার লোকেদের রয়েচে কি? ...উনুনে আঁচ ধরে উঠেচে, ডালের হাঁড়িটা বসিয়ে দিয়ে সে যা হোক একটা কিছু তরকারী বনিয়ে নিতে বসেচে, এমন সময় সুধীরা কাছে এসে বললে "মা, বুধি খেতে পায় না। রোগা হয়ে গেছে কত, তাকে কপির শাক দেবে না মা?"

মালতী মেয়েকে তাড়া দিলেন, "না, না, গরুকে দিয়ে নষ্ট করতে হবে না। ওতে তরকারী হবে।"

সুধীরা তবুও একটুখানি জিদ করবার উপক্রম করতেই ঠাশ ঠাশ করে তার মা তাকে মেরে ব'সল। সুধীরা অবাক হয়ে তার মায়ের দিকে চাইল, যেন কাঁদতে ভুলে গেল। অভিমানে স্তব্ধ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে অন্যত্র চলে গেল।

এর পরে মালতীর হাতের কাজ আর চলে না। সমস্ত সংসারের ভূমিকা প্রকাণ্ড একটা ভারের মত তাঁর মনকে পীড়ন করতে লাগল। শীতের স্বচ্ছ শীর্ণ গঙ্গা—বহুদূর বিস্তৃত শুভ্র বালুচর এবং তীরপ্রান্তবর্ত্তী কাশগুচ্ছের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে। আকাশে কী অমলিন সূর্য্যালোক, পৃথিবীতে যদি এত সৌন্দর্য্য, প্রকৃতির মাঝে এত শান্তি, তবু মানুষের ক্ষুদ্র জীবনকে ঘিরে এত কষ্ট কেন? রান্নাঘরের একটা খুঁটিতে ঠেশ দিয়ে শূন্য মনে বাইরের দিকে চেয়ে এই প্রশ্নটাই মালতীর মনের মধ্যে আনাগোনা করতে লাগ্‌ল।

ঐ একটিমাত্র মেয়ে, কত আদর যত্নে মানুষ করেচে তাকে, প্রথম যখন সে হয়, অন্ধকার নিস্তব্ধ মাঝরাত্রিতে ঘুম ভেঙ্গে যেয়ে তারা ভরা আকাশের দিকে চেয়ে খুকীর কথা মনে করে, তাকে কেমন করে মানুষ করবে, তাকে কত ভাল করে শিক্ষা দেবে, কি আদর্শে মানুষ করবে; এই চিন্তা নিয়ে কত নিশুতি প্রহর কাটিয়ে দিয়েচে। তাকেই আজ প্রায় বিনা কারণে নির্দ্দয়ভাবে মেরে ব'সল।

সকাল থেকেই আজ মনটা ভাল নেই। সুধীরাকে অনেক কষ্টে বুঝিয়ে সুঝিয়ে স্নান করিয়ে খাইয়ে দিয়েছে। স্বামী আজ সকাল সকাল কোর্টে চলে গিয়েছেন। মালতী চুপ করে নিজের ঘরে বসে আছে। উপস্থিত অনেকখানি সময়ের জন্য আর হাতে কোন কাজ নেই। মনটা তাই কত কি না ভাবচে। সামনের পতিত জমিটা ভাগে দেওয়া হয়েচে। মালী বৌ আর মালী দু'জনে মিলে তাতে সিঁচ করচে, শীগ্‌গীর বাঁধা কপির আর মূলার চারা লাগাবে বলে। ইঁদারা থেকে একটা প্রকাণ্ড চামড়ার থলিতে করে বলদকে দিয়ে তারা জল তোলাচ্ছে। আর নালা দিয়ে বয়ে সমস্ত ক্ষেতময় জল আসচে। জল তোলার একটা একটানা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ দুপুর বেলার নিস্তব্ধ প্রহরগুলির নিঃশব্দতাকে আরও ঘনীভূত—আরও প্রগাঢ় করে তুলেচে। সুধীরা চটি পায়ে বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে. মায়ের উপর থেকে অভিমান তার এখনও সম্পূর্ণ দূর হয় নাই।

মালতীর মনে পড়ছিল এমনই শীতকালে, তারিখটা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে সাতাশে অগ্রহায়ণ তার বিয়ে হয়। বিয়ের দিনে তার এত শীত করছিল, বেনারসী কাপড়, এক গা গয়না···কিন্তু কি একটা অজানা পুলক, বিস্ময়, ভয়ে বুকটা কাঁপছিল। শীতে ইচ্ছা করছিল, খুব গরম একটা আলোয়ানে সমস্তটা মুড়ে চুপটি করে বসে থাকে। সেদিনও বাতাসে এমনই হিমগন্ধী শিশিরভেজা আর্দ্রতা ছিল। বাইরে অনেকক্ষণ থেকে একটা মোটরের হর্ণ শোনা যাচ্ছে।

সুধীরা দৌড়ে এসে বল্লে, "মা মা শান্তি মাসীমা এসেচেন!" শান্তি দেবী এই পাড়ারই বিখ্যাত উকীল শ্রীশবাবুর পুত্রবধূ। মালতীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব অনেকদিনের। অবস্থার পার্থক্য সত্ত্বেও মালতীর মধুর স্বভাব এবং গুণের জন্য শ্রীশবাবুর পরিবারে তার অত্যন্ত সমাদর ছিল।

চওড়া কালোপাড়ের শান্তিপুরি শাড়ী পরে একজন সুন্দরী মোটাসোটা মহিলা ঘরে ঢুকে ব'ললেন, "চল, চল, তোকে নিতে এসেচি। এদিকে ভারি মুস্কিলে পড়েচি ভাই, কলকাতার এক জায়গায় আমার ছোট ননদ ইলার বিয়ের কথাবার্ত্তা চ'লছিল। তাদের অনেকদিন থেকেই দেখতে আসবার কথা ছিল, আজ হঠাৎ এসে পড়েচে। বরের মামা, এক বন্ধু, আর বর নিজে। এইমাত্র এগারোটার ট্রেণে নামলো। মা বাড়ী নেই, বাবা কোর্টে গিয়েচেন। আমি তো ভেবে অস্থির। বাবাকে আর ওঁকে কোর্ট থেকে আসবার জন্য খবর পাঠিয়ে দিয়ে—আর ওঁদের নাবার খাবার একটা বন্দোবস্ত করে দিয়েই আমি তোর কাছে ছুটে আসচি। জানিস তো ভাই স'ই, এদিকে সবটি ভালো হ'লেও ইলার রঙ্গের ততটা জৌলুষ নেই। তাই ভাবচি ক'লকাতার লোকের চোখে ধরলে হয়। মা আমার উপর সংসারের সব ভার ছেড়ে দিয়ে ঠাকুরপোকে সঙ্গে নিয়ে পুরী, মাদুরা, কাশী, বৃন্দাবন করে বেড়াচ্ছেন। যাবার সময় বলে গেলেন, 'তোমার উপর আমার খুব বিশ্বাস বৌমা। তোমার হাতে এ সংসার আমার চেয়েও ভালো চলবে এ যদি না বুঝতে পারতুম, তবে কি আর এত নিশ্চিন্ত মনে সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারতাম—মা!'

এখন তিনি যদি এসে শোনেন, ইলাকে দেখতে এসে-ছিল, পছন্দ হয়নি, তাহলে কি মনে করবেন, ভেবে দেখ দিকি। ভয়ে আর ভাবনায় আমার হাতে পায়ে বল আসচে না। চল ভাই চল। ভালো করে তাকে সাজিয়ে দিবি, শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরী করে দিবি। তোর মত করে আর তাকে কে সাজাতে পারবে ব'ল।"

মালতী মৃদু হাসিয়া কহিল, "চল না ভাই, যাচ্ছি। তুমি হাঁফাতে হাঁফাতে যেন ছুটে এসেচ। ব'স না দু'দণ্ড। এক গ্লাস জল খাও, একটা পান··" "না রে না, আমার মরবারও ফুরসৎ নেই। আমার কথা কেমন করে বুঝতে পারবি বল। নিজে তো বেশ গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াচ্ছিস, সংসার বলতে একটি মাত্র মেয়ে, নিজে আর উনি। আমার মাথার উপরে একটা পাহাড়। দেওর, ননদ, নন্দাই, যা, বুড়ো শ্বশুর, একরাশ ছেলে মেয়ে, একপাল চাকর চাকরাণী। সকাল থেকে উঠে রাত বারোটা অবধি কেমন করে যে কাটে তা মোটে বুঝতে পারিনে। আচ্ছা, তা দিবি তো একটা পান মোটা করে সেজে দে। দেখিস ভাই আমি জর্দ্দা খাই, এলাচ মশ্‌লা যেন পানে দিয়ে বসিস নে।"

মালতী পান সাজিতে সাজিতে দু'একমিনিট ইতস্তত করে অবশেষে বললে, "কিন্তু ভাই শান্তিদি, ওঁকে বলা হোল না। কাছারী থেকে ফিরে আসবেন—এসে হয়তো ভাববেন। তাই ভাবচি ওদিকে তোমাদের বাড়ী থেকে ফিরতেও বোধ হয় সন্ধ্যে হয়ে যাবে। শীতকালের বেলা···" শান্তিদেবী পান মুখে দিয়া জর্দ্দার কৌটা খুলতে গিয়ে বললেন, "ওমা, সন্ধ্যেতেই আসবি কেমন করে, বিকেলের দিকেই তো ওরা দেখবে। শীতকালের বিকেল মানেই সন্ধ্যে, তখনই তখনই আসবি কেমন করে, সেই একেবারে রাত্রির খাওয়া সেরে আসবি। তোর ভাবনা নেই রে, আমি বলে পাঠিয়েচি ওঁকে, বারলাইব্রেরীতে বিজয় ঠাকুরপোর সঙ্গে দেখা হবে, তাঁকে বলে দেবেন, বৌ আর মেয়েকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়েচি আমাদের বাড়ীতে, রাতের আগে ছাড়া পাবেন না। কোর্ট থেকে সোজা তাঁকেও আমাদের বাড়ীতে আসতে বলে দিয়েচি, সেইখানেই চা জলখাবার খাবেন।"

"এর মধ্যে তুমি সব ব্যবস্থাই করে রেখেচ, আচ্ছা আমি তা'হলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে কাপড়খানা ছেড়ে আসি।"

কাপড় বদলিয়ে মেয়েকেও একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে মোটরে উঠবার সময় শান্তি বললে "আরে দেখ ভাই, 'সাঁঝের তারকা আমি'···সেই গানটা দুএকবার ইলাকে তোর সঙ্গে নিয়ে গাইয়ে দি'স। তোর কাছ থেকেই গানটা শিখেছিল বটে কিন্তু তোর মত গাইতে পারে না। ওরা আবার গানও শুনতে চাইবে, এস্রাজ শুনবে,···আজকালকার ছেলে। সব দিকে দেখে শুনে নেবে। মস্ত বড়লোক—ক'লকাতার একজন নামজাদা বড় ডাক্তার হচ্ছে ঐ বরের বাপ। কাকা মস্ত বড় এটর্ণী, কাকার ছেলেপুলে নেই, ঐ ছেলেটিকেই নিজের ছেলের মত বড় ভালবাসে। পাত্রটিও এটর্ণী পড়চে, ভারনা

"আচ্ছা ব'লব না। তুই খেয়েচিস ইলা ?"

"অনেকক্ষণ। বাপ্ রে, আজকের দিনে বৌদির শাসনের অন্ত নেই। ঠিক সময়ে খাওয়া—ঠিক সময়ে বিশ্রাম, চাই-ই। নইলে যে মুখ শুকিয়ে যাবে। তাঁর জ্বালায় আর পারিনে। এদিকে নিজে ভূতের মত খাটচেন।"

"তা হোক, এ তাঁর আনন্দের খাটুনী।"

* * * *

বিকেলের দিকে যখন গঙ্গার জলের উপর সূর্য্যের সোনালি আলো অজস্র ধারায় উৎসারিত হয়ে পড়েচে, সেই গোধূলি বেলাকার স্বর্ণাভায় কনে দেখানো হ'ল।

ইলাকে মালতী আপন মনের মত করে সাজিয়ে দিয়েচে। ঘন চুলের রাশি খোলা, দুপাশে সোণার ক্লীপ্ দেওয়া। বাঁদিকে একটি প্রীম্ রোজ গোলাপ দু একটি পাতা শুদ্ধ ক্লীপের সঙ্গে আটকান। সোনালি রঙ্গের কাপড় কুঁচিয়ে সুন্দর করে পরান। সে কাপড়ের রঙ্গ যেন পৃথিবীর উপরকার অবসন্ন স্বর্ণাভ আলোর সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেছে। গায়ে দু'চারখানি বাছাই করা স্বর্ণালঙ্কার।

মালতীর কল্পনা যেন এই সুসজ্জিতা সুশ্রী মেয়েটির পিছু পিছু সভাস্থলে গেছে, কোন প্রিয় মুগ্ধ হৃদয়ের দৃষ্টিপাতে এই কিশোরী আরও লজ্জারুণ হয়ে উঠ্‌চে, এ যেন সে মনশ্চক্ষে দেখতেই পাচ্ছে।

ফিরে আসতে অনেকখানি রাত হয়ে গেল। আকাশে তখন শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্না উঠেচে। শান্তি মালতীদের গাড়ীতে তুলে দিতে যেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে মালতীর হাত চেপে ধরে বললে "তোর পয় আছে রে, তুই না এলে আমি কি আর অমনই করে সাজাতে পারতুম—না অত সব আমার আসত। ওদের মেয়ে খুব পছন্দ হয়েচে ভাই। তোরই হাতের গুণ। যাক আমার একটা দুশ্চিন্তা কেটে গেল।"

মালতীর স্বামীও বিকেলে কোর্ট থেকে ফিরে এসে অবধি এতক্ষণ ওখানেই ছিলেন। বিজয়কুমার বললেন "আজকের সন্ধ্যেটা বাস্তবিক চমৎকার কাটল! শ্রীশবাবুরা কী চমৎকার লোক!" তারপরে একটা নিশ্বাস ফেললেন। মোটরটা তখন জনবিরল তরুচ্ছায়াঘন নদীপার্শ্বের পথ দিয়ে ছুটছিল।

মালতী প্রশ্ন করলে "কী ভাবচ ?"

"ভাবচি আমাদেরই পুরাণ দিনের কথা। ঐ যে ছেলেটি দেখতে এসেছিল, তাঁর চোখে স্বপ্নের ছায়া, ঐ ছায়া একদিন আমার আর তোমার জীবনেও নেমেছিল। সে রোমান্সের আভা কতদিন ফুরিয়ে গেচে।"

মালতী একটুখানি হেসে বললে "দেখ, আমিও ঠিক ঐ কথাই কিছুক্ষণ আগে ভাবছিলুম। প্রথমটায় মনটায় একটু দুঃখ হয়েছিল। কিন্তু তারপরে হঠাৎ মনে হ'ল, সে স্বপ্ন, সে রোমান্স কি ফুরোবার ? ঐ মেয়েটি আর ঐ ছেলেটির জীবনে যা ফুটে উঠেচে, সে তো সেই একই উৎস থেকে বইচে। ওদের ভিতর দিয়ে নিজেদের জীবনকে যেন নূতন করে আবার আস্বাদ করলুম।"

"অনেকটা তাই।"—বিজয়কুমার স্ত্রীর একখানি হাত নিজের হাতে নিয়ে ব'ললেন "অনেকটা তাই—সেই জন্যেই আজ সারা সন্ধ্যাটা এমন চমৎকার কাটল। মনে হচ্চে অনেক দিন পরে যেন একটা হারানো জিনিষ খুঁজে পেয়েচি। তুমি কি আমাকে ক্ষমা করবে না মালতী সেই আগেকার দিনের মত, তেমনি সম্পূর্ণ তেমনি নিবিড় করে আমাকে তোমার জীবনে আবার ফিরিয়ে নেবে না? আজকাল কত তুচ্ছ কারণে—কত অকারণে তোমার মনে কষ্ট দিই। সকাল বেলাকার ব্যাপারটা মনে করে অবধি দুঃখে অনুতাপে আমার বুক ফাটচে।"

মালতী কোন উত্তর না দিয়ে স্বামীর হাতের বন্ধনের মধ্যে নিবিড়ভাবে নিজের হাতখানি সমর্পণ করে জ্যোৎস্নাময় রাত্রির দিকে চেয়ে রইল।

সুধীরা গাড়ীর গদীতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল। বাড়ীতে পৌঁছে মালতী মেয়েকে কোলে নিয়ে সন্তর্পণে যখন বিছানায় শুইয়ে দিচ্চে, তখন পাশের বাড়ীওয়ালার বাড়ীতে কে রেকর্ডে একখানি গান দিয়েছিল,

"তোমায় নূতন করে পাবো বলে
হারাই অনুক্ষণ.....
ওগো আমার ভালবাসার ধন।"

সুধীরাকে সযত্নে শুইয়ে দিয়ে খাটের বাজু ধরে মালতী তৃপ্ত মনে খানিকক্ষণ গানখানি শুনলে। তারপরে গান যখন থেমে গেল তখনও সেই গানের রেশ তার মনে প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগল।

নাপোলী ও পম্পিয়াই

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রোমা থেকে নেপ্‌লস বা নাপোলী রওনা হোলাম। নাপোলী ইতালীর অন্যতম বড় বন্দর, এর কাছেই বিখ্যাত পম্পিয়াই সহরের ধ্বংসাবশেষ।

ষ্টেসন থেকে বেরিয়ে সামনেই টারমিনাস হোটেলে আড্ডা নিলাম। নাপোলীর রাস্তায় বেরুলাম—সহর দেখবো বোলে। মনে হোলো কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বুঝি কোন্ যাদুমন্ত্রের মায়ায় সহসা ইউরোপ থেকে মিশর বা ভারতের কোনো মাঝারি সহরে এসে পড়েছি। হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, লাক্সেমবুর্গ প্রভৃতি ছোট দেশের ছোট সহরের সঙ্গেও এর তুলনা হয় না। আয়তনে ও লোকসংখ্যায় হয়ত নাপোলী অনেক সহরের চেয়ে বড়, কিন্তু সহুরে আবহাওয়ায় ঢের নীচে। রাস্তাগুলো অধিকাংশই পিচ দেওয়া নয়—পাথর বাঁধান; তার ওপর দিয়ে প্রচণ্ড শব্দে ছুটেছে ঘোড়া ও খচ্চরবাহী বিভিন্ন যানের লোহার হাল-বাঁধান চাকা; মোটর কদাচিৎ দু'একটা চলেছে; ভারবাহী গাধা খচ্চরই রাস্তায় বেশী। রাস্তাগুলো ধূলোয় পরিপূর্ণ—একটু জোর হাওয়া দিলেই চোখ মাথা ধূলোয় ভর্ত্তি হোয়ে যায়। রাস্তার ধারে, লোকের বাড়ীর দরজার পাশে আবর্জ্জনার স্তূপ জমা হোয়ে আছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ঔজ্জ্বল্য সুহরের বুকে কোথাও নাই। অধিবাসীরাও ঠিক তেমনি নোংরা—তারাই ত সহরের রূপসজ্জাকর। সকলেই চলেছে ঢিলেঢালা, ময়লা, ছেঁড়া কাপড়জামা

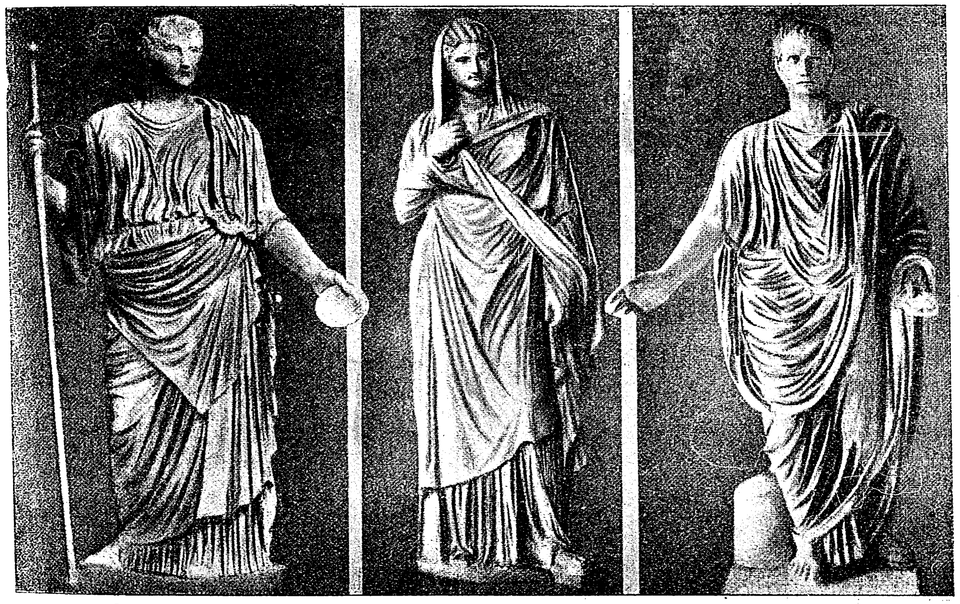

মল্লযোদ্ধা নাপোলী যাদুঘরের দু'টী ব্রোঞ্জ-মূর্ত্তি

পরে, শরীরেরও সর্ব্বত্র নোংরাময় চিহ্ন জাজ্বল্যমান। রাস্তার ধারের বাড়ীগুলোও তেমনি বিশ্রী বেখাপ্পা। কোনোটী হয়ত শতবর্ষের জীর্ণতা বুকে নিয়ে কঙ্কালগুলি প্রকাশ কোরে দাঁড়িয়ে আছে, আবার ঠিক পাশেই একটী রঙচঙে বাড়ী—যৌবনের প্রাচুর্য্যে টলমল করছে। কোনো বাড়ীটার চেহারা তার পাশেরটী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা অপারগতার জন্য হয়ত এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে, কিন্তু এতে সহরের সমষ্টিগত সৌন্দর্য্য ব্যাহত ও ক্ষুণ্ণ হোয়েছে। কোনো কোনো বাড়ীর বারান্দা ও জানালা থেকে কাপড় জামা উড়ছে; বলা বাহুল্য শুকোচ্ছে—এ দৃশ্য

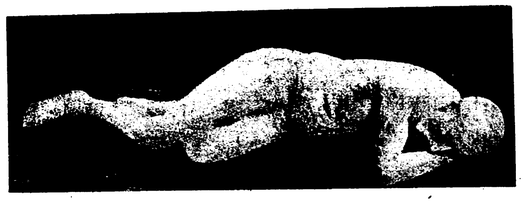

বিষাক্ত বাষ্পে ও ছাই-এ শ্বাসরুদ্ধ হতভাগ্য—প্রায় ১৮৫০ বছর আগে যে হতভাগ্যের দেহ ভস্মস্তূপের মধ্যে চাপা পড়ে ধীরে ধীরে ধূলোয় মিশিয়ে গেছে, তারই একটি মৃণ্ময় প্রতিমূর্ত্তি ভস্মস্তূপের মধ্যে যে অংশ ফাঁকা ছিল তারই মধ্যে মাটী ঢেলে এই ছাঁচ উঠেছে

ইওরোপের আর কোনো সহরে মিলবে না; এশিয়ার ও আফ্রিকার সহরে শুধু এ দৃশ্য দেখা যায়। রাস্তার দুধারে প্রকাণ্ড কাঁচ দেওয়া 'শো-কেস' নাই, ছিমছাম পোষাক-পরা দোকানী নাই—এখানকার অধিবাসীদের রুচি অনুযায়ীই দোকানপাট গড়ে উঠেছে। বাড়ীর নীচের তলাগুলিতে রাস্তার ধারের জানালায় বা দরজার ধারে বসে স্বর্ণকার সামনে আগুনের চুল্লী রেখে কাজ করছে, ঠুকঠাক হাতুড়ী পিটছে। কোনো বাড়ীতে ছুতার মিস্ত্রী সশব্দে করাত দিয়ে কাঠ চিরছে; কোথাও মুদী চারদিকে সাজান বস্তার থাকের মধ্যে বসে দাঁড়িপাল্লায় জিনিষ ওজন করছে। কোথাও দোতলার জানালা থেকে দড়ি বেঁধে গৃহিণী একটী ভাঁড় রাস্তার ধারে ফুটপাথে নামিয়ে দিয়েছে—সেখানে ছাগীপালক সেই ভাঁড়ে দুধ দুয়ে দিচ্ছে; এসব দৃশ্যও ইওরোপের আর কোনো সহরে দুর্লভ। বড় রাস্তার ধারের বাড়ীগুলো অন্য সহরে সাজান দোকান বা অফিস অথবা বাসগৃহ হিসাবেই ব্যবহৃত হয়; কাঠ চেরা বা সোণারূপার কাজ সেখানে সাধারণের দৃষ্টির অন্তরালে কারখানায় হয়; প্রকাণ্ড রাস্তার সামনে হয় না। রাস্তার ধারে ফুটপাথেই বসে কেউ কমলালেবু—কেউ বা অন্য কিছু বেচছে—যা অন্যত্র বে-আইনী। আমার মনে আছে প্যারীতে একদিন ফুটপাথের ওপর দুটী কাগজের পুতুল সরু অদৃশ্য সুতোর সাহায্যে নাচিয়ে একটী পুরুষ ও একটী নারী দর্শকদের বেশ ভিড় জমিয়ে ফেলেছিল। দর্শকদের কাছ থেকে পয়সা চাইতে আরম্ভ করেছে, এমন সময় নারীটি অস্ফুটকণ্ঠে বোল্লে "পোলিস"। ব্যস—ক্ষিপ্রগতিতে পুতুল দুটি পকেটস্থ করে মুহূর্ত্তের মধ্যে তারা ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হোয়ে গ্যালো। ফুটপাথে জিনিষ বিক্রী করা কোলকাতাতেও বে-আইনী; তবে গোলাকার চাকতির অপরিসীম মহিমায় আইন এখানে স্তব্ধ মূক; নইলে এখানে রাস্তার ধারে জিনিষ বিক্রী করে কত লোক যে পায়ে চলা পথিকদের অসুবিধা ঘটায়—তা ত আইন রক্ষকরা—ছোট কনেষ্টবল থেকে বড় হুজুর পর্য্যন্ত সকলেই দেখতে পান; তবু এখানে ত আইন চলে না! নাপোলীর রাস্তাগুলিতে ভিড়ও বেশ কম। লোকেরা চলেছে অলস স্বচ্ছন্দ গতিতে—সহরটা দেখেই মনে হয় এখানকার সময়ের গতি ইওরোপের অন্য দেশের চেয়ে মন্থর। এখানকার অধিবাসী সংখ্যা ৭,৭২,০০০ জন, আর মিলানোর ৭,২২,০০০ জন; অথচ মিলানো সহর হিসাবে শ্রেষ্ঠতর।

ভাবমগ্ন কবি—স্যাফো (Sappho) পম্পিয়াইএ প্রাপ্ত একটি মহিলা কবির রঙ্গীন চিত্র

একদিন এখানকার 'ন্যাশনাল মিউজিয়ামে' গেলাম। যাদুঘরটীর অনেক প্রদর্শক দরজার কাছেই পাওয়া যায়।

তারা এখানকার সরকারী 'রেট' একটি ছাপা কাগজে দেখালে; এক ঘণ্টার জন্য প্রদর্শকদের পারিশ্রমিক ২৫ লিয়ার। এখানকার অধিবাসীদের সম্বন্ধে আমার বেশ উঁচু ধারণা না হওয়ায় আমি ভরসা করে দাম দর করলাম। দেখলাম আমার অনুমান অমূলক নয়। শেষে একজন ১০ লিয়ারে রাজী হোলো।

যাদুঘরটির অধিকাংশ দ্রষ্টব্যই পম্পিয়াই ও হারকিউলেনিয়ায় (Harculaneum) থেকে সংগৃহীত—দুটি সহরই প্রায় দুহাজার বছর আগে (৭৯ খৃঃ অব্দে) ভিসুভিয়াসের ভীষণ রোষে ধ্বংস হয়। পম্পিয়াই ছাই চাপা পড়ে, কিন্তু হারকিউলেনিয়াম গলিত লাভা প্রবাহে (lava—আগ্নেয়-গিরি থেকে উৎসারিত গলিত ধাতব পদার্থ) ধ্বংস হয়। পম্পিয়াইএর খনন কার্য্য তাই সহজতর—ছাই চাপা পড়ায় এখানকার বহু জিনিষ অটুট অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে; ধাতব পদার্থগুলি অনেকদিন ছাই চাপা থাকায় শুধু সবুজ হোয়েছে; কিন্তু হারকিউলেনিয়ামের খনন কার্য্য অত্যন্ত কঠিন হোয়ে উঠেছে। কঠিন লাভা প্রবাহের গর্ত্ত থেকে একে উদ্ধার করা খুব শক্ত, তাছাড়া খনন করলেও বহুদিনের জমাট বাঁধা কঠিন লাভার অঙ্কমুক্ত করে কোনো জিনিষকে অটুটভাবে উদ্ধার করা আরো দুঃসাধ্য। তবু অনেক জিনিষ এখান থেকেও পাওয়া গিয়াছে—এখানকার সমস্ত ধাতব জিনিষ জ্বলন্ত লাভায় পুড়ে কাল হোয়ে গ্যাছে।

যাদুঘরে ঢুকে বাঁদিকের ঘরটি থেকে দেখতে সুরু করলাম। হারকিউলেনিয়ামে প্রাপ্ত মর্ম্মর মূর্ত্তিগুলি এই কক্ষে সাজান আছে। এর দরজার দুধারে দুটি প্রকাণ্ড মার্ব্বেলের স্তম্ভ আছে, তাদের তলার অংশ দামী আলাবাস্তার পাথরের—এ দুটি হারকিউলেনিয়ামে প্রাপ্ত। মূর্ত্তিগুলির অনেকের নীচেই শিল্পীদের স্বহস্তখোদিত নাম ও শিল্পপরিচয় এখনও আছে। এই কক্ষের অধিকাংশই তৎকালীন রাজা, পুরোহিত ও রাজপরিবারের আত্মীয় বন্ধুর প্রতিমূর্ত্তি। এর পরে একটী লম্বা 'হলে' ঢুকলাম; এখানকার মর্ম্মর মূর্ত্তিগুলি অধিকাংশই রোমা ও নিকটবর্ত্তী স্থান থেকে সংগৃহীত। তারপর একে একে অনেকগুলি কক্ষই দেখলাম। যাদুঘরটির মোট কক্ষ ২৪টি—তার মধ্যে কয়েকটি বেশ মনে আছে। একটি কক্ষের নামকরণ হয়েছে 'আইসিস কক্ষ' (Room of Isis)। পম্পিয়াই-এ আইসিস মন্দিরে প্রাপ্ত সব জিনিষ এখানে সাজান আছে। আইসিস দেবতা মিশরবাসীদের, কাজেই এই মন্দিরের

"ভেতির গৃহের" একটী কক্ষের দেওয়াল—দেওয়ালের চিত্র ও সজ্জা লক্ষ্য ক'রবার

সমস্ত উপকরণই মিশরীয় ভঙ্গীতে নির্ম্মিত। বহু মিশরবাসী ব্যবসাসূত্রে পম্পিয়াই সহরে থাকতো—বোধহয় এ মন্দিরের উপাসক ছিল তারাই। এই মন্দিরের যে সব দেওয়াল-চিত্র পাওয়া গিয়েছে সেগুলো সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আর তিনটি ঘরে পম্পিয়াই-এ প্রাপ্ত বহু দেবপ্রতিমা, বাগান সাজাবার মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রভৃতি অনেকগুলি দ্রব্য সাজান আছে। আমার মনে হলো সমগ্র যাদুঘরের মধ্যে এই তিনটী ঘরই বোধহয় সবচেয়ে বেশী সমৃদ্ধ; কয়েকটি মূর্ত্তি এত

চমৎকার যে না দেখলে ভাষায় সে সৌন্দর্য্য বোঝান যায় না। মনের ভাষা মূর্ত্তিগুলির চোখে মুখে যেন স্পষ্ট রূপ নিয়েছে—মনে হয় বুঝি ওরা প্রায় দু হাজার বছর আগের কাহিনী বলবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে রয়েছে—ওদের মুখে চোখে মনের বাণী মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে—হয়ত দরদী শ্রোতার অভাবেই ওরা কথা কইছে না। কতকগুলি মূর্ত্তির চুল, চোখ, ঠোঁট প্রভৃতি রঙ্গীন জায়গার রঙ্গ এখনও এত উজ্জ্বল ও স্বাভাবিক আছে—মনে হয় এইমাত্র বুঝি শিল্পী রঙ্গ দেওয়া শেষ কোরে তুলি নামিয়ে রেখে কোথাও গ্যাছে। মূর্ত্তিগুলির চোখ বোধ হয় কোনো কাঁচ বা

বংশীবাদক—পম্পিয়াইএ প্রাপ্ত চিত্র

উজ্জ্বল দামী পাথরের—ভ্রম হয় এখুনি বুঝি পলক পড়বে; এত সুন্দর ও স্বাভাবিক। একটি ঘরে চুয়ান্নটি মূর্ত্তি আছে; সবগুলি একটি বাড়ীতে পাওয়া গিয়েছিল। এই সব অপূর্ব্ব মূর্ত্তি-শিল্প দেখার পর আবার মনে হোলো, এই দীর্ঘ ১৮৫৬ বছরে সূক্ষ্ম কলাশিল্প-জগতে মানুষ শ্রেষ্ঠতর কোনো সম্পদ দান কোরতে পেরেছে কি? আর একটি 'হলের' দুধারে গ্রীস ও ইতালীর খ্যাতনামা দার্শনিক, কবি, ঐতিহাসিক, নাট্যকারদের আবক্ষ প্রস্তর প্রতিমূর্ত্তি রয়েছে। পম্পিয়াই গ্রীকদের স্থাপিত সহর, কাজেই গ্রীসীয় পণ্ডিতদের প্রভাব এখানে সুস্পষ্ট। ওপর তলায় গেলাম পম্পিয়াই-এ প্রাপ্ত ছবিগুলি দেখবার জন্য।

বহু পুরাণো হওয়ায় ও প্রকৃতির রুদ্ররোষে ছবিগুলির ঔজ্জ্বল্য ও সূক্ষ্ম কারুকার্য্য (details) নষ্ট হোয়েছে। কয়েকটি ছবি এখনও এমন সুন্দর আছে যে দেখলে মনেই হয় না—সেগুলি দু হাজার বছর—বা তারও আগের আঁকা। অধিকাংশ ছবিই গ্রীক পুরাণোল্লিখিত ঘটনাবলী অবলম্বনে আঁকা। তবে শুধু ঘর সাজাবার জন্যই অনেক ছবি আছে—যার পেছনে কোনো ঘটনা নেই—যেমন থ্রি গ্রেসেস (Three Graces—তিনটি যুবতী); পরীর ছবি ইত্যাদি। সব ছবিরই গতি (tendency) নগ্নতার দিকে, পুরাণোল্লিখিত ছবির মধ্যেও বীরত্ব বা শক্তিব্যঞ্জক কোনো ঘটনা চিত্রিত নাই, সবই নগ্নতা ও রমণীর সৌন্দর্য্য প্রকাশের জন্য—অনেকগুলি রীতিমত অশ্লীল। এই ছবিগুলি ও পম্পিয়াইএর কয়েকটি রাস্তা এবং বাড়ী দু হাজার বছর আগেকার ইতালীর সহুরে অধিবাসীদের মনোবৃত্তি ও বিলাসিতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। কয়েকটি মার্ব্বেলের ওপর অনেকগুলি ছবি আছে, তার মধ্যে দুটি বেশ ভাল আছে, বাকীগুলি অস্পষ্ট হোয়ে গিয়েছে। এই চিত্রগৃহের দ্বারে কয়েকজন চিত্রকর ছবিগুলির প্রতিরূপ এঁকে বিক্রী কোরছে। অনেকে ঘরের মধ্যেই রং তুলি নিয়ে ছবি আঁকছে। ছবিগুলি আসল ছবির কাছাকাছি বটে তবে সে যেন বৃদ্ধার যৌবনের রূপ। বয়স্থ জীর্ণ চিত্রগুলির অনুকরণে আধুনিক শিল্পীরা উজ্জ্বল রঙ্গে ছবিগুলি এঁকে সদ্য সদ্য বিক্রী কোরছে—এর ফলে অস্পষ্ট ঔজ্জ্বল্যহীন পরী বা ভেনাসের চিত্র বিলাতী নগ্নচিত্রে রূপান্তরিত হোয়ে উঠছে। এই শিল্পীদের সঙ্গে বেশ দাম দর করা চলে। আমি একটি 'মহিলা কবির' (গ্রীসের Sappho) চিত্র কিনেছিলাম—৫০ লিয়ার দাম চেয়ে শেষে ২৫ লিয়ারে দিলে। ছবির ঘর যতদূর মনে পড়ছে চারটি—এ ছাড়া মোজায়েক দ্রষ্টব্যের কয়েকটি ঘর আছে। এখানকার গ্রন্থাগারটি বেশ বড়। নাপোলী সহরের কোনো কেন্দ্র নাই অর্থাৎ কোলকাতার ডালহৌসি স্কোয়ার বা লণ্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ারকে যেমন সহরের বাণিজ্যকেন্দ্র এবং এবং কোলকাতার শ্যামবাজার অঞ্চল ও চৌরঙ্গী এবং লণ্ডনের ওয়েষ্ট-এণ্ডকে প্রমোদকেন্দ্র বলা যেতে পারে,

নাপোলীর তেমন কিছু নাই। গোটা সহরে দ্রষ্টব্যের মধ্যে আছে একটা রাজপ্রাসাদ ও তার সামনের আটটি রাজ-প্রতিমূর্ত্তি। বিভিন্ন সময়ে যে সব বিভিন্ন দেশের রাজা নাপোলী অধিকার করেছেন, তাদেরই প্রতিমূর্ত্তি।

পম্পিয়াই যাবার জন্য কোনো গাইড পাওয়া যাবে কিনা হোটেলে জিজ্ঞাসা কোরলাম। তারা বোল্লে পম্পিয়াই ও ভিসুভিয়াস দেখান, ট্রেণ ভাড়া এবং মধ্যাহ্ন-ভোজন সব শুদ্ধ ১১০ লিয়ার নেবে। হোটেলের বাইরে এসে দাঁড়াতেই একজন লোক এসে জিজ্ঞাসা কোরলে—"পম্পিয়াই দেখতে যাবেন? আমি আফিসিয়াল গাইড।" জিজ্ঞাসা কোরলাম "দেখানো, ট্রেণ ভাড়া ও খাওয়া শুদ্ধ কত নেবে?" সে একটা কাগজ বের কোরে বোল্লে "১১০ লিয়ার, এই দেখুন অফিসিয়াল রেট।"

পম্পিয়াই অধিবাসীদের অঙ্গ সজ্জা ও সুন্দরীদের কেশ বিন্যাস—
"নেপলস" যাদুঘরে রক্ষিত মর্ম্মর-মূর্ত্তি

'রেট' যখন এক, তখন বাইরের অজানা লোকের সঙ্গে না গিয়ে হোটেলের লোকের সঙ্গে যাওয়াই সঙ্গত মনে হোলো—কাজেই তাকে বিদায় দিলাম। সে চলে যেতেই আর একজন এসে জিজ্ঞাসা কোরলে "পম্পিয়াই ভিসুভিয়াস দেখতে যাবেন?" বল্লাম "১০০ লিয়ারে রাজী থাক ত কথা কও।" সে রাজী হোয়ে গ্যালো—সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেশনে গিয়ে বেলা প্রায় ৯৷৷০ টায় ইলেকট্রিক ট্রেণে চড়ে বসলাম। সহর ছেড়ে ট্রেণ হু হু শব্দে মাঠের মধ্যে দিয়ে ছুটলো। লাইনের দুধারে সমতল কৃষিক্ষেত্র, কোথাও কমলালেবুর বাগান—গাছগুলো লাল হলদে কমলালেবুতে ঝুলে পড়ছে—কোথাও একটানা দ্রাক্ষাক্ষেত্র। শীতের প্রকোপে পাতাগুলো ঝ'রে গ্যাছে—শুকনো লতাগুলো পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে নির্জ্জীব হোয়ে পড়ে আছে—বিয়োগবিধুরা শোকক্লান্তা সদ্য-বিধবার মত। রাস্তার ধারে ছোট ছোট গ্রাম, বাড়ীগুলি পাথরের এবং সেকেলে—কোথাও দু'চারটে আধুনিক বাড়ী কদাচিৎ চোখে পোড়ল—তাও সেগুলি কংক্রিটের বা অতি আধুনিক ভঙ্গীতে নির্ম্মিত নয়। ইতালীর আবহাওয়া, কুয়াসামুক্ত দিগন্ত, মেঘহীন স্বচ্ছ নীলাকাশ, প্রচুর অবারিত রৌদ্র, বিলাসবর্জ্জিত দরিদ্র কৃষক, মাঠের গ্রীষ্ম প্রধানদেশ সুলভ গাছপালা, পাড়াগাঁয়ের ঘর বাড়ী ইত্যাদি অনেক কিছু দেখে ভারতবর্ষকে মনে পড়ে, খুব বেশী মনে পড়ে।

পম্পিয়াই রেলষ্টেশন পম্পিয়াই সহরের ধ্বংসাবশেষের গায়েই। সহরে প্রবেশের কোনো দক্ষিণা নাই—তবে নাম ধাম লিখে দিতে হয় ও পাসপোর্ট দেখাতে হলো।

পম্পিয়াই দু একটি বাড়ীর ধ্বংসস্তূপ নয়—একটি সমগ্র সহরকে মাটীর বুক থেকে উদ্ধার করা হোয়েছে। সহরের চারধারের দেওয়াল, প্রধান ফটক, রাস্তা, বাড়ী ঘর, দোকান-পাট, স্নানাগার, বিচারালয়, মন্দির, বেশ্যাগৃহ, ওষুধের দোকান সব কিছু প্রায় সতরশ বছর পর মাটীর অন্ধকার থেকে দিনের আলোয় আত্মপ্রকাশ করেছে। (প্রথম খনন কার্য্য আরম্ভ হয় ১৭৫৫ খৃঃ অব্দে)।

পুরাণো সহরের রাস্তাঘাট বা ফটকের আসল নাম এখন আর জানবার উপায় নাই—তাই এখন এগুলির নূতন নামকরণ হোয়েছে। যে ফটকটি থেকে যে মুখো রাস্তা গিয়েছে সেই জায়গার নামানুসারে এখন সেই ফটকের নামকরণ হয়েছে। যে রাস্তার ওপর কোনো উল্লেখযোগ্য

বাড়ী বা মন্দির পাওয়া গিয়াছে সে রাস্তার সেই অনুসারে নামকরণ হয়েছে। সহরটির পাঁচটি ফটক আবিষ্কৃত হোয়েছে; প্রত্নতাত্ত্বিকদের বিশ্বাস আরো ২টি ছিলো। আমরা ষ্টেশনের ফটক দিয়ে সহরে ঢুকলাম। ফটকগুলির দুপাশে দুটি গম্বুজ এখানকার বিশেষত্ব। প্রধান রাস্তা পাথর বাঁধান—দুহাজার বছর আগে যে সব যানবাহন এখানে চলাচল কোরতো তাদের চাকার নির্ম্মম ঘর্ষণে যে গভীর ক্ষতচিহ্ন এই রাস্তার পাষাণ বুকে অঙ্কিত হোয়েছে, দ্বিসহস্র বৎসর পরেও আজ তা এতটুকু ম্লান হয় নি—আজও তা যেমন গভীর তেমনি সুস্পষ্ট। রাস্তার দুধারে বেশ প্রশস্ত পায়ে চলার পথ (foot path) তারপর দোকানের

পম্পিয়াই-এর একটি দেওয়াল চিত্র—পম্পিয়াই-এর অধিকাংশ দেওয়ালই পৌরাণিক ঘটনাবলীর চিত্র শোভিত ছিল। এটিও একটি পৌরাণিক ঘটনার চিত্র। "বিয়োগান্ত কবির গৃহে (Tragic Poet) এটি আছে

সারি। রাস্তার ধারের ঘরগুলি যে দোকান ছিল, তা এদের প্রশস্ত খোলা সম্মুখাংশ থেকে এবং তার মাঝে কাঠের দরজা পরাবার সুস্পষ্ট খাঁজগুলি থেকে নিঃসন্দেহে বোঝা যায়। শুধু যে দোকান ছিল তাই বোঝা যায় না, কিসের দোকান ছিল তাও বলা শক্ত নয়। মদের দোকানের সামনে টেবিলের মত উঁচু বাঁধান জায়গা আছে—তার ওপর অধিকাংশ দোকানেই মার্ব্বেল দেওয়া। মদের প্রকাণ্ড হাঁড়িগুলো এখনো মাটীতে পোতা আছে, শুধু মুখটি তাদের মাটীর ওপর। 'রেষ্টুর‍্যাণ্ট'গুলির বসবার জায়গা, উনুন, জিনিষ রাখবারতাক ইত্যাদি থেকে নিঃসংশয়ে বোঝা যায় যে সেগুলি 'রেষ্টুর‍্যাণ্ট' ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। কোথাও কোনো বাড়ীর দেওয়ালে সাপ আঁকা আছে, কোথাও ফুটপাথের ওপরেই সাপ আঁকা আছে—এগুলি ওষুধের দোকানের চিহ্ন—ফুটপাথের যে দিকে সাপের মাথা আছে তার সামনের দোকানটিই ওষুধের দোকান। ওষুধের দোকানের এমনি বিশেষ চিহ্ন এখনও ইওরোপের কোথাও কোথাও আছে। জার্ম্মানীর বার্লিন সহরে এখনও 'চুলকাটা সেলুনের' সামনে একটা পেতলের থালা ঝোলান থাকে। রাস্তার ধারে পথচারীদের পানের জন্য জলের ফোয়ারা বা জলের কল ছিল। সবাই একটি বিশেষ জায়গায় হাত দিয়ে জল পান কোরতো—বহুবর্ষ ধরে এমনি হাতের ঘর্ষণে পাষাণের বুকে এই সব তৃষ্ণার্ত্তদের হাতের দাগ স্পষ্ট হোয়ে আছে—ক্ষয়ের মাঝেই তাদের স্মৃতি অক্ষয় হোয়ে আছে। রাস্তার মাঝে মাঝে দুটি কোরে পাথর দেওয়া—একদিক থেকে অন্যদিকে রাস্তা পারাপারের সময় এগুলির ওপর দিয়ে লোকে যাওয়া আসা কোরতো—কারণ সহরের জল নিকাশের প্রধান রাস্তা ছিল নাকি এই রাস্তাগুলি—তাই জলে পা না দিয়ে এই পাথরের ওপর দিয়ে যাওয়া আসার ব্যবস্থা ছিল।

কোথাও রাস্তার ধারে দেওয়ালের গায়ে লিঙ্গচিহ্ন আঁকা বা খোদা আছে—এগুলি বেশ্যা বাড়ীর স্থান নির্দ্দেশক। যে রাস্তায় ঐ চিহ্ন আছে, সেই রাস্তার সব বাড়ীই বেশ্যালয় নয়। সেই রাস্তায় আবার যে সব বাড়ীর দেওয়ালে বা দরজায় ঐ চিহ্ন আছে সেইগুলিই বেশ্যাগৃহ। কোথাও দেওয়ালের বদলে রাস্তার ওপর পাথরে এই চিহ্ন আছে—বোধহয় এইসব রাস্তায় যানবাহনের চলাচল ছিল না। কোথাও পূর্ব্বের ভাষায় লেখা আছে "রাস্তায় প্রস্রাব করিও না—প্রস্রাবাগারে যাও"—অর্থাৎ সহরে যে পৃথক প্রস্রাবাগারের ব্যবস্থা ছিল এ থেকে তা বোঝা যায়। এ রকম উপদেশ আজ দু-হাজার বছর পরেও সভ্য মানুষকে দিতে হয়। এর চেয়েও হাস্যকর উপদেশ দেখেছিলাম ইংলণ্ডের মিডল্যাণ্ড

প্রদেশের একটী ছোট রেলষ্টেশনের প্রস্রাবাগারে। সেখানে ভিতরে দরজার সামনেই লেখা ছিল "Adjust your dress properly" অর্থাৎ বাইরে যাবার আগে তোমার পোষাকটা ঠিকভাবে সামলে নাও। দু হাজার বছর পরে সুসভ্য ইংরেজ বাচ্ছাকে যদি ঐ উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন থাকে—তবে পম্পিয়াইএর রাস্তায় ঐ উপদেশ মোটেই হাস্যকর নয়। কোথাও কোথাও দেওয়ালের গায়ে এক একটি বিশেষ চিহ্ন আছে—গাইড বোল্লে এগুলি তখনকার মিউনিসিপ্যালিটীর চিহ্ন।

সহরের রাস্তাগুলি বেশ সরল ও সমান্তর—মনে হোলো সহরটি নিজে থেকে আমাদের কাশী বৃন্দাবনের মত গড়ে ওঠে নি, কেউ যেন নিজের পরিকল্পনা মত একে সাজিয়ে তৈরী কোরেছে—যেমন নয়াদিল্লী গড়ে উঠেছে। পূর্ব্বে পম্পিয়াই থেকে সমুদ্র আরো কাছে ছিলো—এটি একটি প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। এর অধিবাসীরা ছিল ঐশ্বর্য্যশালী ও বিলাসী। সমুদ্রের ধারের বন্দর বোলেই বোধহয় এটি ছিল লাম্পট্যের লীলাভূমি—আজও সমুদ্রের তীরবর্ত্তী বড় বন্দরগুলি সাধারণতঃই গণিকাবহুল। এখানকার অধিবাসীদের বাসগৃহের চিত্রাদি থেকে বোঝা যায় তারাও

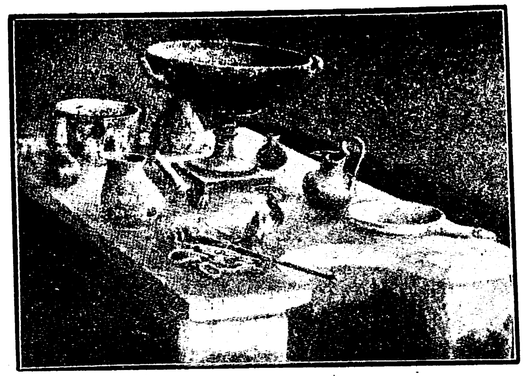

অসমাপ্ত আহার—এই সজ্জিত খাবার টেবিলটি ছাইচাপা অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে

অধিকাংশই ছিল লম্পটশিরোমণি। "হেসে নাও, দুদিন বইত নয়" এই ছিল তাদের জীবনের মূলনীতি।

(আগামী মাসে সমাপ্য)

যুগল

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

(নগুচির 'Myoto' হইতে জাপানী ভাষায় Myoto শব্দের অর্থ যুগল)

যে সুর গুমরি' মরে গোলাপের প্রাণে
সেই সুরে নারী কহে চুপি চুপি কানে
সুরভি বাণীর সম
—'ওগো প্রিয়, প্রিয়তম!'
কহিল পুরুষ প্রণয়-বিভল-হিয়া,
জলধির বুকে ওঠেনি উদ্বেলিয়া
হেন সুগভীর বাণী
—'মোর হৃদয়ের রাণী!'
জোছনার আলো সুকোমল পদভরে
নীরবে যেমন নামে মঞ্জরী 'পরে
তেমনি ঢালিয়া মধু
কহে নারী—'প্রাণ বঁধু!'
কহিল পুরুষ,—উথলিল তারস্বরে
সেই রব, যাহা গিরি শুধু বুকে ধরে,
—কেবল একটি কথা,
—'প্রিয়া', মথি' নীরবতা।
কলনিনাদিনী ঝরণা ধারার পারা
কহে নারী—'আমি তোমা মাঝে হ'ব হারা
তুমি যে সাগর মম,
ওগো প্রিয়, প্রিয়তম!'
গহন অটবী নীলাকাশ পানে চাহি'
তরুমর্ম্মরে যে সুর রে ওঠে গাহি'
সেই সুরে শুধু—'প্রিয়া'
গাহে পুরুষের হিয়া।"

অপত্য-স্নেহ

শ্রীসৌরীন্দ্র মজুমদার

(৪)

গঙ্গাবতী অতি শৈশবে মাতৃহীন হ'য়ে পিতার বড় আদুরে হয়ে পড়েছিল। সংসারে পিতা কন্যা ভিন্ন ওরা অন্য কিছু জানতো না। স্নেহের বাঁধন এত বড়, এত সুন্দর, এত দৃঢ়, এত আকর্ষণীয় ছিল যে এরা নিজের ব্যক্তিত্ব দু'জনের মাঝে পেতো না। এদের চাহিদা, দেনা-পাওনা ছিল মাত্র দু'জনের মাঝে। গঙ্গাবতী জ্ঞান হ'বার পর হ'তে দেখছে শুধু জনককে, তার কোন কিছু মনে উদয় হ'লেই হাতিয়ে বেড়াতো পাবার জন্য, স্নেহময় পিতা মনের ভাব বুঝে সে অভাব পূরণ করে দিতেন। কোনদিন মাতার অভাব সে অনুভব করতো না। বৃদ্ধ জনক ছিল তার সেবায় জননীতুল্য। একজনের মাঝে সে জনক-জননীর বাস্তব মূর্ত্তি পেতো। বৃদ্ধ বহু সন্তান ও স্ত্রীকে হারিয়ে একমাত্র মেয়ে গঙ্গাবতীকে বাঁচিয়ে রাখতে সমর্থ হ'য়ে কতদূর যে আনন্দিত হয়েছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। গঙ্গাবতী ছিল শাপ-ভ্রষ্টা স্বর্গের দেবীর মত। বৃদ্ধ একমুহূর্ত্তের জন্য গঙ্গাবতীকে ছেড়ে থাকতে পারতো না, প্রাণ তার হাঁপিয়ে উঠতো। বৃদ্ধের নিকট যে, সে ছিল স্বর্গের দেবী। তাই সদা ষোড়শোপচারে দেবীর ভোগ দিতো। ছলনা করে বলতো অসুখ হয়েছে, গাটা কেমন করছে, নানা অছিলা করে নিজের খাবার মেয়েকে জোর করে খাওয়াতো। নিজে উপোষ করেও মেয়ের দুধ যোগাতো। বৃদ্ধ মিলে কাজ করে ক্লান্ত হয়েও মেয়েকে হেঁসেলে ঢুকতে দিতো না; পাড়াপড়সীর হাসি, ঠাট্টা, বিদ্রূপ, শাসনেও গঙ্গাবতীকে রান্না করতে দিতো না। অতি আদরযত্ন পেয়ে গঙ্গাবতী বড় জেদী ও দুষ্ট হয়ে পড়েছিল; যে বিষয়ে একবার গোঁ ধরতো—না করে কখনো ক্ষান্ত হতো না। ওর দুরন্তপনায় পাড়াপড়সীরা অতিষ্ঠ হয়েছিল। গঙ্গাবতী ছিল ছেলের বাড়া, ছেলেদের সঙ্গেই ছিল তার গতিবিধি বেশি এবং খেলাধূলা হতো ছেলেদের সঙ্গে। মেয়েদের সঙ্গে তার মিশ খেতো না। এমন দস্যি মেয়ে ছিল—যে সমবয়সী কোন ছেলেমেয়ে তার সঙ্গে কোন বিষয়ে এঁটে উঠতে পারতো না; ঝগড়া বিবাদ লাগিয়ে সব্বাইকে মারধর করতো। বড় বড় ছেলেদের পর্য্যন্ত কিল, থাপ্পড়, কামড় দিয়ে একশেষ করে দিতো। সমবয়সী ছেলেমেয়েদের সে ছিল দলনেতা। সারাদিন খেলাধূলা করা এবং পরের জিনিষ চুরি করা, অপরের ক্ষতি করা ছিল মস্ত বড় কাজ। এ দলটাকে সব্বাই রীতিমত ভয় পেতো। বিশেষতঃ গঙ্গাবতীকে সব্বাই হিসাব করে চলতো, কারণ এরা কোন ফাঁকে কি মহা ক্ষতি করে বসে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। নিত্তি পাড়াপড়সীরা গঙ্গাবতীর নামে নালিস করতো। বৃদ্ধ সর্দ্দার মেয়ের হয়ে সকলের নিকট ক্ষমা চাইত, সামর্থ্য মত ক্ষতিপূরণ করে দিতো।

বৃদ্ধ একমাত্র মেয়েকে পর করতে হবে বলে বিয়ের নাম মুখে আনতো না। কেউ বিয়ের কথা তুললে চুপ করে যেতো, সে কোন্ প্রাণে এতটুকু মেয়েকে পরের হাতে দেবে, ব্যবধানে কি সে বাঁচতে পারে—না গঙ্গাবতী বাঁচবে? বহু লোক গঙ্গাবতীর বিয়ের জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করছিল, বৃদ্ধ কোন দিকেই মত দেয়নি, 'হাঁ' বা 'না'র মাঝে বহু দিন সমস্যাটাকে এড়িয়ে যায়। তার ইচ্ছে ছিল, এই কিন্তুর মধ্য দিয়েই যতদিন পারে চলবে। শেষটায় সমাজের নিন্দা, কটূক্তি, শাসন আরম্ভ হ'য়েছিল, বৃদ্ধ সর্দ্দার তাহাও উপেক্ষা করেছিল অপত্য-স্নেহের দুর্ব্বলতায়, জড়তায়। গঙ্গাবতীও বিয়ের নাম শুনলে ভয়ে জড়সড় হয়ে যেতো, বিবাহিত জীবনের দুঃখ দুর্দ্দশার কাহিনী প্রত্যক্ষ দেখিয়ে বাপের সঙ্গে ভীষণ ঝগড়া করতো। এরকম সুখের, স্বাধীন জীবন ছেড়ে—বিয়ে করে অন্যের দাসী হ'তে চায়নি। গঙ্গাবতী বিয়ে করতে চায় না বলে বৃদ্ধ হ'য়েছিল অত্যন্ত খুশী, যদিও সে মুখে বিয়ের পক্ষে বক্তৃতা দিতো, নিজের বিবাহিত জীবনের সুখের কথা বলে বিয়ের পক্ষে মত করাতে চেষ্টা করতো। গঙ্গাবতী পিতার মনের প্রকৃত প্রতীক দেখতে পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়তো, পিতার বিয়ে দেবার জোর জবরদস্তি নেই, বরঞ্চ খুব

খুশী হন বিয়ে না হলে—বুঝতে পেরে মুক্তির নিশ্বাস নিয়ে উৎফুল্ল হতো।···হঠাৎ কানাই এদের মাঝে এসে একটা আলোড়নের সাড়া জাগায়। সে আলোড়নে বৃদ্ধ ও গঙ্গাবতী দু'জনেই বিচলিত হয়ে পড়েছিল। বৃদ্ধ উঠে পড়ে লেগে যায় কানাইকে ঘর-জামাই করবার জন্য, গঙ্গাবতী কানাই'র স্বভাব চরিত্র, রূপগুণে মুগ্ধ হয়ে অতি শীঘ্র আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। বৃদ্ধ যখন বিয়ের প্রস্তাব তুলে, তখন গঙ্গাবতী মনের মত মানুষ পেয়ে কোন আপত্তি তুলতে পারেনি। শ্বশুর শাশুড়ীর অত্যাচার নেই, স্বামীর ঘর করবার জন্য নিজের বাড়ী ছাড়তে হবেনা, পিতার স্নেহময় কোলটি থেকেই যাবে, বন্ধুদের ত্যাগ করতে হ'বে না, যা কিছু ছিল সবই থাকবে, পাবে মস্ত বড় সম্পদ।

গঙ্গাবতী যদিও নারী—তবু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নারীত্ব বিকাশ পায় নি; পুরুষের মাঝে সর্ব্বদা থাকতো বলে পৌরুষ স্বভাব প্রভাব বিস্তার করেছিল। প্রকৃতির নারী-কাঠামো ভিন্ন নারীর কোন লক্ষণ ছিল না। পাড়ার যুবকরা গঙ্গাবতীকে নির্জ্জনে পেয়ে যখন নারী-দেহ পাবার জন্য প্রলুব্ধ করতো, যৌন ক্ষুধা উত্তেজিত করেও যখন ব্যর্থ হ'তো তখন, জোর করে অধিকার করতে যেতো তার দুর্ব্বল নারীদেহ, গঙ্গাবতী পুরুষের বিসদৃশ ভাব দেখে কেমন হ'য়ে যেতো, সে ভাবতে পারতো না যে তার সঙ্গে এদের এত বিপর্য্যয় কেন? সে যে নারী—তা ভুলে যেতো, পশুপ্রবৃত্তি যুবকদের নিকট সে নিজেকে যুবক বলেই উঁচু করে ধরতো। তার পূর্ণ শৌর্য্যের নিকট কারো ক্ষমতা ছিল না যে তার দেহ কলঙ্কিত করে। কোন যুবক যখন তাকে ফুসলাতে চেষ্টা করতো, বা নির্জ্জনে অত্যাচার করতে চাইতো—গঙ্গাবতী দু'তিনটা মিষ্টি কথার পর দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে এমন ঘুসি বা লাঠির ঘা দিতো—যে কেউ আর তার দিকে ফিরে তাকাতে সাহস পেতো না। গঙ্গাবতী জয়ের অট্টহাসির নিকট মাথা নীচু করে সরে পড়তো। গঙ্গাবতী এমনি ভাবে স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে বড় হচ্ছিল। কোন বিপদে কাবু হতে হয়নি বলে সে নিজের স্বভাব চরিত্রের গতি সংযত করে নি। যতগুলি বিয়ের সম্পর্ক এসেছিল—তার প্রায় সবগুলিই সে নিজে ভেঙ্গে দিয়েছে, যে সব যুবক নিজে বিয়ের প্রস্তাব করেছিল, গঙ্গাবতী ছেলেমানুষের পাগলামি বলে তাদের কথা শ্লেষের স্বরে উড়িয়ে দিয়েছিল; স্বামী হ'বার অনুপযুক্ত বলে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিল; এমন কি অভিভাবকেরা, যারা বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসতেন তাঁদেরও অপমান করে—বকা-বকি করে তাড়িয়ে দিতে কুণ্ঠিত হয়নি। কোন কোন অভি-ভাবককে স্পর্দ্ধাভরে বলেছিল 'কোন লজ্জায় বিয়ের প্রস্তাব করতে সাহস পেলেন! সেদিন আপনার ছেলে আমায় অপমান করেছিল বলে দু ঘুসি মেরেছিলুম। সে ঘুসি খেয়ে জ্বর হয় চার পাঁচ দিন, বিছানা থেকে উঠতে পারেনি। এমন ছেলের মেয়ে হয়ে ঘরের কোণে থাকা উচিত; মাগীমুখো ছেলে—বিয়ে করতে চায় কি লজ্জায়, আমি হলে বিষ খেয়ে মরতুম।···'মেয়েদের সম্মান করতে শিখুক, নিজে মানুষ হোক প্রথম। পাড়ার বউ ঝিদের নষ্ট করে বুঝি সাহস বেড়ে গেছে, আমায় বিয়ে করবার সাহস করে!'···'আপনি এসেছেন এই যা রক্ষা! আপনার ছেলে এলে আর ফিরে যেতে হতো না, খুন করে ফেলতুম। মেয়েরা বুঝি মানুষ নয়? হারামজাদা গর্ভবতী স্ত্রীকে যে সেদিন খুন করলে, আজই চায় আবার বিয়ে করতে। বলবেন—এ আর কেউ নয়, গঙ্গাবতী! চাবকিয়ে দাঁত ভাঙ্গবে—গায়ের চামড়া তুলে ফেলবে।···এ ধরণের নারী হ'য়েও গঙ্গাবতী শেষটায় কানাইর প্রতিভার নিকট মাথা নীচু করে প্রণয় ভিক্ষা করেছিল। স্বভাবদোষে যদিও সে কানাইকে অপমান করতে ছাড়েনি, বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, কিন্তু বিয়ের প্রস্তাবে পূর্ব্বের এক-গুঁয়েমী 'না' বলতে পারেনি—কারণ মন গোপনে অন্তরঙ্গতা করেছিল, মনে বড় ভাল লেগেছিল। নিতান্ত নারী হয়ে জন্মেছে, পিতা বৃদ্ধ হয়েছেন, স্নেহময় পিতার আদেশ—তাই সে যেন বাধ্য হয়ে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিল। যে গঙ্গাবতী চলছিল গঙ্গার মত হিমালয়ের গুহা থেকে প্রলয়বেগে, যার বেগ সহ্য করতে না পেরে ঐরাবত 'প্রিয়ার' স্থানে 'জননী' বলে নিস্তার পায়—তেমনি ভয়ঙ্কর গঙ্গাবতী কি করে আবার গঙ্গার মতই শান্ত হয়। নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে ধরণীকে সুজলা সুফলা করে? যে গঙ্গাবতী বিয়ে হয়ে গেলেও কাউকে তোয়াক্কা করতো না—নিজের প্রাধান্য বজায় রাখতো সর্ব্বদা, সর্ব্বস্থানে, বয়োজ্যেষ্ঠদের পর্য্যন্ত গ্রাহ্য করতো না, সত্যের কোঠায় পা রেখে দশ পাঁচ কথা মুখের ওপর বলে দিতো, সমানে ও ছোটদের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করতো, দস্যি ছেলেদের মত এগার বার বৎসর বয়সেও

মারধর করতো—সে কী মন্ত্রগুণে এমনি নীরব, গম্ভীর হলো? যৌবনের প্রণয়ের আগমন হেতু চঞ্চলতায়, সলজ্জ সজীবতায়, রূপ মাধুরীর সার্থক বিকাশে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো? কি মায়ার পরশে সে খাঁটি, পাকা গৃহিণী হয়ে উঠলো? স্বামী পুত্র কন্যাদের পেট ভরে খাইয়ে যা অবশিষ্ট থাকে—তা খায়, যেদিন অবশিষ্ট না থাকে—সেদিন উপোষ করে। কোন কোন দিন অভাব অনুসারে নিজের খাদ্য ছেলেমেয়েদের জন্য তুলে রাখে। মাতাল স্বামীর অত্যাচারে একটু প্রতিবাদ করে না। মারধর সহ্য ক'রে, প্রাণপণ চেষ্টা করে স্বামীকে রক্ষা করতে।

যে গঙ্গার পতন পৃথিবী সইতে পারতো না, ভেঙ্গে চুরে খান খান হয়ে যেতো, এমনি প্রবল পরাক্রম মারাত্মক ছিল, সেই গঙ্গা যখন মহাদেবের জটাতে এসে আশ্রয় নেয় তখন অতি সহজ সরল শান্ত সুন্দর হয়ে পড়ে। নরনারীর মিলন এমনি মধুর, এমনি সুন্দর, এমনি আশ্চর্য্যজনক ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার! তাই বুঝি নর-নারীর মিলিত গীতে জগৎ স্তব্ধ, মুগ্ধ, হর্ষিত, পুলকশিহরণে মূর্চ্ছিত। জন্ম-দুঃখীর প্রাণে আনন্দ বর্ষিত হয়ে নিস্তব্ধ সজীব হয়, কালা-বোবা অন্ধদেরও অনুভূতিতে অন্তর্দৃষ্টি আসে, মিলনের মধু একভাবেই লাভ করে। যে গঙ্গাবতী গঙ্গার মত ভয়ঙ্কর ছিল, নিয়ম কানুন মানতো না, নিজের জোরে চলতো এবং অপরকে নিজের মতানুযায়ী চালাতো, তার এতবড় পরিবর্ত্তন কি নরনারীর মিলনে? যার অতীত জীবন এমনি ছিল, সে কি করে স্বামীর অত্যাচার, দুঃখ কষ্ট, দারিদ্র্যের কশাঘাত সহ্য করছে, কি করে আদর্শ নারীর মত সংসার করছে? এর কারণ কি—সে নারী? এর কারণ কি—সে মাতৃজগত? এর কারণ কি—তার বিকশিত মাতৃত্ব?

গঙ্গাবতী অদ্ভুত মেয়ে। দিন যত এগিয়ে যায়, ততই যেন সে আরো আশ্চর্য্যময়ী হয়। সে সুন্দরী, অসীম সুন্দর রূপ-যৌবন তার শতমুখে কেবলি বেড়েই চলেছে। এত রূপ, যাকে বলে রূপ যেন চুইয়ে পড়ছে! বয়স তার একুশ, কি বাইশ! হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, লতিকা নয় লতিয়ে লতিয়ে চলে না, মোটা নাদুস নুদুস ঢবঢবেও নয়,—উঁচু, লম্বা চওড়া, দীর্ঘ একবোঝা কাল কেশ আহাঁটুচুম্বিত, মুখখানা গোল—অনেকটা যুক্ত প্রদেশের কুলিরমণীদের একচেটিয়া গোল মুখের মত, হাসলে যেন মুক্তা ঝরে, বিস্তৃত নয়ন, বিদ্যুতের মত চঞ্চল দীপ্তিশিখার লুকোচরির মাধুরিমা সদা-বিরাজিত। এলোকেশে বা এলোমেলো খোঁপায় যখন সে রাস্তায় আপন মনে পবিত্র মূর্ত্তিতে চলে—রাস্তার প্রত্যেকটি লোক তার পানে চেয়ে থাকে, তার উজ্জ্বল গৌরবর্ণের বিচ্ছুরিত আলোক-ছটায় মুগ্ধনেত্রে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে ভাবে, এই রূপরাণী কি নন্দন কানন থেকে মানবী সেজে ধরায় এলো? এতো সুন্দর সে, এতো দীপ্তি তার দেহে, এতো আকর্ষণ তার সৌন্দর্য্যে যে রূপের পুজারীরা নীরবে সৌন্দর্য্যে প্রেমময় অর্ঘ্য নিবেদন করে, কেউ ভাবতে পারে না সে কুলিরমণী; যারা পরিচিত—তারাও ভুলে যায় তার ইতিহাস, তার ভূগোলের স্থান, মনে পড়লেও কষ্ট পায়।...

গঙ্গাবতীকে আর বিশদভাবে বর্ণনা করা যায় না, সে যে বিবাহিতা, সে যে গৃহিণী, সে যে নারীর শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তিতে বিকাশিতা, তার কোলে সন্তানের দল। জননী! সে যে জননী! কিন্তু উপায় নেই—তাই একটু রূপ বর্ণনা করতে হল। প্রৌঢ়, যুবক মহলের লোলুপ দৃষ্টি থেকে একটু বের করে না আনলে যে নিতান্ত চলে না, তাই একটু বের করে আনলুম। এক কথায় সে সুন্দরী—খুব বেশী সুন্দরী, সচরাচর এত সুন্দরী যুবতী নারী মিলেনা, এলেই! হোক না, চারটি সন্তানের জননী—তবুও।

কুলি বস্তির হাওয়াটা যেন একটু উল্টে গেছে, দিন দিন কেবলি পরিবর্ত্তন হচ্ছে। অশিক্ষিত লোকরা প্রেমের ধার-ধারেনা, এ অতি সত্য কথা। এদের প্রেম নেই বলে জেনে এসেচি—সত্যই তো এরা প্রেমের কি বোঝে? দেহ, সেবা, ক্ষমতা এই তো জানে, এ পর্য্যন্তই ত এদের জ্ঞান। দু'টি কবিতা বলতে পারবে—না ভালবাসি কথার বহু রূপরস দিতে পারবে? শিক্ষিত রুচিমার্জ্জিত লোকের প্রেম কবিতার ছন্দে ছন্দে—কিন্তু কুলি মজুরদের তো সাহিত্য নেই, ভাষার ওপর আধিপত্য নেই, পেচিয়ে কথা বলে সৌন্দর্য্যও সৃষ্টি করতে পারেনা, প্রেম ফুটবে কি করে? প্রেমের বিকাশ হবে কি করে—যদি বীজ না পায় স্থান—না পায় খাদ্য! দুর্ব্বলের ব্রহ্মচর্য্য নেই, ধর্ম্মেরও ভয় নেই, সহজ সরল দৈহিক মিলন প্রশ্নের উত্তর 'হাঁ' বা 'না'। অতি সহজ প্রশ্ন, তার উত্তরও অতি সহজ। যাকে সভ্যলোক বলে নগ্নপশু-প্রবৃত্তি। এ অতি নগ্নরূপ—এর আত্ম-গোপনতা নেই উপন্যাসের মাঝে। এখন কুলি মজুরদেরও প্রেমের বহুরূপী

ঢেউ বয়; সভ্যতার কাব্যে—নগ্নরূপ ঢাকা থাকে। তাই গঙ্গাবতীর ভক্তের অভাব নেই, দিন দিন কেবল বেড়েই যাচ্ছে। বহু ভক্ত তার ব্যথার ব্যথী, দরদী, ভাষার মার্জ্জিত মাধুর্য্যে প্রেমের অর্ঘ্য নিবেদন করে। ভক্তের মাঝে প্রাচীন-পন্থী ও নবীনপন্থী দু'দলই আছে। নবীনপন্থীরা গুণ গায়, মেমের সঙ্গে, বড়লোকের সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে, অভিনেত্রীদের সঙ্গে রূপের তুলনা করে—গঙ্গাবতীর রূপের প্রশংসা করে পঞ্চ মুখে, চরণ তলে প্রেমের অর্ঘ্য নিবেদন করে জীবন যৌবন ধন্য করে, নিত্যিকার অত্যাচারেও প্রকৃত প্রেমের বন্যাস্রোত একটু কমে না, হতাশ হয়ে সংযত হয়না; অপরদল কানাইএর মুণ্ডপাত করে, টাকা পয়সার লোভ দেখায়, কোন ভনিতা না করে সোজা দেহটা চেয়ে বসে, হাত বাড়াতে কুণ্ঠিত হয় না, ভয় পায় না।

যারা ভণ্ডের মুখোস পরে প্রেমের অভিনয় করে তাদের গঙ্গাবতী লাঠি, ঝাঁটা নিয়ে তাড়া করে না, চোদ্দ-গোষ্ঠীর নাম নিয়ে গালাগাল করে না এবং যারা কামলালসা প্রকাশ করে—দেহটা ধরবার জন্যে এগিয়ে আসে—তাদের ও না। নবীন বা প্রাচীনপন্থী কাউকে সে বাধা দেয়না, রুদ্র-মূর্ত্তিতে ঝগড়া বিবাদও করে না। তার নিশ্চেষ্টতা, অবজ্ঞা, দৃঢ়তা, পবিত্রতার নিকট কেউ ঘেঁসতে পারে না। আশ্চর্য্য তার নিশ্চেষ্টতা! সে যেন অসীম, অণু পরমাণুর কথা তার কল্পনার বাইরে; কল্পনায় স্থান দিলে বা গ্রাহ্যর মধ্যে আনলে যেন নিজের বৃহত্তরতাকে অপমান করা হয়, খেলো করে দেওয়া হয়। নীরব তার অবজ্ঞা, অথচ কত কঠিন, কত তীক্ষ্ণ, কত ভয়ঙ্কর! পাষণ্ডরা লজ্জায় মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়, যাদের লজ্জা সরমের বালাই নেই—ওরা ভয়ে সরে পড়তে বাধ্য হয়; বিপ্রকর্ষণে যেমন দুই ধাতুকে দূরে নিক্ষেপ করে বা সরিয়ে রাখে—নিকটে ঘেঁসতে দেয় না—ঠিক তেমনি বিপ্রকর্ষণে পাষণ্ডরা নিকটে ঘেঁসতে পারে না। হিমালয়ের মত তার দৃঢ়তা পরখ করতে হয় না, অজ্ঞানতা-বশতঃ যে পরখ করতে যায় সে নিজেই চূর্ণ বিচূর্ণ হয়। সবাইকে তার সৌম্য, উন্নত, প্রশান্ত, ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখেই দূর হ'তে সরে পড়তে হয়। স্বর্গীয় তার পবিত্রতা, ললাটে লেখা নেই, বায়ুর মত অনুভব করা যায়—না যায় দেখা, না যায় ধরা, মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভূত করায়।

গঙ্গাবতীকে নীরব দেখে পাড়ার মেয়েরা হ'ল সন্দিগ্ধা। অল্প অল্প করে কাণাঘুসা চললো, গঙ্গাবতীর চরিত্রের ওপর কুৎসা রটাতে হল যত্নবান। এখানে বলে রাখি—গঙ্গাবতী আঠারো বছর বয়সে শেষ সন্তান প্রসব করে আর গর্ভবতী হয় নি; স্বামীর ভালবাসা হারিয়ে, একরূপ স্বামীপরিত্যক্তা হয়ে ব্রহ্মচারিণীর মত জীবন চালাচ্ছে; তাই ভাল গঠনের দেহ দিন দিন কেবল সুন্দর ও আকর্ষণীয় হচ্ছে। স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য, লাবণ্য, যৌবন-ঐশ্বর্য্য কেবলি সুন্দর হ'তে সুন্দরতর হচ্ছে। গঙ্গাবতীর সৌন্দর্য্য ও ভক্তের প্রশংসাবাদ পাড়াপড়সীর ঈর্ষা ও চক্ষুঃশূল জ্বালার সৃষ্টি করলে। যে স্বামীপরিত্যক্তা, যে খুব গরীব, যার চারটি সন্তান, যে দুঃখিনী—সে দিন দিন কুৎসিত, কদাকার, রুগ্না না হয়ে—কি করে সুন্দর, হৃষ্টপুষ্ট হয়? গঙ্গাবতীর বাড়ীতে লোক যাতায়াত করে, সে যদি সতী হতো তবে কি করে এসব চরিত্রহীন লোকরা এমনি ভাবে ঘোরা-ফেরা করে? কৈ! গঙ্গাবতী ত' কাউকে ঝাঁটা মারে না, অকথ্য গালাগাল করে না, চেঁচামেচি করেনা; উৎপাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য পাড়াপড়সীর নিকট সাহায্যও চায় না? নিশ্চয় সে অসতী, হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি, মিনমিনে সয়তান; সোজা মানুষটি সেজে থাকে—যেন কিছু জানেনা, ওপরে সাধাসিধে, ভাল মানুষের আবরণ—অন্তরালে বীভৎসতা। যে ছেলেবেলায় খুব দুষ্ট ছিল, মন্দা মেয়ে ছিল, যার সঙ্গী ছিল যুবকরা, যার দুরন্তপনায় পাড়ার লোক তটস্থ থাকতো—সে কি করে এমনি শান্ত-শিষ্ট, বোকা মানুষ সাজে? একি ভালর লক্ষণ? বকধার্ম্মিক সেজে মাছকে ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে! পাড়ায় গঙ্গাবতীর নামে খুব কুৎসা রটলো এবং মেয়ে মহলে বেশ আন্দোলন চললো। এদিকে যারা প্রেম করতে গিয়ে মুক অপমান পাচ্ছে, তারা আঁটতে লাগলো সাফল্যমণ্ডিত হ'বার ফন্দি; যারা দেহ চেয়ে ব্যর্থ হয়েছে তারা রটাতে লাগলো দুর্নাম এবং জোর করে অধিকার করবার জন্য করতে লাগলো শক্তিসঞ্চয়। যারা বহুদিন জোর করে অভিলাস পূর্ণ করতে গিয়ে ফিরে এসেছে, তার শৌর্য্যের প্রভাবে বেশী এগুতে পারে নি, তারা আক্রোশে কেবলি জ্বলে মরে। নিজেরা সন্দিগ্ধ হয়ে ঝগড়া করে, প্রতিযোগিতা করে—যেমনি পশুরা মারামারি করে, তেমনি। হায় পশু-প্রবৃত্তি! কতরূপ তোমার!

এ ত' গেল বস্তির উৎপাত। এ উৎপাত খুব কঠিন

ময়, মারাত্মক নয়—কারণ সে স্বাধীন নারী, তার মনের দৃঢ়তা আছে, শক্তি সামর্থ্য আছে, বস্তির হালচাল ভাল করেই জানে, বুঝে। পাড়ার বহু মেয়ে ঝগড়া বাধাবার জন্য, আমোদ করবার জন্য, শুনিয়ে শুনিয়ে মিথ্যা কুৎসা আলোচনা করে, বিশ্রী কথা ব্যাখ্যা করে—গঙ্গাবতী শুনেনি ভাব করে সরে পড়ে, তুচ্ছ কথার প্রতিবাদ করার দুর্ব্বলতা তার নেই, ভিত্তিহীন কথার মূল্য (importance) দিয়ে মিথ্যা ভিত্তির পথ তৈরি করে দিতে চায় না। বাজে বকবার সময় কৈ, একা যুদ্ধ করবেই বা কতজনের সঙ্গে? পাড়ার চরিত্রহীনা নারীদের কুৎসা স্পষ্ট মুখের ওপর চলে—কিন্তু ঝগড়া করবার মত ছোট মন তার নেই। সে প্রমাণ চায় না, প্রমাণ করেও না। সে জানে, বিশ্বাস করে, যুঝাটা বড় নয়, ভাল নয়, পবিত্রতাই বড়—শ্রেষ্ঠ। কুলি মজুরদের বিশাল বাহুকে, পাশবিক মনোবৃত্তিকে সে ভয় পায় না, গ্রাহ্যই করে না; ওদের চাবকিয়ে রাখবার মত মনোবল, দৈহিকশক্তি তার যথেষ্ট আছে। কিন্তু বাহিরের উৎপাতকে উপেক্ষা করতে পারলে না। সেজন্য সে শঙ্কিতা, ভীতা, তৎপর, সতর্ক। হিসেব করে কথা কয়, হিসেব করে চলে, ভেবেচিন্তে কাজ করে।

কানাই সংসারের কোন ধার ধারে না। নিজে যা রোজগার করে তার এক পয়সা সংসারে দেয় না। এখন তার মদ না হলে একবারেই চলে না; নিত্যি মদ খাওয়া চাই, কুপল্লীতে গিয়ে হল্লা করা চাই-ই। হাতের টাকা ফুরালে কুপল্লীতে স্থান পায় না, দিন কয়েকের জন্য ভাল মানুষ সেজে টাকা রোজগার করে—আবার উচ্ছৃঙ্খলতার মাঝে ডুব দেয়। বাড়ীতে বেশী আসে না, খাবারের সময় আসে, খেয়ে-দেয়ে চুপ করে সরে পড়ে, যেদিন খাবার না থাকে সেদিন ঝগড়া বিবাদ করে, মারামারি করে। যে সময় চাকরি থাকে না, মজুরী খাটতেও পারে না, বন্ধুবান্ধবের ওপর খাওয়া পরা করতে পারে না—সেদিন ভাল মানুষ সেজে বাড়ী আসে, ছেলেমেয়েদের নিয়ে কৃত্রিম আদর যত্ন করে। গঙ্গাবতী ভুল বুঝে, স্বামীর প্রতি বিরূপ হয়ে থাকতে পারে না, স্বামীকে আদর যত্ন করে খাওয়ায়, সেবা করে। কানাই নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে চুপটি করে সরে পড়ে।

কানাই আসুক বা না আসুক—এক পয়সা সংসারে দেয় না, উপরন্তু ছলনা করে টাকা পয়সা নিয়ে যায়, রীতিমত খাওয়া দাওয়া করে। গঙ্গাবতীকে বাধ্য হয়ে মিলে কাজ নিতে হয়েছে। গম্ভীরভাবে মিলে কাজ করতে যায়, গম্ভীরভাবে কাজ করে বাড়ী ফেরে। কারো সঙ্গে নিতান্ত দরকার ভিন্ন কথা বলে না, কারো সঙ্গে বন্ধুতাও করে না। সে থাকে আপন মনে।

বাইরের উৎপাতের মধ্যে শ্যামজীর অনুগ্রহটাই হল মারাত্মক। শ্যামজী মিলের ছোটবাবু, মিলে কিছু অংশও (share) আছে। কুলিমজুর থেকে বড়বাবুরা তার ভয়ে কম্পিত, মুখের কথা খসলে লোকের চাকরি যায় এবং হয়। তিনি ক্রোড়পতি, সমাজে খুব প্রতিপত্তি তাঁর, ক্ষমতাও অসীম; যা সঙ্কল্প করেন তাই করতে পারেন, কোথাও এ পর্য্যন্ত পরাজিত হন নি। দেহটা তাঁর ঢাকার জালার মত, ঘাড় আছে কি নাই বোঝা যায় না; তবে ঘাড় আছে হলপ করে বলা যেতে পারে, মাথাটা দেহের পক্ষে অতি ছোট, ছোট মাথায় মস্ত বড় টাক অর্থাৎ মস্তকবিস্তৃত টাক, ভুঁড়ি ও টাক দু' সুলক্ষণই বর্ত্তমান; অতএব টাকা প্রচুর পরিমাণে যে আছে তা না বললেই চলে। দেহের বর্ণনা সোজাভাবে করলে এই বলতে হয় যে টাকপড়া ছোট মাথা, বিশাল ভুঁড়ি, মোটা মোটা হাত পা, রক্তবর্ণ গোল আঁখি, দূর থেকে মনে হবে একটি জালার ওপর একটি আস্তো নারিকেল বসানো আছে। শ্যামজীর চলাফেরার সময় আধভরা জলের কলসির মত গম্ গম্, ছম্ ছম্ শব্দ হয়। ভুঁড়ির বিশেষত্ব আছে; যেমনি মোটা ও ভারি, তেমনি তার বিকট আওয়াজ হয় ঘুমের ঘোরে, ছেলেমেয়েরা সে বিশ্রী শব্দে ভয় পেয়ে যায়। তিনি ভুঁড়ির জন্যে টেবিলের পাশে বসে লিখতে পারেন না, ভুঁড়ি আটকে যায় টেবিলে, আবার চেয়ার সরালে ছোট হাতে লিখা চলে না, টেবিল ছোঁয়া কঠিন হয়, তাই তিনি ডান পাশে টেবিল রেখে কাজ করেন।

ছেলেমেয়েরা এ হেন বিশেষত্বময় দেহ দেখে ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়ে, পালাতে পথ খুঁজে পায় না; কুলি রমণীরা দাঁতখিঁচুনি ও চরিত্রহীন স্বভাবের জন্যে সর্ব্বদা সঙ্কুচিত থাকে, কুলি মজুররা তাঁকে বাঘের মত ভয় পায়, পদস্থ কর্ম্মচারীরা অপমান ও চাকরি যাবার ভয়ে মাথা তুলতে সাহস পায় না। যেদিন মদের মাত্রা বেশী হয় এবং

মেজাজ খারাপ থাকে—সেদিন মিলের সকল কর্ম্মচারী ও কুলি মজুরদের হৃদ্‌কম্প আরম্ভ হয়। গঙ্গাবতী দাঁত খিঁচুনি ও গালাগালকে ভয় পায় না, বরঞ্চ অল্প অল্প পেতে ইচ্ছে করে। সে চায় অন্যান্য কুলি-রমণীদের প্রতি যেমন ব্যবহার করা হয় ঠিক তেমন তার প্রতি হোক। অনুগ্রহে তার প্রাণ কাঁপে। সে ভয় পায় বড়লোকের মাতলামিকে, ছদ্ম সরলতাকে, ভালমানুষে-স্বভাবকে, অনুগ্রহকে। এ সব সহ্য করা যায় না, প্রতিকার করাও সহজ নয়। যার টাকা আছে লোককে দয়া করবে, চরিত্র স্খলতাবশতঃ মাতাল হবে, চরিত্রহীন হবে, তার কিছু যায় আসে না তাতে! কিন্তু তার প্রতি অনুগ্রহ, দয়া—যে তার পক্ষে মারাত্মক। সে ঠেকে ঠেকে লোক-চরিত্র শিখেছে। এ প্রকার ভালমানুষের ব্যবহার—অনুগ্রহই এক সময় তার কাল হয়ে দেখা দেবে, বাহিরে ভাল থাকবে, অন্তরালে অদৃশ্য আকর্ষণ টেনে নেবে নরকে—তখন থাকবে না বাঁচবার উপায়, থাকবে না মুক্তির পথ, নরকের পরশে মনও হয়ে যাবে নরকের দ্বার। এঁরা শিক্ষিত, ক্ষমতাশালী প্রভূত অর্থাধিপতি, এঁদেরকে এড়িয়ে চলা যায় না, ছদ্ম-ভদ্রস্বভাব, মিষ্টি কথার প্রশংসা করতে হয়, ভণ্ডামীকে বাহবা দিয়ে উজ্জ্বল করতে হয়, স্বার্থময় সাহায্যে জুতার নীচে লুটিয়ে কৃতজ্ঞ হতে হয়। এরা নাচাতে নাচাতে ক্লান্ত করে দেন, ছলনায় বোকা বানিয়ে রাখেন, মদিরা রূপ টাকার প্রভাবে মাতাল করে দেন, তারপর নর্ত্তকী আপনি বাহুতে আত্মসমর্পণ করে। এরা সাপ, হাড় নেই, এঁকে বেঁকে জড়িয়ে দংশন করেন। শত্রুর সঙ্গে যুঝা যায়, সতর্ক হওয়া যায়, এদিক কি ওদিক একটা কিনারা করা যায়, কিন্তু এঁরা যে ধোঁয়ার মত—যুঝা যায় না, প্রতিকার করা যায় না, শুধু অচেতন করে দেয়, ধীরে ধীরে গ্রাস করে।

(৫)

শ্যামজী এখন ঠেকে শিখেছেন। ব্যবসায় বুদ্ধি সর্ব্বস্থানে খাটে না; বিশেষত প্রণয় ব্যাপারে। তিনি টাকার জোরে, অসীম প্রতিপত্তির জোরে—দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরে বহু নারীকে ভোগ করতে পেরেছেন। যার প্রতি তাঁর কৃপাদৃষ্টি পতিত হয়েছে তাকেই তিনি ছলে, বলে, অর্থে বশীভূত করে বাগান বাড়ীতে এনে অঙ্কশায়িনী করেছেন। রূপ থাকা সত্ত্বেও পুরাতনের মোহ কাটলে তিনি হতভাগিনীদের কপর্দ্দকহীন করে পথে দাঁড় করাতে এতটুকুও কুণ্ঠিত হন নি। যাদের পায়ে মাথা নত করেছেন দেহ জয় করবার জন্যে, তাদেরই পদাঘাত করেছেন—বিশ্ববিজয়ীর মত নতুনের মাতাল উদ্দীপনায়। এখানে বলে রাখা উচিত যে তিনি ব্যবসায়ী বেশ্যা ও ভদ্রমহিলাদের ওপর বড় বিরূপ; যদি কোন চরিত্রহীনা মহিলা—মুখোস-পরা নারী তাঁর ঐশ্বর্য্যের লোভে এগিয়ে আসে তবে তিনি সমাদরে গ্রহণ করেন, নতুবা তিনি প্রথম এগিয়ে যেতে সাহস পান না। এর কারণ বেশ্যাকে ভোগ করতে হলে টাকার প্রয়োজন, ফাঁকি চলে না, যথেচ্ছাচার চালানো যায় না, ওরা চুষে টাকা নিয়ে যায়। ভদ্রমহিলাদের ওপর লোভ খুব বেশীই ছিল, কারণ বিনা অর্থে স্খলিতা নারীকে যে ভাবে ইচ্ছে চালানোর খুব সুবিধে। ভাগ্য একটু বিরূপ, যৌবন যে কলঙ্কটিকা ললাটে দিয়েছিল এঁকে—সে আজও মুছে যায়নি। ভদ্রমহিলার ওপর জবরদস্তি করতে গিয়ে জুতার বাড়ী খেয়েছিলেন বহু নরনারীর সম্মুখে।

গরীব, দুঃখী, কুলিমজুর সুন্দরী রমণীদের ওপর লোভ বেশী, টাকার জোরে অভিলাষ অতি সহজেই পূর্ণ হয়। এ জীবনে তিনি বহু সতীকে অসতী করেছেন, ঘরের কুলবধূকে স্বামীর বক্ষ হতে কেড়ে এনে বেশ্যা করেছেন, কপর্দ্দকহীনাকে অর্থশালিনী করেছেন। সর্ব্বত্র জয়ী হয়ে তিনি নারীকে নারী বলে ধারণা করতে ভুলে গেছেন। তাঁর ধারণা ছিল নারী পুরুষের জন্য সৃষ্ট হয়েছে—তার নেই আপন সত্তা, নেই তার নারীত্ব। হুকুম করলেই নারীরা এগিয়ে আসে; দু'এক পয়সা দেখালে পোষা কুকুরের মত জুতার নীচে পড়ে লুটিয়ে, জুতার ঠক্কর খেলে লেজ নাড়ে, পায়ের পাতা চেটে সুড়সুড়ি দেয়। তবে মাঝে মাঝে দু'একজন নারী বের হয়, তাদের লোক-দেখানো লজ্জা, কুসংস্কার, সতীত্বজ্ঞান একটু থাকে—তাই পোষ মানাতে দেরী হয়, কিন্তু টাকার চাক্ষুষ রূপে সবাই লুটিয়ে পড়ে, চাবুক মারলেও নড়ে না। শ্যামজীর ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতাকে বাতিল করে দেয়—প্রথম কিশোরী বাঈ।

কিশোরী বাঈ মিলে আসতো স্বামীর খাবার নিয়ে, অভাবে পড়লে মাঝে মাঝে মিলে দিনমজুরী করতো।

কিশোরীবাঈএর ওপর শ্যামজীর লোভ পড়ে। যেমনি লালসা জাগলো অমনি হুকুম দিলেন, কিশোরীবাঈ প্রস্তাব অতি তুচ্ছভরে প্রত্যাখ্যান করেছিল। ঐশ্বর্য্যের মাদকতায় কিশোরীবাঈ মোহিত হয় নি, একটু এলে পড়ে নি। শ্যামজী শেষ অস্ত্র মেরেছিলেন। অবলা নারী জোর করে, ছল করে, কতক্ষণ পুরুষকামবহ্নির ক্ষমতা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। মেরে, কামড়িয়ে, খাঁমাচিয়ে বহুক্ষণ আত্মরক্ষা করেছিল—শেষটায় প্রকৃতি তাকে আত্ম-সমর্পণ করতে বাধ্য করেছিল।

কিশোরীবাঈকে বশীভূত করবার জন্য যে সব অলঙ্কার ও টাকাকড়ি শ্যামজী দিয়েছিলেন সেগুলি দরোয়ানকে ঘুস দিয়ে কিশোরী পালিয়ে যায়। কিশোরী স্বামীর পায়ে পূর্ণ অধিকার পেয়ে, স্বামীর ভালবাসা পূর্ব্বের মতই অকৃত্রিমভাবে পেয়ে শির উচ্চে তুলে দাঁড়িয়েছিল; বাধা, বিপত্তি, ভয়কে অবজ্ঞা করে নারীহরণ মোকদ্দমা করেছিল। সে মোকদ্দমায় যদি ও বহু অর্থ ব্যয়ে নিষ্কৃতি পেয়েছিলেন, কিন্তু অপমান ও জঘন্য দুর্ণামের হাত হতে রক্ষা পান নি। ভদ্রসমাজে উপেক্ষা করে, ভদ্রমহিলারা তাঁর ত্রিসীমানায় আসে না এবং এত বড় অপমান ও দুর্ণামে শ্যামজীর স্ত্রী ফাঁসে ঝুলে আত্মহত্যা করেন।

প্রবাদ আছে 'মরলেও স্বভাব যায় না।' শ্যামজীর স্বভাবও বদলাল না। ফাঁস লটকিয়ে স্ত্রীকে মরতে দেখে শ্যামজী একটু দমে গিয়েছিলেন, 'মানে স্ত্রীর প্রেত-আত্মার ভয়ে সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকতেন, এমন কি রক্ষিতাদের বাড়ী গিয়ে রাত কাটানো দূরের কথা, চাকরবাকর নিয়ে নিজের ঘরে শুতে ভয় পেতেন। স্ত্রীর আত্মা স্বপনঘোরে শাসিয়ে যেতো, স্ত্রীর ভয়ে তিনি কিশোরীবাঈকে পুনঃ ধরে আনা ও তার স্বামীকে অত্যাচার করে প্রতিশোধ নেওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। রোজ তিনবেলা কোনভাবে গায়ত্রী জপতেন সচকিতে চারিদিক চেয়ে, অবশ্য পূর্ব্বে পৈতা ছিল না, নতুন তৈরি করে নিতে হয়েছিল। ক্রমে মনের বিভীষিকা কেটে গেছে, গায়ত্রী জপার সময় হয়ে ওঠে না, সন্ধ্যা-আহ্নিকের বই, সরঞ্জাম আবার কোণঠাসা পড়েছে, পৈতেটা এখনো গলায় আছে।

সবাই ভেবেছিল, এমন কি কু-পথের সাহায্যকারী মোসাহেবের দল বিশ্বাস করেছিল যে শ্যামজীর পত্নী-বিয়োগে আমূল পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। শ্যামজী পত্নীশোকে সত্যই বড় কাতর হয়ে পড়েছেন; সতীর আত্ম-ত্যাগে স্বামীর জীবন পুণ্যপথে পরিবর্ত্তিত হল; ধর্ম্মে মতিগতি হচ্ছে, কোনদিন হয়ত সর্ব্ব ত্যাগ করে সাধু হয়ে যাবেন। যক্ষ্মা-রোগী যেমন চিকিৎসার ও স্থানের গুণে সাময়িক ভাল হয়, তেমনি শ্যামজীর মতিগতি হঠাৎ বিশৃঙ্খলতা ও ভীতিতে জড় হয়ে পড়েছিল মাত্র।

গঙ্গাবতী চরিত্রহীন পুরুষদের উৎপাতে টিঁকতে না পেরে শ্যামজীর মিলে এসে চাকরি নিলে। সুন্দরীদের জয় সর্ব্বত্র, সর্ব্ব সময়ে। গঙ্গাবতীর কাজ মেলাতে কোন বেগ পেতে হয়নি; সাদরে তাকে মিলে কাজ দিলে, যদিও সে কুলি রমণী এবং কোন নির্দ্দিষ্ট কাজে দক্ষা বলে খ্যাতিলাভ করে নি।

কয়েক হপ্তা এমনি কাটলো। গঙ্গাবতী কাজে আসে, আপন মনে কাজ করে, হপ্তা শেষে মজুরী নিয়ে বাড়ী ফেরে। হঠাৎ গঙ্গাবতী শ্যামজীর শ্যেন দৃষ্টিতে পড়ে যায়। যেমনি পূর্ণ-যৌবন চারিদিক ছেয়ে ঢেউ খেলে কেবা আবর্ত্তন করে তোলে রূপ মাধুরিমা—তেমনি তার স্বাচ্ছন্দ্য, সরল স্বাভাবিক চরিত্র লোককে করে উদ্‌ভ্রান্ত। এত রূপ, এত বড় অসহায়তা লোককে যেমনি মুগ্ধ করে অতি মাত্রায়, তেমনি আবার সাহস-ভীতির মানসিক দ্বন্দ্বে সাহসকে বেপরোয়া করে দেয়। শ্যামজী এত বড় মূল্যবান অথচ সহজ শিকার হাতের কাছে পেয়ে নিজকে সংযত করতে পারলেন না, কাম অনলে আগুনের হলকার মত হলেন চঞ্চল. দিবা-রাত্র মন যেন বলে গঙ্গাবতীর যৌবন, রূপ, নারী দেহ—শুধু তারই জন্য সৃষ্ট হয়েছিল, তাই সে স্বামী অনাদৃতা, তারি নিকট আশ্রয়প্রার্থিনী। গঙ্গাবতী নিরাশ্রয় বলে কাম বাসনাকে আর সংযত করলেন না, চেষ্টাও করলেন না। একবার নাকালের চূড়ান্ত হয়ে এখন সাবধান হয়ে গেছেন, কুলিমজুর রমণীদের দেহটা যে মিলের সম্পত্তি নয়, তা বুঝতে পেরেছেন। এবার কাঁচা কাজ করলেন না, পথঘাট বেঁধে লোক লাগিয়ে প্রথম গঙ্গাবতীর খবর নিলেন ভাল করে। তাঁর অনুচররা গঙ্গাবতীর ইতিহাস জোগাড় ক'রে নিয়ে এলো। গঙ্গাবতী যদিও স্বামী-পরিত্যক্তা, গরীব, সন্তানের আহার যোগাতে পারে না—কিন্তু বড় তেজস্বিনী, সতীত্ব জ্ঞান বড় প্রখর, দু'তিনটে মিলের কাজ ত্যাগ করে

চলে এসেছে। সতীত্বে, নারীত্বে একটু ঘা পড়িলে এখান থেকেও অতি সহজে চলে যেতে পারে। শ্যামজী এবার অন্য পথ ধরলেন। ধীরে ধীরে বিষ খাইয়ে যেমনি মানুষকে নির্জ্জীব জড় করে শেষটায় মৃত্যুর মুখে ফেলে দেয়, মানুষ নিজের মহা সর্ব্বনাশের কথা বুঝতেও পারে না, তেমনি গঙ্গাবতীকে নির্জ্জীব জড় করবার জন্য শ্যামজী প্রেমের অভিনয় আরম্ভ করলেন; গঙ্গাবতীকে স্বেচ্ছায় আত্ম-সমর্পণ করাবার জন্য চারদিকে মায়াজাল ফেলতে লাগলেন।

কুলিবস্তি পরিদর্শন করবার কোন প্রয়োজন পড়ে না, যদিও পুঁথিপুস্তকে নিয়মকানুন আছে—তবু কেউ মেনে চলেন না। কে যেতে চায়—সুখের সময় অপব্যয় করবার জন্য নোংরা বস্তি পরিদর্শন করতে। স্যাঁৎসেতে ঘরদোর, আলো নাই, নর্দ্দমা পচা, আবর্জ্জনা পচা, দুর্গন্ধময় বিষাক্ত বাতাস, বস্তির ঘরে ঘরে অসুখ বিসুখ। ঘরে ঘরে অশান্তি, দুঃখদুর্দ্দশা, বিশৃঙ্খলা, হাহাকার। মাতাল নরনারীর বীভৎসতা, মাতাল চরিত্রহীন লোকের পাশবিক অত্যাচার অবলা স্ত্রীর ওপর। যার ঘরে সুন্দরী যুবতী তার ওপর চরিত্রহীনদের অত্যাচার, সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে কলঙ্ক, সমাজে মুখোস পরে ভেতরে ভেতরে পাপের ব্যবসায় চালায় নিজের স্ত্রী-কন্যা দিয়ে। অবশ্য সমাজে ভাল লোকও আছে, সে খবর আড়ম্বর করে জানাতে বসি নি, অন্যায়, অত্যাচার, হীনতা, পাপের চিত্রই দেখাবো। কলে টিপ্ টিপ্ করে অল্পক্ষণের জন্য জল পড়ে—তা নিয়ে ছেলে বুড়োদের হেঁচড়া হেঁচড়ি, ঝগড়া ঝাঁটি রোজই হয়। মাঝে মাঝে বাক্‌যুদ্ধ থেকে চড়াচড়ি, খাঁমচা-খাঁমচি, চুলাচুলি, ভাল করে মারামারিও হয়। অভাব অনাটন, রোগ শোক, দুঃখ দুর্দ্দশায় একঘেয়ে জীবন চালাতে চালাতে আর পারে না, স্বভাব আপনিই খিট্‌খিটে হয়ে যায়। এরা যখন তখন ঝগড়াঝাটি করে—আবার পরমুহূর্ত্তে সব ভুলে যায়, বিচার-বুদ্ধিহীনতাবশতঃ মনের কোণে সব কিছু পেঁচিয়ে রাখতে পারে না—সরলতার মুখোস পরে ভয়ঙ্কর হতে পারে না।

পানীয় জল এক ফোঁটা মিলতে পারে না, জলের কারখানা থেকে যে নর্দ্দমা বস্তির গা ঘেঁসে চলে গেছে, তারই অপরিষ্কার জলে সারা গ্রীষ্মকাল সব কাজ চালায়, এমনই জলের অভাব। আবার বর্ষাকালে জলের বন্যা বয়, অজস্র বারিধারা রোধ করা যায় না। ছাদের সর্ব্বাঙ্গ ফাঁক, ফাটা। ঝম্ ঝম্ করে জল পড়ে নর্ত্তকীর মাতাল নৃত্যের মত নেশায়, ঝপ্ ঝপ্-করে জল পড়ে ছাদের ফাঁক দিয়ে। বিছানা পাতবার মত ঠাঁই পাওয়া ভাগ্যের কথা, গুটিয়ে রাখবার স্থান মেলে না। অবশ্য মিলের বাবুদের (কর্ম্মচারী—Officer) জন্য যে সব বাড়ী করে কোয়ার্টার করা আছে এবং আড়ম্বরভূষিত করবার জন্য বাঙ্গলো নাম দেওয়া হয়েছে—সেগুলির অধিকাংশই সংস্কারের অভাবে বিশ্রী অবস্থায় দাঁড়িয়েছে, দাঁড়াচ্ছে। বৃষ্টি নামলে জিনিষ-পত্তর নিয়ে টানাটানি করতে হয়, রাত্তিরে বিছানা গুটাতে হয়।

কুলিমজুরদের এমনই দুর্দ্দশা! আবেদন, নিবেদন বহুবার হয়েছে—কোন ফল হয়নি, আবেদন-পত্র নষ্ট কাগজ-পত্রের সঙ্গে নষ্ট হয়; মুখের আবেদন দয়া, অনুগ্রহ, যাচ্ঞা ব্যর্থ হয়। কেউ কোন খোঁজখবর নেয় না—জানালেও কর্ণপাত করে না। বহুদিন যাবৎ এমনি চলছিল, হঠাৎ কর্ত্তৃপক্ষ অনুগ্রহ করলেন, কুলিমজুররা আশা করলে এবার কর্ত্তৃপক্ষের দয়া হয়েছে, কারণ এবার মিলের খুব লাভ হয়েছে। শেষ পর্য্যন্ত কেবল দশ নম্বর বাড়ী—যেখানে গঙ্গাবতী বাস করছে, সেটার পুনঃ সংস্কার হল। এ পাড়ার জলের খুব অভাব, যদিও অন্য পাড়ায় একি অবস্থা—তবু কেবল এ পাড়াতে দশ নম্বর বাড়ীর সম্মুখে কল বসানো হল। বস্তিতে গঙ্গাবতীর বাড়ীর চেয়ে বহু বাড়ীই খারাপ, তথাপি কেবল গঙ্গাবতীর বাড়ী মেরামত হল—কুলিমজুররা বহুবার আবেদন করেছে, এবারও আবেদন করেছিল—তবু তাদের বাড়ী মেরামত হলো না; আর গঙ্গাবতীর বাড়ী বিনা আবেদনে, একটু ভাল থাকা সত্ত্বেও মেরামত হলো দেখে সকল লোক চটে গেলো। কুলি পুরুষরমণীরা শ্যামজীর ও গঙ্গাবতীর নামে কুৎসা রটাতে আরম্ভ করলো মনের আক্রোশে। কুৎসায় মুখ ভরে, গেয়ে সুখ পাওয়া যায়। কুৎসা অসম্ভব রকম অশ্লীল করে মতই আলোচনা করুক, তৈরী করুক, কিন্তু কোন প্রতিকার করতে পারলো না এরা। শ্যামজীকে মিলের বিধাতা-পুরুষ বললে অত্যুক্তি হয় না। মিলে চাকরি করতে হলে তাঁর সুখ্যাতি গেয়ে তোষামোদ করতেই হবে, এ ভিন্ন অন্য কোন পথ নেই। এরা ভেতরে ভেতরে খুব জ্বলে পুড়লো, কিন্তু বাইরে পোষা কুকুরের মত পায়ে লুটিয়ে

পড়লো। যখন শ্যামজী বল্‌লেন যে দশ নম্বর বাড়ীতে একটা খারাপ রোগী মরেছিল অতএব চুণ (white wash) না লাগালে বিষাক্ত বীজ ছড়াতে পারে (আমরা জানি, কুলিরাও জানে যে এগার নম্বর বাড়ীতে একটি যক্ষ্মা রোগী দু' বছর পূর্ব্বে মারা গিয়েছিল, অবশ্য দশ নম্বর ও এগার নম্বর বাড়ী একবারে লাগালাগি); তারপর একটা বড় ডাল ছাদের উপর এসে বাড়ীটা নষ্ট করে দিচ্ছে, বহু খোলা ভেঙ্গে গেছে, সময়মত না সারালে বাড়ীটাই নষ্ট হয়ে যাবে, তাতে মিলের বহু ক্ষতি হবে। বড়বাবু হুকুম দিয়েছিলেন—পূর্ব্বেই সারাতে, ব্যস্ততায় হয়ে উঠেনি। বর্ত্তমান, এ দুর্দ্দিনে মিলের এমন ক্ষমতা নেই যে সকল বাড়ী মেরামত করা যেতে পারে! কর্ত্তৃপক্ষের নজর পড়েছে, ভবিষ্যতে সমস্ত বাড়ীই পুনঃ মেরামত করা হবে।...

শ্যামজী গঙ্গাবতীকে কোন প্রলোভন দেখালেন না, পদস্খলিত করবার জন্য ফুসলাতেও চেষ্টা করলেন না। অদৃশ্য ক্ষমতার মত অলক্ষ্যে থেকে মজুরী বেশী করে দেওয়াতে লাগলেন, ঘরদোর ভাল করে দিলেন, জলের সুবিধে করে দিলেন। মিলের খাটুনিও একটু কমিয়ে দিলেন। বড় আশা করে বস্তি পরিদর্শন করতে কয়েক দিন গিয়েছিলেন; প্রবল ইচ্ছা ছিল—গঙ্গাবতীর সঙ্গে আলাপ-সালাপ করবার কোন সুবিধে হয়নি। কুলিমজুররা ঘিরে থাকে সর্ব্বদা এবং গঙ্গাবতী কোন গ্রাহ্যই করে না। গঙ্গাবতী এমনই তেজস্বিনী, এমনই স্বাধীন, স্পর্দ্ধিত রমণী যে চাকরির মায়ায় লোক-দেখানো তোষামোদ পর্য্যন্ত করে না। গঙ্গাবতীর বাড়ী গেলেন, সমস্ত কুলিমজুর যোড়হাতে কম্পমান অবস্থায় স্বার্থের জন্য অপরের অখ্যাতি রটিয়ে নিজের সুখ্যাতি গেয়ে গেয়ে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল—আর গঙ্গাবতী ছোটলোকের পক্ষে অপরিচিত ভদ্রলোককে যেটুকু সম্মান দেখানো উচিত, তা পর্য্যন্ত দেখায়নি, অনুগৃহীতা বলেও একটু বিনয় দেখায়নি। সমস্ত কুলিমজুর শ্যামজীকে পেয়ে জীবন ধন্য মনে করেছিল, আর গঙ্গাবতী পথের লোকের মত নিরপেক্ষ, উদাসীন ভাব দেখিয়েছিল, গ্রাহ্যই যেন করেনি।

শ্যামজী যদিও অন্তরে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, ধৈর্য্য রাখতে অক্ষম হয়ে পড়লেন, তবু প্রাণপণে নিজেকে সরিয়ে রাখতে লাগলেন। হাতে পাওয়া, মুষ্টিবদ্ধ জিনিষ পেয়েও যেন এমনই খেতে পারছেন না; খেতে অসুবিধা নেই, নিজের কোন আপত্তি নেই, কোন বাধাও নেই—তবু যেন যাই যাই করে যাওয়া হয়ে উঠছে না। লাভ, আপশোষ, সাহস ও ভয়ের মাঝে যে কার্য্য সম্পন্ন করবার শক্তিটা জড় আছে তা বুঝতে পারেন না। কার্য্যকরী শক্তিটা যে জড় আছে তা বুঝবার মত মনের গভীরতা নেই, প্রসারতা নেই। তাই গঙ্গাবতীর স্বেচ্ছাকৃত উপেক্ষায়, অপমানে এক একবার বারুদের মত জ্বলে উঠেন, বুঝতে পারেন যে আশা এখনও পূর্ণ হয় নি, অভাব কেবল তীব্রই হচ্ছে—পূরণের দিকে একটু এগিয়ে যায় নি, তখনি নিজের মনে হুকুম করেন—গঙ্গাবতীকে চুলের মুঠা ধরে টেনে আনবার জন্য। দেয়ালে তাঁর কথার প্রতিধ্বনি হয়, ধ্বনিও প্রতিধ্বনি মিলে বিকট স্বর ধরে। নাটকীয় ভঙ্গীতে ঘরে পদচারণা করতে করতে ভাবেন, হাত-পা' নেড়ে ভাবেন যে গঙ্গাবতীর এলো খোঁপার ঝুঁটি ধরে হিঁচড়ে এনে দেখিয়ে দেবেন যে তিনি বীরপুরুষ—আর সে অবলা নারী, তিনি অসীম ক্ষমতাশালী, ক্রোড়পতি, রাজা—আর সে দুর্ব্বলা ভিখারিণী, প্রজা, দাসী। আভিজাত্যচালে হাত নির্দ্দেশ করে বলেন যে তার জন্ম হুকুম করবার জন্য—মনের খেয়াল মেটাবার জন্য—মনের তীব্র ক্ষুধা মেটাবার জন্য—আর গঙ্গাবতীর জন্ম হুকুম নীরবে, সন্তুষ্টচিত্তে পালন করবার জন্য, সন্তুষ্টচিত্তে নিজকে উৎসর্গ করে খেয়াল মেটাবার জন্য। যতদিন ক্ষুধা মেটাতে পারে ততদিন প্রতিদান পাবে ঐশ্বর্য্য, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, তারপর পাঁকের ফুল পাঁকে গিয়েই পচবে। গঙ্গাবতীর কত বড় সৌভাগ্য যে শ্যামজী খাটো হয়ে তারি দুয়ারে এসে দাঁড়ান; তিনি ইচ্ছে করলেই মুহূর্ত্তে এই স্পর্দ্ধিতা, দুর্ব্বিনীতা, অপরিণামদর্শিনী, বাতুল-তুল্যা নারীকে দাসী করে সাজানো-ঘর আলো করতে পারেন—আর সে কিনা গ্রাহ্য করে না, ভ্রূক্ষেপও করে না!

শ্যামজী জ্বলে উঠে নিজেই দগ্ধ হন, যত সহজ মনে করতেন তত সহজ আর মনে হয় না; হতাশে ক্রোধানলে বল, কৌশল প্রয়োগ করতে চান শেষ পর্য্যন্ত—আর সাহসে কুলিয়ে উঠতে পারেন না। কিশোরীবাঈ সে শক্তি চূর্ণ করে দিয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছে। পশুত্বের কার্য্যকরী উগ্রতা কিশোরীবাঈ বিভ্রান্ত করে দিয়েছে; বড় হুঁসিয়ার করে দিয়েছে; বড় দুর্ব্বল, সন্দিগ্ধ করে দিয়েছে; মোসাহেবরা

উৎসাহ দেয়, কবিত্বপূর্ণ রূপের বর্ণনা করে, বিশ্রী কথা বলে ক্ষিপ্ত করে, উৎসাহ দেয়, সাহস দেয়, উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ কেউ বের করতে পারে না। বোতলের পর বোতল মদ খায়, কল্পনায় গঙ্গাবতীকে জোর করে ধরে আনে কেউ, কেউ ফুসলিয়ে আনে, কেউ আনে রোমান্স করে, গঙ্গাবতী হাসতে হাসতে আসে, শ্যামজীকে মদ দেয়, নিজে খায়, নাচে, দেহ প্রদর্শন করতে করতে শ্যামজীর কোলে ঢলে পড়ে ইন্দ্রপুরীর অপ্সরার মত। মাতালদের যখন ঘুম ভাঙ্গে, নেশার ঘোর কাটে, তখন হাতের পাশে কিছু খুঁজে পায় না, কথার প্যাঁচ আর চলে না। দিনের খোলা স্পষ্ট আলোকে নারীহরণ ভয়টা বড় একটু জটিল হয়ে নয়নে ঠেকে। শেষ পর্য্যন্ত আশা থাকে শুধু। (ক্রমশঃ)

এস

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

নীরসে সরস করি' এস, শ্যাম জলধর !
শ্রীহীন রাধার কুঞ্জ বিনা রাধামনোহর ;
ফুটে না কুসুম কলি
গুঞ্জরি' না আসে অলি,
যমুনার জলবেণী লুটে বেলা-বালু-পর।
বিরহ-ব্যথিত ব্রজ ; এস, শ্যাম জলধর।

তোমা বিনা, ব্রজেশ্বর, ব্রজ আজি অন্ধকার ;
তোমার বিলাসকুঞ্জে উঠে শুধু হাহাকার ;
পুলকিত বনমাঝে
বাঁশী তব নাহি বাজে,
বনপথে নাহি রাজে ছিন্নসূত্র ফুলহার—
জানায়ে তোমার তরে গোপিকার অভিসার

শোভে না কুসুম আর কদম্বের শাখা 'পরে ;
শীকর-শীতল বায়ে ফুলরেণু নাহি ঝরে ;
শ্রীহীন তমাল শাখে
পাখী আর নাহি ডাকে ;
ভুলিয়াছে নৃত্য শিখী—কেকারব নাহি ক'রে ;
ঊর্দ্ধমুখে গোঠে গাভী আছে চাহি' তোমা তরে।

জ্যোছনা নিশায় আর নাহি রাস—রসময় ;
গোপিকা নাহিক গণে ফাগুন দিবসচয়—
কবে দোল মহোৎসবে
আনন্দে মাতিবে সবে—
পুলক-চঞ্চল হিয়া, নাহি লাজ, নাহি ভয় ;
গোপিকা তোমার প্রেমে করিবে আপনা লয়।

জল ফেলি' ব্রজবালা জলে আর নাহি চলে
যৌবন-যমুনাকূলে তোমারে হেরিবে ব'লে।
বিকচ কদম্বমূলে
কাল কালিন্দীর কূলে
দিন যায়—দিন যায়—উঠে জলকলকলে—
তুমি যে ডেকেছ তা'রে বাঁশরী-বাদন-ছলে।

তোমার বাঁশরী স্বর পশিয়াছে কাণে যা'র,
সে কি মানে কোন বাধা—সে কি থাকে গৃহে আর ?
তুমি যা'র চিদাকাশে
কে তা'রে ফিরা'বে বাসে ?
অন্তর উজল যা'র কোথা তা'র অন্ধকার ?
তুমি প্রেম—তুমি ভক্তি—তুমি মুক্তি গোপিকার।

এস ফিরি' বৃন্দাবনে, এস, শ্যাম জলধর ;
বিপিনে যমুনাকূলে উঠুক বাঁশরী-স্বর।
বরণ জলদঘটা,
তাহে বিজলীর ছটা,
শিখিপুচ্ছ চূড়া শিরে—ইন্দ্রধনু মনোহর ;
রাধা হৃদিকুঞ্জে আসি' বিহর হে নটবর।

শ্রীচৈতন্যদেব ও জাতিভেদ

অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় গত আশ্বিন মাসের ভারতবর্ষে "শ্রীচৈতন্যদেব ও জাতিভেদ" নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে "শ্রীচৈতন্যদেব জাতিভেদ তুলিয়া দিয়াছিলেন" এই ধারণাটি ভুল। তাঁহার মতে "শ্রীচৈতন্যদেব যে জাতিভেদ এবং অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে ব্যবস্থাগুলি নিন্দা বা অমান্য করেন নাই, এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবসর নাই।" এই বিষয়ে সাধারণের ভুল ধারণার কারণ কি—তাহার আলোচনা করিয়া বসন্তবাবু লিখিয়াছেন :—

"এরূপ ভুল ধারণা হইবার আর একটি কারণ এই যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও কোনও পাঠ্যপুস্তকে এই ভুল কথা লেখা আছে। যথা, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ভারতবর্ষের ইতিহাসে লেখা হইয়াছে Chaitanya did away with distinctions of caste (page 202); অর্থাৎ "শ্রীচৈতন্য জাতিভেদ তুলিয়া দিয়াছিলেন।" কথাটি যে কত ভুল তাহা শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী সম্বন্ধে প্রামাণিক এবং সর্ব্বজনপরিচিত শ্রীচৈতন্যভাগবত এবং শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।"

এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিবার সম্প্রতি আমার অবসর নাই এবং আবশ্যকতাও নাই। কিন্তু উপসংহারে বসন্তবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট আমার পাঠ্যপুস্তকের বিরুদ্ধে আবেদন করিয়াছেন, সুতরাং আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যেটুকু দরকার তাহা সংক্ষেপে নিবেদন করিতেছি।

কেবল যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকেই এই 'ভুল ধারণা' আছে তাহা নহে। যে সমুদয় আধুনিক গ্রন্থ প্রামাণিক বলিয়া বিবেচিত হয় তাহাতেও ইহার উল্লেখ আছে। পরলোকগত সার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর সংস্কৃতশাস্ত্রবিৎ ছিলেন এবং বৈষ্ণব ও শৈব ধর্ম্মের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থ সর্ব্বত্র প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হয়। তিনি এই গ্রন্থে লিখিয়াছেন "Chaitanya also was a more courageous reformer in so far as he condemned the distinctions of castes." (৮৩ পৃঃ)

রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপণ্ডিত। বসন্তবাবু যে চৈতন্যভাগবতের দোহাই দিয়া তাঁহার মত সমর্থন করিয়াছেন সেই গ্রন্থ সম্বন্ধে দীনেশবাবু লিখিয়াছেন: "চৈতন্যভাগবতে উক্ত হইয়াছে—জাতিভেদের অসারতা দেখাইবার জন্য তিনি (চৈতন্য) হীন শূদ্র রামানন্দ রায়কে দিয়া শাস্ত্রব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তদীয় অনুচর ভক্ত কবিগণ নিজেদের ব্রাহ্মণ্য অভিমান লুপ্ত করিয়া শুধু দাস বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া গিয়াছেন এবং ঈশান নামক ব্রাহ্মণ নিজের উপবীত ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তাঁহাদের সেবার অধিকারী হইয়াছিলেন। "আমার ও আমার সেবকের কোন জাতি নাই" এই কথা তিনি অটল নির্ভীকতার সহিত প্রচার করিয়াছিলেন। একথা চৈতন্যভাগবতে দৃঢ়ভাবে উল্লিখিত আছে।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ষষ্ঠ সংস্করণ, ২৭৫ পৃষ্ঠা)

শ্রীযুক্ত বসন্তবাবু চৈতন্যচরিতামৃতের উল্লেখ করিয়াছেন; আমি তাহা হইতে * কয়েকটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিব। বসন্তবাবু লিখিয়াছেন যে চৈতন্যের ভৃত্য পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন (৪৯১ পৃষ্ঠা)—এমনি তাঁহার জাতিভেদ সম্বন্ধে কঠোরতা!

কিন্তু শূদ্রজাতীয় গোবিন্দ যখন মহাপ্রভুর ভৃত্য হইবার জন্য আবেদন করিল তখনকার যে বর্ণনা চৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই তাহার ঠিক বিপরীত ধারণাই হয়। এই বর্ণনা হইতেই মহাপ্রভুর জাতিভেদ সম্বন্ধে ধারণা বুঝা যাইবে, এই জন্য মূল গ্রন্থের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"আর দিনে সার্ব্বভৌম আদি ভক্ত সঙ্গে
বসিয়াছেন মহাপ্রভু কৃষ্ণকথা-রঙ্গে।
হেনকালে গোবিন্দের হৈল আগমন;
দণ্ডবৎ করি কহে বিনয়-বচন—
"ঈশ্বর পুরীর ভৃত্য গোবিন্দ মোর নাম;
পুরী গোসাঞীর আজ্ঞায় আইনু তব স্থান।
* * * *
এত শুনি সার্ব্বভৌম প্রভুরে পুছিল –
"পুরী গোসাঞী শূদ্রসেবক কাঁহাতে রাখিল?"
প্রভু কহে—"ঈশ্বর হয় পরম স্বতন্ত্র;
ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদ-পরতন্ত্র।
ঈশ্বরের কৃপা জাতিকুল নাহি মানে।
বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ করিল ভোজনে।
* * * *
মর্য্যাদা হৈতে কোটি সুখ স্নেহ-আচরণে;
পরম আনন্দ হয় যাহার শ্রবণে।"
এত বলি গোবিন্দেরে কৈল আলিঙ্গন;
গোবিন্দ করিল সবার চরণ-বন্দন
* * * *
তবে মহাপ্রভু তারে কৈল অঙ্গীকার;
আপন শ্রীঅঙ্গ সেবায় দিল অধিকার। (৩৩০—৩১ পৃষ্ঠা)

* শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
শ্রীপাদ শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
দ্বিতীয় সংস্করণ—কালনা—১৩৩০ সাল

নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ সার্ব্বভৌম শূদ্রসেবকের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা সত্ত্বেও মহাপ্রভু গোবিন্দকে যে শুধু ভৃত্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন তাহা নহে, তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তিনি যে যুক্তি দেখাইলেন তাহাতে জাতিভেদের অসারতাই প্রতিপন্ন হইল।

চৈতন্যের যুগে শূদ্রকে স্পর্শ করাও বিষম অনাচার বলিয়া বিবেচিত হইত। চৈতন্য এই অস্পৃশ্যতা পরিবর্জ্জন করিয়া লোকের ভক্তি ও সম্ভ্রম আকর্ষণ করিয়াছিলেন; চৈতন্যচরিতামৃত হইতেই আমরা ইহার প্রমাণ পাই :—

"হেনকালে আইল তথা ভবানন্দ রায়;
চারিপুত্র-সঙ্গে পড়ে মহাপ্রভুর পায়।
সার্ব্বভৌম কহে—"এই রায় ভবানন্দ;
ইঁহার প্রথম পুত্র রায় রামানন্দ।"
তবে মহাপ্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন;
* * * *
রায় কহে—"আমি শূদ্র বিষয়ী অধম;
মোরে তুমি স্পর্শ এই ঈশ্বর-লক্ষণ। (৩২৬ পৃষ্ঠা)

ইহার শেষ দুইটি পংক্তি হইতে আমরা বুঝিতে পারি, চৈতন্যের কোন গুণে নীচজাতীয় হিন্দুগণ তাঁহার ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়াছিল।

নীচজাতীয় লোকের সহিত আহার করিতেও যে চৈতন্যদেবের আপত্তি ছিল না—তাহার প্রমাণও চৈতন্যচরিতামৃতে পাই। মহাপ্রভু তাঁহার শিষ্যগণকে লইয়া আহার করিতে ভালবাসিতেন। ভোজনে বসিয়া তিনি পতিত রূপ ও সনাতন এবং এমন কি যবন হরিদাসকেও আহ্বান করিতেন। যথা—

"উদ্যান ভরি বৈসে ভক্ত করিতে ভোজন।
হরিদাস বলি প্রভু ডাকে ঘন ঘন;
দূরে রহি হরিদাস করে নিবেদন—
ভক্ত সঙ্গে করুন প্রভু প্রসাদ অঙ্গীকার;
এ সঙ্গে বসিতে যোগ্য নহোঁ মুঞি ছার।
পাছে মোরে প্রসাদ গোবিন্দ দেবে বহির্দ্বারে"
মন জানি প্রভু পুনঃ না বলিল তাঁরে। (৩৫২ পৃষ্ঠা)

এই প্রসঙ্গেই দেখিতে পাই ভোজনে বসিয়া অদ্বৈতাচার্য্য (পরিহাস-ছলে) নিত্যানন্দকে বলিতেছেন যে, প্রভু তো সন্ন্যাসী—তাঁহার কোন দোষ হয় না—কিন্তু তিনি গৃহস্থ মানুষ, সর্ব্বজাতির লোকের সঙ্গে এক পংক্তিতে খাওয়া তাঁহার পক্ষে অনাচার। নিত্যানন্দও পরিহাস করিয়া জবাব দিতেছেন যে অদ্বৈতের সঙ্গে একত্র ভোজনও তাঁহার পক্ষে দোষের (৩৫৩ পৃষ্ঠা)।

কেবল যে যবন হরিদাস মহাপ্রভুর শিষ্য হইয়াছিলেন তাহা নহে। কয়েকজন পাঠানকেও তিনি শিষ্য করিয়া সঙ্গে রাখিয়াছিলেন। অন্যান্য বহু যবনও তাঁহার শিষ্য হইয়াছিল। "পশ্চিমে আসিয়া কৈল যবনাদি ধন্য"। বিজুলী খান নামে একজন পাঠান বৈরাগী হইয়া মহাভাগবত উপাধি পাইল—

সেই বিজুলী খান হইল মহাভাগবত।
সর্ব্বতীর্থে হইল তাঁর পরম মহত্ব॥ (৪৩৮ পৃষ্ঠা)

এই মুসলমান ভক্তগণের যে মন্দির প্রবেশে কোন বাধা ছিল না, তাহা নিম্নলিখিত কয়েকটি পংক্তি হইতে জানিতে পারা যায়—

ভক্ত সব ধাঞা আইলা হরিদাসে নিতে—
"প্রভু তোমায় মিলিতে চাহে, চলহ ত্বরিতে"।
হরিদাস কহে—"আমি নীচ জাতি ছার,
মন্দির নিকটে যাইতে নাহি অধিকার।
জগন্নাথ সেবক যাঁহা স্পর্শ নাহি হয়
তাঁহা পড়ি রহোঁ,—মোর এই বাঞ্ছা হয়।"
এই কথা লোক গিয়া প্রভুরে কহিল
শুনিয়া প্রভুর মনে বড় সুখ হৈল। (৩৪২পৃঃ)

শ্রীযুক্ত বসন্তবাবু এই শ্লোক কয়টি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—"অস্পৃশ্য জাতীয় ব্যক্তি পরম ভক্ত হইলেও অস্পৃশ্যদের নিমিত্ত শাস্ত্র যে আচার নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা পালন করিবে—ইহাই মহাপ্রভুর অভিপ্রায়।"

কিন্তু ইহাই যদি মহাপ্রভুর অভিপ্রায় হইত তাহা হইলে তিনি এবং তাঁহার ভক্তগণ হরিদাসকে মন্দিরের মধ্যে আসিতে আহ্বান করিতেন না। মহাপ্রভু এবং তাঁহার ভক্তগণ যে যবন হরিদাসের মন্দির-প্রবেশ দোষণীয় মনে করিতেন না এবং সর্ব্বসাধারণের মন্দির প্রবেশের অধিকার স্বীকার করিতেন—তাহা ঐ শ্লোক কয়টি হইতে বেশ বোঝা যায়।

হরিদাসের কথা শুনিয়া "মহাপ্রভুর মনে সুখ হৈল"—ইহার ব্যাখ্যায় টীকাকার লিখিয়াছেন মহাপ্রভু—'হরিদাসের তাদৃশ দৈন্য শ্রবণে অতিশয় আনন্দিত হইলেন। এতাদৃশ দৈন্য ভক্তির পরিচায়ক"। বস্তুতঃ ইহাতে অন্ত্যজ বা যবন জাতির যে মন্দির প্রবেশের অধিকার নাই প্রভুর এরূপ মনোভাবের কোন পরিচয় নাই। তাহা হইলে হরিদাসকে মন্দিরে আহ্বান করিবার কোন অর্থই থাকে না। মহাপ্রভুর বাক্য এবং কার্য্য হইতে ইহাই স্পষ্ট অনুমিত হয় যে তিনি এবং তাঁহার সম্প্রদায় জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি মানিতেন না, তবে যদি কেহ প্রচলিত আচার নিয়ম প্রতিপালন করিতে চাহিত, তিনি তাহাতে জোর করিয়া বাধা দিতেন না। যেমন হরিদাসের একত্র বসিয়া ভোজনে আপত্তি করায় চৈতন্যচরিতামৃতকার স্পষ্টই বলিয়াছেন "মন জানি প্রভু পুনঃ না বলিল তাঁরে।" মন্দির প্রবেশ সম্বন্ধে যেমন, অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধেও তেমনি আর একটি দৃশ্য চৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই।

"তবে মহাপ্রভু আইলা হরিদাস মিলনে,
হরিদাস করে প্রেমে নাম সঙ্কীর্ত্তনে।
প্রভু দেখি পড়ে আগে দণ্ডবৎ হঞা
প্রভু আলিঙ্গন কৈল তাঁরে উঠাইয়া।
হরিদাস কহে—"প্রভু না ছুঁইও মোরে
মুই নীচ অস্পৃশ্য পরম পামরে।"

প্রভু কহে—"তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে,
তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থ স্নান,
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান।
নিরন্তর কর তুমি বেদ অধ্যয়ন,
দ্বিজ-ন্যাসী হৈতে তুমি পরম-পাবন।" (৩৪৩ পৃষ্ঠা)

ইহার পরই শ্রীমদ্ভাগবত হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—তাহার অর্থ—"যাঁহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বিদ্যমান রহিয়াছে, সে চণ্ডাল হইলেও পূজ্যতম। যেহেতু যাঁহারা তোমার নাম গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের তপস্যা, হোম, সর্ব্বতীর্থে স্নান, সদাচার এবং বেদ অধ্যয়ন করা হয়"।

এখানে হরিদাসের আপত্তি থাকিলেও প্রভু নিজে যে জাতিভেদ এবং অস্পৃশ্যতা মানিতেন না এবং তাঁহার এই মত যে শাস্ত্র ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়।

এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত চৈতন্যচরিতামৃতে আছে। মহাপ্রভু হরিভক্তি-বিলাসের যে শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়া রূপ ও বল্লভকে আলিঙ্গন করিলেন সেই ভগবদ্ উক্তির অর্থ এই—"চতুর্বেদাভ্যাসকারী ব্রাহ্মণ আমাতে ভক্তিশূন্য হইলে আমার প্রিয় হয় না, কিন্তু চণ্ডালও আমাতে ভক্তিমান হইলে আমার প্রিয় হয়। অতএব তাদৃশ ভক্তিমান বিপ্রের অভাবে তাদৃশ ভক্ত চণ্ডালই দানের পাত্র এবং তাহা হইতেই প্রতিগ্রহও করিবে। আর অধিক কি বলিব, সে ব্যক্তি আমার ন্যায় আদরের পাত্র।" (৪৪২ পৃষ্ঠা)।

এইরূপে মহাপ্রভু সনাতনকে আলিঙ্গন করিবার সময় উল্লিখিত শ্লোক এবং ভাগবত হইতে আর একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলেন। তাহার ভাবার্থ এই যে 'যজ্ঞ, দান, বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি দ্বাদশগুণযুক্ত ব্রাহ্মণ যদি ভগবৎ পদারবিন্দ হইতে পরাঙ্মুখ হয়, তবে তাহার অপেক্ষা যে মন বাক্য প্রাণ ভগবানে অর্পণ করিয়াছে তাদৃশ চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ। যেহেতু সেই চণ্ডাল কুল পবিত্র করে, কিন্তু সাতিশয় গর্ব্বিত সেই ব্রাহ্মণ আপনাকেও শুদ্ধ করিতে পারে না।'

বসন্তবাবু বলিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্যদেব বেদ পুরাণ মানিতেন—সুতরাং জাতিভেদও মানিতেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে শ্রীমদ্-ভাগবতে জাতিভেদের কথা অনেক স্থলেই আছে। কিন্তু এই ভাগবতের ও অন্যান্য শাস্ত্রের যে শ্লোকগুলি শ্রীচৈতন্য উদ্ধৃত করিয়া প্রকৃত ভক্তির নিকট জাতিভেদের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন তাহার দিকে বসন্তবাবু বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। প্রাচীন হিন্দু-সংস্কারকগণ মুখে কখনও বেদ ও পুরাণের অপ্রামাণিকতা স্বীকার করিতেন না—কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহাদের মত ও প্রদর্শিত পথ অনেক স্থলেই সনাতন ধর্ম্ম ও আচার হইতে ভিন্ন। চৈতন্যদেব বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ভক্ত চণ্ডালকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, ভক্তির নিকট বেদজ্ঞানকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার বেদে আস্থার দোহাই দিয়া তিনি জাতিভেদ স্বীকার করিতেন এইরূপ যুক্তি সমর্থন করা যায় না।

বসন্তবাবু চৈতন্যচরিতামৃতের আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছেন যে চৈতন্যের বেদ পুরাণ ও শাস্ত্রে অচলা নিষ্ঠা ছিল এবং তিনি জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা সম্পূর্ণ সমর্থন করিতেন। সমগ্র গ্রন্থের সাধারণ তাৎপর্য্য ও মূলতত্ত্ব এবং ভক্তির নিকট জাতিভেদের অসারতা প্রতিপাদনের জন্য যে সমুদয় অসংখ্য উপদেশ, দৃষ্টান্ত ও শাস্ত্রবাক্য আছে—তাহার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া বসন্তবাবু তাঁহার মত সমর্থনের জন্য নানাস্থান হইতে অসংলগ্ন কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। এক ব্যক্তি মহাভারত পাঠ শেষ করিয়া তাহা হইতে মাত্র এই শিক্ষা লাভ করিয়াছিল যে স্ত্রীলোকের একাধিক পতি থাকিতে পারে। বসন্তবাবুর চৈতন্যচরিতামৃতের বিশ্লেষণ দেখিয়া এই ব্যক্তির কথাই মনে পড়ে।

উপরে যে সমুদয় শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে মহাপ্রভু নিজে সর্ব্বজাতিকে স্পর্শ করিতেন, তাহাদের সহিত একত্র ভোজন করিতেন এবং তাহাদের—এমন কি যবনের মন্দির-প্রবেশের অধিকার স্বীকার করিতেন। তিনি প্রাচীন ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রের অনুযায়ী বিশ্বাস করিতেন যে, যে হরিভক্ত সেই পবিত্র এবং ভক্তিধর্ম্মের নিকট উচ্চজাতি নীচজাতির কোন ভেদ নাই। তিনি নীচজাতি, এমন কি যবনকেও ধর্ম্মে দীক্ষা দিয়াছেন এবং ভক্তি থাকিলে যবনও দ্বিজ সন্ন্যাসী হইতে শ্রেষ্ঠ ইহা তিনি মুক্তকণ্ঠে বারংবার বলিয়াছেন। মহাপ্রভুর সমগ্র জীবন ও উপদেশ স্মরণ করিলেও এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়।

ইহার পরেও যদি বসন্তবাবু বলেন যে শ্রীচৈতন্যদেব জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে ব্যবস্থাগুলি অমান্য করেন নাই এবং এ বিষয়ে তিনি শাস্ত্র মানিয়া চলিতেন—তাহা হইলে বসন্তবাবুকে প্রশ্ন করি যে চৈতন্যদেব যাহা যাহা করিয়াছিলেন তিনি নিজে এবং তাঁহার দলভুক্ত শাস্ত্রীয় আচার সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ তাহা করিতে প্রস্তুত আছেন কি? তিনি কি শূদ্র ও মুসলমানকে স্বীয় ধর্ম্মে দীক্ষা দিয়া তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত আছেন? তাঁহাদিগকে লইয়া এক সঙ্গে ভোজন ও মন্দিরে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে তাঁহার কোন আপত্তি আছে কি? ভক্তিশূন্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ, ইহা কি বসন্তবাবু বিশ্বাস করেন? আমরা বসন্তবাবুর উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

উপসংহারে আর একটি কথা বলিতে চাই। আমার ইতিহাসে আমি লিখিয়াছি—"Chaitanya did away with distinctions of Caste and one of his principal followers was a Mohammadan."—বসন্তবাবু ইহার প্রথমাংশ মাত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু এই অংশের অর্থ এরূপ নহে যে চৈতন্য সমগ্র হিন্দুসমাজ হইতে জাতিভেদ প্রথা তুলিয়া দিয়াছিলেন। ইহার অর্থ এই যে চৈতন্য নিজের সম্প্রদায়ে জাতিভেদ মানিতেন না। এই উক্তি যে সম্পূর্ণ সত্য তাহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই চৈতন্যচরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত শ্লোকগুলি পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীদিলবাহার রচিত শ্রীবিচিত্র শর্ম্মা চিত্রিত

পাগ্‌লাডাঙ্গা সাব্‌ডিবিসনের নবীন সাব-ডেপুটি মিঃ প্রদোষ-নাথ রায়ের চাকরি না করিলেও চলিত।

তাঁহার স্বর্গীয় পিতাঠাকুর মহাশয় বুদ্ধি খরচ করিয়া একমাত্র পুত্রের জন্য ব্যাঙ্কে জমার অঙ্কটি বেশ মোটা রকম ভারী করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। পৈত্রিক ভিটায় সন্ধ্যা দিবার জন্য এক পিসি ছাড়া বিশেষ কেহ না থাকায় প্রদোষ-নাথের ঘর-সংসার পাতা এখনও হইয়া ওঠে নাই।

সুতরাং সংসারে তাহার চিন্তার খোরাক জোটাইবার অন্য কোনও সহজ বস্তু না থাকায় অনেকগুলি আজগুবি দুর্ভাবনা প্রদোষনাথের মগজের ভিতর এক সঙ্গে ভিড় জমাইয়া তুলিল।

প্রথমেই তিনি ভাবিলেন, বদরপুর-জেলার তিনটি সাব্-ডিবিসন উঠাইয়া দিয়া মাত্র পাগ্‌লাডাঙ্গা সাব্‌ডিবিসনটি রাখিলে শাসন কার্য্যের অনেক সুবিধা হইত এবং খরচও বাঁচিত। কিন্তু আপাততঃ তাহার কোনও সম্ভাবনা না থাকায় চিন্তার স্রোত ভিন্নপথ ধরিল।

বাঙ্গালীর জাতীয় পোষাকের কথাই ধরা যাউক। ধুতি বর্জ্জনীয়, কি গ্রহণীয়—সে তর্ক না তুলিয়া ধুতিকে না হয় স্বীকার করিয়াই লওয়া গেল। কিন্তু কাছা ও কোঁচার আবশ্যক কি? নারীজাতি কাছা না দিয়াও এই প্রগতির যুগে পুরুষদের সহিত সমান পাল্লা দিয়া চলিয়াছে। লাঠি, সড়কী, তরবারী ইত্যাদির পুরুষোচিত ক্রীড়া ও নানাবিধ মল্লযুদ্ধে পারদর্শিতা দেখাইতেছে। পাশ্চাত্য দেশের নারীরাও সাধারণতঃ কাছা ব্যবহার করেন না। বিশেষতঃ বাঙ্গালার 'মেজরিটি' সম্প্রদায় বরাবর কাছা বর্জ্জন করিয়া আসিয়াছেন। আর কোঁচা একেবারে ইম্‌পসিবল্।

আচ্ছা, বাঙ্গালীরা পায়জামা পরিলে কিরূপ হয়? দেশী কাপড়ের কলগুলি ফেল্ হইবে। স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায় চটিবেন। হয়ত ইহা লইয়া তিনি এমন এক 'এজিটেশন্' আরম্ভ করিবেন, যাহা সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স আন্দোলনের প্রায় কাছাকাছি হইয়া উঠিবে। সরকার পর্য্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িবেন। শুধু তাহাই নয়, এই পরিকল্পনার মূল উৎস স্বয়ং আমি—ইহা প্রকাশ পাইলে—* * *

কল্পনা আর অধিক দূর অগ্রসর হইল না।

মিলের মোটা ধুতিগুলি কাটিয়া পায়জামা করা যাইতে পারে। ইহাতে কাপড়ের কলগুলিও বাঁচে, পোষাক সংস্কারও হয়। সংস্কারের যুগে ইহা একটি মস্ত বড় 'এ্যাচিভ্‌মেণ্ট' হইবে!

কিন্তু নাঃ! ইহাতেও বিপদ আছে।

কুসংস্কার-বর্জ্জন-বিরোধী বাঙ্গালীর দল দারিদ্র্যের দোহাই পাড়িবে। বলিবে, গরীব দেশে নূতন ধুতি কাটিয়া পায়জামা করার খরচ বেশী, দেশের অধিকাংশ লোকের পেটে ভাত জোটে না—।

সেই মান্ধাতার আমলের পুরাতন যুক্তি!! দারিদ্র্য, পেটে ভাত নাই, বস্ত্রহীন!

এদেশের আপাততঃ কিছু হইবে না। হতভাগ্যরা রবীন্দ্র-সাহিত্য যদি বা কেহ কেহ পড়িল, কিন্তু সকলে বুঝিল না। কবি স্বজাতির উন্নতির ও সংস্কারের সকল চেষ্টায় বিফলমনোরথ হইয়া অতি দুঃখেই বলিয়াছেন,—

"চিরদিন অর্দ্ধাশনে কেটে গেছে যায়
আজও তার অনশন হ'ল না অভ্যাস—"

হাল ছাড়িয়া দিয়া প্রদোষনাথ চেয়ারে হেলান দিয়া পড়িয়া একটি চুরুট ধরাইলেন।

চুরুটের ধোঁয়ায় বোধকরি মগজের আর এক পর্দ্দা

খুলিয়া গেল। তিনি চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিলেন—ইউরেকা! ওঃ! দি আইডিয়া! চাষ,—সায়েণ্টিফিক্ এগ্রিকালচার!

মানভুম জেলার গোমো রেলষ্টেশনের কিছু দূরে "দি ন্যাশন্যাল কৃষী (!) ফার্ম্মের" সাইন বোর্ডের ইতিহাসের মূলে কিন্তু এই ডেপুটিবাবুর চুরুটের ধোঁয়া!

সাইনবোর্ডের ঠিক নীচেই বড় বড় অক্ষরে'মটো' লেখা আছে—

"ক'ষে চালাও হল।
মাজায় পাবে বল।"

চ্যই, চ্যই, চ্যুঃ, চ্যুঃ

পূজার ছুটীতে মিঃ পি, এন, রায় তাঁহার গোমোর কৃষি ফার্ম্মের বাংলোয় আসিয়া আড্ডা গাড়িয়াছেন।

ফার্ম্মের প্রতি গাছপালা, জীবজন্তু, চেতন অচেতন পদার্থের সহিত ডেপুটিবাবুর নামের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ।

ডিপ্‌টিবাবুর বাগান, ডিপ্‌টিবাবুর চাষের ভিণ্ডি, মায় ডিপ্‌টিবাবুর গাইয়া—এখানকার নেটিবদের দৈনন্দিন আলোচনার বিষয়।

সকাল আটটা বাজিতে পাঁচ মিনিট বাকী। ইহার মধ্যে গুটিকয়েক দেশোয়ালী ছোকরার দল ডিপ্‌টিবাবুর বাগিচার এক কোণে কাঁটা তারের বেড়ার ধারে সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া আছে।

রোজ ঠিক এই সময়ে মিঃ রায় নিজহাতে তাঁহার আশ্রিত পালিত গাভীকে খাদ্য প্রদান করেন। ছোকরার দল তাহাই দেখিবে।

বাংলোর ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া আটটা বাজিতেই মিঃ রায় চায়ের টেবিলের উপর খবরের কাগজটি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। র‍্যাকের উপর হইতে টুপিটা মাথায় চড়াইয়া বাহিরের বারান্দায় আসিয়া হাঁক দিলেন,—"বাঙ্গা! এই বাঙ্গা!"

গোয়ালঘরের দিক হইতে উত্তর আসিল,—

"আইজ্ঞা, সব (অ) রেডি খোকাবাবু—" বাঙ্গা প্রদোষনাথের পৈত্রিক আমলের সম্পত্তি। ব্যাঙ্কের পাশ বহির সহিত উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁহার দখলে আসিয়াছে। সেই দাবীতে বাঙ্গা মিঃ রায়কে 'খোকাবাবু' বলিয়াই ডাকে, 'খোকা হাকিম' বলিতে পারে নাই।

মিঃ রায় বীর পদক্ষেপে গোশালার দিকে চলিলেন। পরিধানে খাকী সার্ট, হাফ্‌প্যাণ্ট, মাথায় সোলার টুপী, হাতে ছড়ি। তাঁহাকে দেখিয়া বেড়ার ওপারের অর্দ্ধনগ্ন ছোকরার দল বলিল, 'সেলাম সাব্।' মিঃ রায় ঘাড় নাড়িলেন।

গোয়ালঘরের সামনের খোলা জায়গায় একটি গাভী শৃঙ্খলিত অবস্থায় বাঁধা রহিয়াছে। তাহার শৃঙ্গদ্বয় একটি মোটা রশির দ্বারা বাঁধিয়া বাঙ্গা কষিয়া টানিয়া রাখিয়াছেন। মিঃ রায় প্রস্তুত হইতেই বাঙ্গা তাঁহার হাতে পুরা আট হাত বহরের এক লাঠি দিল। লাঠির মাথায় এক আঁটি বিচালি দড়ি দিয়া ভালভাবে জড়ান।

মিঃ রায় রাইবেঁশে নৃত্যের অনুকরণে লাঠির গোড়াটি শক্ত করিয়া ধরিয়া অগ্রভাগটি গাভীর মুখের দিকে আগাইয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুখে চুমকুড়ি দিতে থাকিলেন,—"চ্যই—চ্যই—চ্যুঃ—চ্যুঃ—হেট্—"

তাঁহার মদনমনোহর মূর্ত্তি দেখিয়া গাভী যত বা চার পা তুলিয়া শিং নাড়িয়া ফোঁস্, ফোঁস করে, মিঃ রায় ততই পেছন হটিয়া হাতের লাঠি বাগাইয়া ধরেন। এদিকে মুখে চুমকুড়ির বিরাম নাই—চ্যই—চ্যই—চ্যুঃ—চ্যুঃ—হেট্—এ্যাও!

কিছুক্ষণ এইরূপ কসরৎ করিবার পর গাভীটি প্রকৃতির তাড়না অনুভব [illegible] উর্দ্ধপুচ্ছ হইল।

মিঃ রায় দুইগজ হটিয়া আসিয়া হাঁকিলেন,—

বাঙ্গা! বাল্‌তি নিয়ে আয়; জল্‌দি করো, ফিপ্‌টি পারসেণ্ট্ নাইট্রেট। হুঁসিয়ার! যেন একটুও বরবাদ না হয়।

বাঙ্গা জবাব দিল,—হঃ।

সঙ্গে সঙ্গে পিছন হইতে চাপা হাসির খিল খিল শব্দ ভাসিয়া আসিয়া মিঃ রায়ের কানের ভিতর দিয়া মরমে হুল ফুটাইয়া দিল।

তিনি চেঁচাইয়া উঠিলেন,—"এ্যাও! শাট্‌আপ্।"

কিন্তু পিছন ফিরিতেই যাহা চোখে পড়িল তাহাতে মিঃ রায় শুধু বিস্মিত নহে, দস্তুর মত হতভম্ব হইয়া গেলেন।

অপরিচিতা তরুণীর কানের দুল দুইটি তখনও মৃদু মৃদু দুলিতেছিল। কয়েকটি প্রস্ফুটিত যূথিকা কোনও অনামী লতা পল্লবে অযত্ন গ্রথিত হইয়া তাঁহার অনাবৃত হাতের শোভা আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছিল।

তরুণী ফিক্ করিয়া হাসিলেন; হাত দুইটি কপালের কাছ বরাবর উঠাইয়া বলিলেন,—সুপ্রভাত, মিঃ রায়! নমস্কার!

মিঃ রায় যন্ত্রচালিতের ন্যায় হাত দুইটি কপালে ঠেকাইলেন। গলাটি সাফ্ করিয়া লইয়া বলিলেন—সুপ্রভাত! আপনি—আপনার—

তরুণী—এদিকে বেড়াতে এসেছিলাম। আপনার ফার্ম্মের সাইন বোর্ড ও মটো দেখে সোজা ভিতরে এসে পড়েছি। অনুমতি নেবার কথাটা আর ভেবে দেখিনি। এখন দেখছি ভাল করিনি, অনর্থক আপনাকে বিরক্ত কর্‌লুম।

মিঃ রায়—না, না, নেভার। এ আর এমন কি? কত লোকই ত এম্নি আসে। আর সত্য সত্য এ ত আর আমার 'প্রফেসন' নয়। সকলে আসুক—দেখুক, এই আমি চাই।

তরুণী—কিন্তু একটু বিরক্ত হয়েছেন বৈ কি? যে রকম 'শাট্ আপ্' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, ভাবলাম বুঝি হাতের বিচুলি বাঁধা লাঠিটা নিয়েই তাড়া করেন। যা ভয় হয়েছিল।

তরুণী আবার উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

মিঃ রায় অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন। বলিলেন—ছিঃ ছিঃ, কি যে বলেন আপনি! আপনি একজন ভদ্রমহিলা—ইয়ে—আমার অতিথি, না, এ আপনার ভারি অন্যায়, অবিচার!

তরুণী মুখ টিপিয়া হাসিল। হাসি তাহার একটা রোগ না কি?

সে বলিল—লাঠিটা কিন্তু এখনও হাতে আছে, মিঃ রায়।

মিঃ রায় কোনও উত্তর না দিয়া বেড়ার ওপারের ছোকরাদের লক্ষ্য করিয়া হাঁকিলেন,—

"এ্যাও! ভাগো হিঁয়াসে!"

সঙ্গে সঙ্গে হাতের বিচালী-বাঁধা বংশখণ্ড সবেগে উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া কাঁটা তারের বেড়ার ধারে গিয়া ঠেকিল।

তরুণী—আপনার ত ভারী রাগ, যদি ওদের লাগত।

মিঃ রায়—আপনি ত কেবল আমার রাগই দেখছেন। আমি অসভ্য, গেঁয়ো, রাগী, ভদ্রমহিলার গায়ে হাত তুলি—

তরুণী—কি কর্ব্ব বলুন। আপনার কৃষি ফার্ম্ম দেখতে এলুম; 'শাট্ আপ্' বলে রুখে দাঁড়ালেন। ছেলেদের লাঠি ছুঁড়ে মার্লেন। সত্য, আপনি বড় অল্পে চটে যান।

মিঃ রায়—বেশ।

তরুণী—রাগ কর্লেন না কি? আপনার গো-পালন ত দেখলুম। এখন বোধ হয় মুর্গী হাঁস ইত্যাদির পালা।

মিঃ রায়—ওঃ! আপনি 'পোলট্রি' মিন কর্চ্ছেন? না, সে সব কিছু এখানে নেই। শুধু চাষ। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আপনার কিছুই দেখা হবে না। আসুন, 'ঢেঁড়স'এর কাল্‌টিভেসন্ কি প্রণালীতে হয়, দেখবেন চলুন।

মিঃ রায় বাঙ্গাকে ঢেঁড়সএর ফাইল আনিতে বলিলেন। মিঃ রায় অগ্রগামী ছিলেন। গরুটির নিকট দিয়া

আইজ্ঞা, সব (অ) রেডি খোকাবাবু—

যাইবার সময় সে আর একবার প্রবলবেগে শিং নাড়িল। মিঃ রায় শব্দ করিলেন—চ্যাই–চ্যাই—চ্যুঃ—

আপনার ত এ দিকে বেশ টেষ্ট আছে দেখচি—

তরুণী পিছনে পিছনে আসিতেছিল। হাসি চাপিতে গিয়া বস্ত্রাঞ্চলে মুখ গুঁজিয়া বারকতক কাসির ভনিতা করিল।

একটু সামলাইয়া লইয়া সে প্রশ্ন করিল—গরুটি দেশী না বিলাতী?

মিঃ রায়—দেখতে পাচ্ছেন ভাগলপুরী গাই। গেল বছর হরিহর ছত্রের মেলায় খরিদ, তবু বললেন বিলাতী।

তরুণী—আমি গরু ভাল চিনি না, মিঃ রায়! তাই জিগ্যেস্ কল্লু‌র্ম। দিশি গরু কিনা, তাই আপনার 'য়ুনিফর্ম্ম' দেখে ভয় পায়।

মিঃ রায় রুমালে মুখ মুছিলেন। দুই-জনে ঢেঁড়সএর আবাদের নিকট আসিয়া পড়িলেন। বাঙ্গা ফাইল আনিয়া দিল। মিঃ রায় খাতা লইয়া পাতা উল্‌টাইতে লাগিলেন,—

"দেখুন, ১৯শে বৈশাখ বীজ খরিদ সাড়ে পাঁচ আনা; ২২শে বীজ বপন, ৩০শে অঙ্কুরোদ্গম, ২রা জ্যৈষ্ঠ মাপিয়া দেখা গেল সওয়া ইঞ্চি বাড়িয়াছে, ৪ঠা পাঁচটি গাছ পোকায় নষ্ট করিয়াছে, ৭ই—"

তরুণী বাধা দিল। বলিল, কিছু মনে কর্ব্বেন না, মিঃ রায়! হিসেব ঠিক হয় নি। পাঁচটি চারা নষ্ট হওয়ায় লোকসানের অঙ্কটিও সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া উচিত। আমার মতে প্রতি গাছে এক পো হিসেবে ফসল ধর্ল্লে মোট পাঁচপো ঢেঁড়স নষ্ট হয়েচে। কোল্‌কাতার বাজারে এর দাম কম পক্ষে দশ পয়সা।

মিঃ রায় সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে তাঁহার মাননীয় 'ভিজিটর' এর মুখের দিকে চাহিলেন,—

"আপনার ত এদিকে বেশ টেষ্ট আছে দেখচি। আপনি ঠিক ধরেচেন, কিন্তু একা সব পেরে উঠি না। একজন লেখাপড়া জানা—অথচ এ সব দিকে 'ইনটারেষ্ট' আছে এমন এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট রাখা দরকার দেখচি।"

এই যে মহর্ষি প্রদোষানন্দ স্বামী! বলি আশ্রমের

কুশল ত? এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট আবার কাকে রাখছ হে? চেলা খুঁজচ্ না কি?

বহু পরিচিত অথচ বিস্মৃতপ্রায় কণ্ঠস্বরে সচকিত হইয়া মিঃ প্রদোষনাথ মুখ তুলিতেই যতীন্দ্রনাথের সুপুষ্ট বাহুবন্ধনে ধরা পড়িলেন।

প্রদোষ—হ্যালো, যতীন্‌দা! আরে তুমি কোথা থেকে? কবে এলে, কোথায় উঠেচো?

যতীন। মানে? আমি ভেবেছিলাম এ প্রশ্নোত্তর-মালার সহজ ও সরল অভিনয় তোমাদের মধ্যে ইতিপূর্ব্বেই হয়ে গেছে। অন্ততঃ অনিতার সহিত তোমার কথাবার্ত্তার ধরণ দেখে আমার তাই মনে হয়েছিল।

স্বামীর মুখের প্রতি সহাস্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অনিতা জবাব দিল—প্রদোষবাবু আমাকে চিনতেই পারেন নি; তুমি এসেই সব মাটি করে দিলে?

যতীন। সে কি? চিন্তে পারেনি? অথচ এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট রাখা প্রভৃতি জরুরী পরামর্শ ত তোমার সঙ্গেই হচ্ছিল। তোমরা দুজনে আমাকে এপ্রিল-ফুল বানাচ্ছ না ত?

যতীন্দ্রনাথ হাসির উচ্চ কলরব তুলিল।

এবার হাসিবার পালা প্রদোষনাথের। কিন্তু তাহার কান্না পাইতেছিল। অত্যন্ত লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া প্রদোষনাথ কর-জোড়ে কহিল, বৌদি আপনার কাছে আমার অপরাধের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলেছে, মাপ চাইবার অধিকারও বোধ হয় আর নেই। কিন্তু আপনার চেহারারও বড় কম পরিবর্ত্তন হয়নি—বিশেষ আপনার চশ্‌মা—

—বিভ্রান্ত ক'রে তুলেছিল—যতীন্দ্রনাথ পাদপূরণ করিল। কিন্তু অপরাধের মাত্রা কি বল্‌ছিলে হে? একটা রোমান্টিক কিছু কোরে ফেলনি ত?

অনিতা রাগিয়া জবাব দিল—আহা! বয়েস যত হচ্ছে, ছেলেমান্‌ষি তোমার ততই বাড়্‌ছে—।

—অনু আমাকে একটু 'ভারিক্কি' গোছের দেখ্‌তে চায়, বুঝ্‌লে প্রদোষ; কিন্তু ওর সম্বন্ধে তোমার যা ধারণা দেখ্‌লেম—যাক্‌গে এখন একপেয়ালা চায়ের জোগাড় তোমার এই কলের লাঙ্গলের রাজত্বে হবে কি? না হয় বরং অনিতাকে উপস্থিত এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হিসাবে নিতে পার, আমার আপত্তি নেই।

অনিতা অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া ঈষৎ ভ্রুকুটি করিল।

প্রদোষনাথ উৎসাহের সহিত কহিল—বৌদি, যদি কিছু মনে না করেন, আমার সমস্ত সরঞ্জামই প্রস্তুত। চলুন বাংলোর বারান্দায় বসা যাক্।

পথ চলিতে চলিতে যতীন্দ্রনাথ বলিতে লাগিল—দীর্ঘ সাত বৎসর মগের মুল্লুকে কাটিয়ে মাতৃভূমির জন্য প্রাণটা

একটা রোমান্টিক কিছু কোরে ফেলনি ত?

একবার আনচান্ কোরে উঠ্‌ল। কারবারের দেখাশোনার ভার ভাইপোর হাতে দিয়ে সটান রওনা হওয়া গেল। গ্রামে কয়েকদিন কাটাবার পর অনিতার বাবার তাগিদ এলো—গোমোয় যাবার জন্য। তিনি এখানে 'এ্যান্টি-বেরিবেরি লজ্' তৈরী কর্চ্ছেন। কাল রাত্রের গাড়ীতেই সকলে এসে পড়েছি। তোমার ফার্ম্মের খবরটা গ্রামেই সংগ্রহ করেছিলাম। সকালে উঠে আমার একটু দেরী দেখে অনিতা আগেই বেরিয়ে পড়্‌ল; তারপর যা হয়েছে তোমরা দু'জনেই জান।

অনিতা বলিল—তারপর প্রদোষবাবু আমাকে ত চিন্তেই পার্লেন না, উপরন্তু—

প্রদোষ বাধা বলিল—বৌদি মাফ্ কর্ব্বেন, অপরাধ আপনার কাছে করেছি—দণ্ডও আপনার কাছ থেকে নেব, আশা করি।

অনিতা বলিল—কিন্তু মনে থাকে যেন দণ্ডাজ্ঞা শুনে পেছোবেন না।

যতীন বলিল, নিশ্চয় না। আমার এখনি গাইতে ইচ্ছে কর্চ্ছে—ক'রে থাকি অপরাধ, প্রেম ডুরি দিয়ে বাঁধ।

এইরূপ হাসি-তামাসার মধ্যে চা-পান শেষ হইল। অনিতা প্রদোষকে তাহাদের ওখানে সান্ধ্যভোজের নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল।

যতীন্দ্রনাথ ও প্রদোষনাথ পাশাপাশি খাইতে বসিয়াছিল।

গৃহস্বামী ব্রজনাথবাবু সম্প্রতি বেরি বেরি হইতে উঠিয়াছিলেন। রাত্রে ডাক্তারের নির্দ্দেশমত একটি আস্ত ভুট্টা ও আধপোড়া লাল আটার এক টুকরা রুটি খাইয়া থাকেন। তিনি জামাতা ও তাঁহার বন্ধুর সহিত বসিতে পারিলেন না।

গৃহকর্ত্রী অদূরে বসিয়া থাকিয়া মাঝে মাঝে এটা খাও, সেটা খাও, ফেলিয়া রাখিলে চলিবে না—ইত্যাদি অনুযোগ করিতেছিলেন। পরিবেশনের ভার পড়িয়াছিল, অনিতার ছোট বোন্ আরতির উপর।

যতীন। চিংড়ির মালাইটা বেড়ে হয়েছে অরু!

প্রদোষ। হুঁ! আপনার রান্না বড় চমৎকার!

আরতির সুন্দর মুখশ্রীতে কে যেন আবীরের পোঁচড়া টানিয়া দিল। সে তাড়াতাড়ি একহাতা গরম মাংসের ঝোল প্রদোষের হাতের উপর ঢালিয়া দিল। তারপর মাংসের পাত্রটা দুম করিয়া নামাইয়া রাখিয়া ছুটিয়া পলাইল।

পাশের ঘর হইতে অনিতা সব গোছাইয়া দিতেছিল, সে তাড়াতাড়ি আসিয়া আরতিকে রেহাই দিল।

এদিকে প্রদোষনাথের রুটিনের ক্রমেই গোলমাল হইতে লাগিল। সকাল আটটা বাজিলে তাহাকে ব্রজনাথবাবুর বাটীর চায়ের টেবিলে দেখা যাইতে লাগিল। ক্রমে সকাল বিকাল দুইবেলা।

চায়ের আসরে একদিন যতীন্দ্রনাথ বলিল, প্রদোষ আজকাল দু' পেয়ালার জায়গায় তিন পেয়ালায় উঠিয়াছে। লিভারের পক্ষে ওটা ভাল নয়।

প্রদোষ বলিল—লিভার বেচারার দোষ কি বল? বয়েসও ত কম হোলো না।

যতীন্দ্রনাথ নেচার ষ্টাডি বিদ্যায় বড় মজবুত। ইস্কুলে বরাবর ভাল নম্বর রাখিয়াছে।

গতিক দেখিয়া সে প্রদোষের পিসিকে এক পত্র লিখিল।

পিসির উত্তর আসিল, বাবা যতীন—আশীর্ব্বাদ করি তুমি জোড়া ব্যাটার মুখ দেখ। তোমার কল্যাণে 'পদুর' বাপ-পিতোমোর ভিটেয় যদি সন্ধ্যে-পিদিম পড়বার একটা উপায় হয়।

পত্র পড়িয়া যতীন মনে মনে বলিল. যেরূপ উৎসাহ দেখিতেছি—তাহাতে মাটীর পিদ্দিম দূরের কথা—প্রদোষ ভায়া পৈত্রিক ভিটায় এখন 'ডায়নামো' বসাইলেও আশ্চর্য্য হইব না।

তারপর? তারপর আর কি? অনিতা যাহা বলিয়াছিল তাহাই করিল, নিজ হাতে প্রদোষনাথের দণ্ডের ব্যবস্থা করিল। প্রদোষনাথ সে দণ্ডাজ্ঞা মাথা পাতিয়া লইল।

গোমোর ন্যাশন্যাল কৃষি ফার্ম্মের সাইন বোর্ডের স্থলে এখন সুদৃশ্য মার্ব্বেল পাথরে লেখা হইয়াছে—"প্রদোষ-আরতি"।

ঢেঁড়সএর আবাদ উঠাইয়া দিয়া প্রদোষনাথ এখন গোলাপের গুল-কলম ও জোড়-কলম লইয়া মাতিয়াছে।

বিরহ-মিলন কথা

শ্রীহীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কাঁচা সোণার রঙের চা ঝকঝকে কাঁচের পেয়ালায় পরিপূর্ণ হ'য়ে টলটল ক'রচে, বিজন পেয়ালাটা হাতে নিয়ে নিঃশব্দে চায়ের পেয়ালার গায়ে আঁকা সূর্য্যাস্তের দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে রইল। চুমুক দিয়ে নিঃশেষ ক'রতে যেন মায়া হ'চ্ছে। সাধ যাচ্ছে—মিনিটের পর মিনিট এর দিকে চেয়ে থাকতে। কিন্তু অবশেষে সৌন্দর্য্যের পিপাসা কণ্ঠের পিপাসার কাছে হার মানল। বিজন পেয়ালাটা মুখের কাছে তুলে নিয়ে ধীরে সুস্থে রসাস্বাদ ক'রে ক'রে চা খেতে লাগল। আর মনে মনে ধন্যবাদ দিল তাকে, যে তারই জন্যে খুব যত্ন ক'রে এমন চমৎকার চা তৈরী ক'রেছে।

এমনি সময় উনিশ কুড়ি বছরের একটি অতি সুশ্রী মেয়ে সলজ্জ হাস্যে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। তার পরণে একখানি আটপৌরে খদ্দরের শাড়ী এবং গায়ে হাতকাটা ডিসেণ্ট ব্লাউজ। হাতে চারগাছা ক'রে সরু সোণার চুড়ি ছাড়া আর কোন অলঙ্কার চোখে পড়ে না, তবে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য ক'রলে চোখে পড়ে—তার গলায় সোণার হারের একটুখানি চিক চিক ক'রছে। কালো নরম চুলগুলির অগোছালো খোঁপা ঘাড়ের উপর খুব আলতোভাবে ছুঁয়ে র'য়েছে; সবিতার স্নেহ-স্নিগ্ধ কণ্ঠের আহ্বানে মেয়েটি ঘরে এসে ঢুকল। বিজন চায়ের পেয়ালা হাতে ও মুখো হ'য়ে ব'সেছিল ব'লে তারা পরস্পরের মুখ দেখতে পেলে না—কিন্তু বিজন এই উপস্থিতির প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত অনুভব ক'রে প্রথমে কেমন যেন সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠল।

এইবার সবিতার মুখে হাসি দেখা দিল। বিজনের দিকে চেয়ে সকৌতুকে হেসে বললে—'হাঁরে বিজন, একে চিনিস?'

বিজন ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে একবার মেয়েটির মাথা থেকে পা অবধি দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। সে দেখা নিমিষের জন্য। তথাপি তার মনে হোল, এইমাত্র যাকে সে দেখলে তার রূপ আছে, সে সুশ্রী, শুধু এই কথা বললে যেন তার দেহ-সৌন্দর্য্যের তিলার্দ্ধ পরিচয়ও দেওয়া হয় না। সে দেহ সুন্দর নয় সে দেহ আশ্চর্য্য। চিরকাল সে নারীকে অবজ্ঞায় পাশ কাটিয়ে গিয়েছে—জীবনে তাদের কোন প্রয়োজন স্বীকার করেনি; কিন্তু আজ এই মুহূর্ত্তে তার বিস্ময় মুগ্ধ মন ব'লে উঠল—এমন মেয়ের পরম প্রয়োজন হয়তো পুরুষের জীবনে থাকতে পারে—যার দ্বারা সে ফলবান হয়, সমৃদ্ধ হয়। আর মেয়েটির দুটি চোখ। টুর্গেনিভের নায়কের মত তার মনে হোল—Oh what glorious eyes she has!

'চিনি' ব'লে বিজন মেয়েটির দিকে চেয়ে হেসে বললে—'এতক্ষণ দিদির কাছে আপনার অসংখ্য গুণের কথাই শুনছিলাম, কিন্তু একটি গুণের পরিচয় এরই মধ্যে পেয়েচি। আপনি চমৎকার চা তৈরী ক'রতে পারেন।'

মেয়েটির সুশ্রী মুখখানি সরমে রাঙা হ'য়ে উঠল। সবিতার মুখের দিকে চেয়ে অভিযোগ ক'রে ব'ললে—'কাকীমা, তুমি তো বেশ। আমার নামে বুঝি যা তা বলা হোয়েচে? লোককে অপ্রস্তুত ক'রতে তুমি একখানি।' বিজনের দিকে চেয়ে বললে—'কাকীমার কথা আপনি শুনবেন না - কিন্তু! আমাকে খুব স্নেহ করেন ব'লেই আমার সম্বন্ধে এই সব বলেচেন। আসলে তা সত্য নয়।'

সবিতা হেসে বললে—'ইস্ আবার বিনয় হোচ্চে। তুই তো এখন পালাচ্চিস নে—দেখবি আমার সব কথা সত্যি কি না।'

বিজন হেসে বললে—'কিন্তু একটি অভিযোগ আপনার কাছে আমার করবার আছে। ভরসা দেন তো করি।'

মাধবী হেসে বললে—'বলুন আপনার কি অভিযোগ।'

'দিদি তখন বলছিলো' বিজন হেসে বললে—'আপনারা ছুটি দিচ্চেন না ব'লেই দিদি শিলঙে আমার কাছে যেতে পারচে না। এ কিন্তু আপনার ভারি অন্যায়। দিদিকে দুদিন ছুটিও দেবেন না?'

'দেব না তো বলিনি। আপনার দিদিকে ছুটির জন্যে দরখাস্ত ক'রতে ব'লবেন।'

'দরখাস্ত করলেই ছুটি দেবেন তো?'

'তা এখন কী ক'রে বলবো? দরখাস্ত হাতে পেলে সে সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাবে' মাধবী বললে। 'তবে মনে

হয় আপনার দিদির দরখাস্ত মঞ্জুর হবে, কারণ এতদিন দিদির কাজ খুব সন্তোষজনক হোয়েচে।'

বিজন হো হো ক'রে হেসে উঠল। মেয়েটির এই চমৎকার সপ্রতিভ কথাবার্ত্তা, এই কুণ্ঠাহীন ব্যবহার—সমস্ত মিলিয়ে মনটা কী এক অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে কাণায় কাণায় ভরে উঠল; কোন মেয়ের সঙ্গে কথা ব'লে যে আনন্দ পাওয়া যায় তা আজ এই প্রথম জানল।

সবিতা খুসি হোয়ে বললে—'রাণীর সঙ্গে তুই কথায় পেরে উঠবিনে।'

'শুধু কথায় কেন' বিজন হেসে বললে। 'অনেক বিষয় ওঁর শ্রেষ্ঠত্ব সানন্দে স্বীকার করচি।'

মাধবীও তৎক্ষণাৎ বললে—আমিও কাকীমা সবিনয়ে এ কথার প্রতিবাদ করচি।'

সুটকেস থেকে যে বইখানি বার ক'রে বিজন বিছানার উপর রেখেছিল মাধবী সেই বইখানি দেখতে পেলে। কৌতূহলী হ'য়ে বললে—'বইখানা একবার দেখতে পারি?'

'অনায়াসে' বিজন তার হাতে বইখানি তুলে দিল।

মাধবী মুহূর্ত্তে তার কয়েকখানি পাতা উল্টিয়ে দেখে বিজনকে মৃদুকণ্ঠে বললে—'আপনি বুঝি জোরোম-কে-জোরোম-এর ভক্ত?'

প্রশ্নটা অকস্মাৎ বিজনকে আঘাত করল। মাধবীর সঙ্গে আলাপ হবার পর তার সুশ্রী দেহ, তার কুণ্ঠাহীন ব্যবহার এবং নিঃসঙ্কোচে আলাপের শক্তি তাকে কিছুক্ষণের জন্যে ভুলিয়ে রেখেছিল—সে নারীবিদ্বেষী। কিন্তু এই মুহূর্ত্তে মাধবী যখন তার সঙ্গে সাহিত্য নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হোল তখন অকস্মাৎ তার মনে হোল—তাই তো আমি যে নিজের অজ্ঞাতেই এই মেয়েটিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ফেলেছি তার ব্যবহারে প্রীত হ'য়ে। স্বীকার করি মেয়েটি সুশ্রী, তার কথাবার্ত্তা ব্যবহার মধুর, গল্প ক'রে তার সঙ্গে সুখ আছে; এ ছাড়া আর তার মধ্যে কী আছে—যাতে আমি শ্রদ্ধা জানাতে পারি? আমার মধ্যে এ দুর্ব্বলতা এলো কোথা থেকে? আমার মুখের শ্রদ্ধাকে সত্য মনে ক'রে মেয়েটি আমার সঙ্গে সাহিত্য পর্য্যন্ত আলোচনা ক'রতে প্রবৃত্ত হোল। বিজন আর নিজের এই দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিল না, নিজেকে জোর ক'রে এই ব'লে উত্তেজিত ক'রতে লাগল, এই যাই হোক মেয়ে তো—কাজেই এর মধ্যে এমন কিছু পদার্থ নেই যাতে সে শ্রদ্ধাবান হবে! আর পড়াশুনা? তাও তার কতটুকু আছে? কখানা বই প'ড়েছে? প'ড়লেও কতটুকু বুঝেছে যে তার সঙ্গে সাহিত্য আলোচনা ক'রবে? সাহিত্য নিয়ে সত্যকার আলোচনা ক'রতে গেলে যে বিচার বুদ্ধি, পড়াশুনা ও সূক্ষ্ম রসবোধ থাকা প্রয়োজন তা কি কোন নারীর মধ্যে থাকা সম্ভব? এ তো সামান্য। আই-এ পাশ ক'রে দুচারখানা নামকরা বইয়ের প্রথম ও শেষের কয়েকখানা পাতা মানে না বুঝে প'ড়ে ভেবেছে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করবার অধিকার তার আছে। কী নির্ব্বুদ্ধিতা! বিজন মনে মনে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসবার চেষ্টা ক'রল। সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করবার মত জ্ঞান থাকা ত দূরের কথা- ওকে যদি জিগ্‌গেস করা হয়, হাওড়া ষ্টেশনে তুফান মেল পৌঁছতে কিছু বিলম্ব হ'তে পারে—এর ইংরেজি কি? তা কি ঠিক ক'রে ও ব'লতে পারে? হয়তো এইটুকুর মধ্যে কতকগুলো গ্রামারের ভুল করে বসবে। এই রকম করে মনে মনে তার শ্রদ্ধা বুদ্ধিকে তুচ্ছ হীন ক'রে, নিজের দুর্ব্বলতা কাটিয়ে, মেয়েটির বিরুদ্ধে নিজেকে জোর ক'রে সে উত্তেজিত ক'রতে লাগল এবং মাধবীর প্রশ্নের উত্তরে এমন কথা ব'লবে স্থির ক'রল, যাতে আর কথাটি কইতে না পারে। বললে—জোরোম-কে-জোরোম এর ভক্ত? আমি? মোটেই না। ওরকম বাজে রসিকতা আমার অসহ্য মনে হয়।'

মাধবী তার মুখের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে রইল।

'চুপ ক'রে রইলেন কেন?'

'কি বলবো বলুন' মাধবী মৃদু হেসে বললে: 'ওর অসহ্য রসিকতাকে ভাল ব'লে তো আপনাকে সহ্য করাতে পারবো না।'

'আপনার কি সত্য ওর লেখা ভাল লাগে?'

'হাঁ' মাধবী মৃদুকণ্ঠে বললে: 'শুনে বোধ হয় আমার রসবোধের ওপর অশ্রদ্ধা হোল?'

'না, তা হবে কেন' বিজন হেসে বললে: সত্য এ আমি ধারণাই ক'রতে পারি না যে কোন গভীর চিত্ত রসিকের জোরোম-কে-জোরোম এর হিউমার সহ্য হয়।'

মাধবী হেসে বললে: 'আমি কিন্তু এমন অনেক ভাল লোককে জানি, যাঁরা জোরোম-কে-জোরোম খুব পছন্দ করেন।'

বিজন ভাবলে পরীক্ষা করবার এই ঠিক সময়, বললে: 'কেন করেন বলতে পারেন?'

'আমার মনে হয় অনাবিল হাস্য রসের খোরাক ওর লেখায় খুব বেশি পরিমাণে মেলে ব'লেই অনেকের কাছে ও এতো প্রিয়'—মাধবী বিনা দ্বিধায় ব'ললে। 'বড় বড় লেখকের চিন্তার সঙ্গে পরিচয় ক'রতে ক'রতে মন যখন ক্লান্ত অবসন্ন হ'য়ে পড়ে, তখন সেই ক্লান্তি অবসাদকে দূর ক'রতে মানুষ চায়। জোরোম-কে-জোরোম-এর লেখা তখন মনকে সাময়িক নির্ম্মল রসের আনন্দে ডুবিয়ে রাখে, এই জন্যই তাকে ভাল লাগে, এই তো আমার মনে হয়।

বিজন এইবার একটুখানি বিস্মিত হোল। তার সম্বন্ধে যে ধারণা মনে দৃঢ় ক'রে তোলবার প্রয়াস করছিলো তা করা হয়তো উচিত নয়। যতটা তাচ্ছিল্য তার বিদ্যা বুদ্ধিকে মনে মনে ক'রেছিলো, অতটা না ক'রলেই হয়ত ভালো হোত। যদিও মাধবীর ঐ কথার মধ্যে জ্ঞানের নির্ম্মল দীপ্তি কিছু ছিল না, তার প্রকর্ষ-চিত্তের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য-বোধের পরিচয়ও সে পায়নি—তথাপি তার মনে হোল, মেয়েটির বোধশক্তি আছে। যা নিজে ভাল বুঝেছে, জেনেছে—পরের প্রতিকূল সমালোচনায় নিজের সেই বোঝার বিশ্বাসকে হারাতে চায় না। এটা কম কথা নয়। ভাল লেখকের বই তো সকলেই পড়ে, কিন্তু দুটি একটি কথার মধ্যে সেই লেখকের লেখার পরিচয় এমন ক'রে দিতে পারে কি কেউ—যদি তার রস গ্রহণের ক্ষমতাও বোধশক্তি না থাকে। বিজনের মন ভারি খুশি হোয়ে উঠল। যখন তার স্বভাবসুলভ বিদ্বেষ জোর ক'রে মাধবীর বিরুদ্ধে মনকে উত্তেজিত ক'রতে চেষ্টা ক'রছিল, তখন বুকের যেন কোন নিভৃত স্থান মেয়েটির জন্য বেদনায় আতুর হ'য়ে উঠছিল। যতই নারী বিদ্বেষ তার থাক না কেন, তবু আজ তার মন মেয়েটিকে সহজভাবে গ্রহণ করবার জন্যে অপ্রত্যাশিত-ভাবে লালায়িত হোয়ে উঠল। বিজন মনে মনে আরাম বোধ করলে এই ভেবে—যে আর তার বিরুদ্ধে মনকে অশ্রদ্ধান্বিত ক'রতে হোল না। করলে আজ সে হয়তো সত্যই দুঃখবোধ করতো।

মাধবীর কথার উত্তরে বিজন বললে—'এক সময় ছিল, যখন ওকে আমার ভাল লাগত। এখন আর তেমন লাগে না।'

'তবে কেন সঙ্গে নিয়েছেন?'

'তাড়াতাড়ির মাথায় গোলমাল হোয়ে গেছে'—বিজন এখন আর সত্য কথা স্বীকার করতে পারলে না; বললে—'যাক্ ওকথা। আপনার বুঝি পড়াশুনা করার অভ্যাস আছে?'

'সামান্য—সে না থাকারই মধ্যে'—মাধবী সলজ্জে বললে। 'সময় তো কাটাতে হবে।'

সবিতা এই সময় তাদের কাছে এলো। হেসে বললে—'ইস্ সামান্য বৈ কি। রাণী ঠিক তোর মতন। বই পড়তে পেলে আর কিছু চায় না। কত টাকা আমার কাছ থেকে নিয়ে বই কিনে যে বাজেখরচ ক'রেচে তার আর ইয়ত্তা নেই। আমার কিন্তু মোটেই ভাল লাগে না। মেয়েমানুষ এত বই পড়ার সখ কেন বাপু। কি বলিস তুই?'

বিজন গম্ভীর হোয়ে বললে—'ঠিক কথা। খুন্তি আর বেলুন যার হাতে শোভা পায়, বই হাতে করাটা তার পক্ষে বেয়াদপি। নেহাৎ কাকীমা ব'লে রক্ষা পেলেন, নইলে আপনাকে ক্রিমিনাল চার্জ্জে পড়তে হোত।'

মাধবী হাসতে হাসতে বললে: 'তা ঠিক। কাকীমা যদি হার হিটলারের মত বাঙ্গালা দেশে ক্ষমতা পেতেন, তাহ'লে বেথুন, ডায়োসেসন, আর সব মেয়েদের স্কুলগুলা রাতারাতি নিলামে উঠত।' সবিতার দিকে চেয়ে বললে: 'বাঙ্গালা দেশ থেকে স্ত্রী-শিক্ষা একেবারে তুলে দিতে—না কাকীমা?'

'দিতুমই তো' সবিতা বললে: 'তোর মত গণ্ডা গণ্ডা পতুয়া মেয়ে নিয়ে সংসারের কী উপকার হবে রে? বই প'ড়ে প'ড়ে এমন হ'য়েচিস, যে গায়ে এক ফোঁটা শক্তি নেই। কোন কাজ একা করতে পারবি নে, আমাদের মত কোন কালে খাটতে পারবি? নেহাৎ কপাল ভাল, তাই অজানা অচেনা—'

ব'লেই মাধবীর তীব্র কটাক্ষে সবিতা অকস্মাৎ থেমে গেল। মাধবী আরক্ত মুখখানি নত ক'রলে। বিজন একবার মাধবীর দিকে, একবার সবিতার দিকে বিস্মিত হ'য়ে চাইলে। কিন্তু তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে এই দুটি নারীর মধ্যে যে নাটকের অভিনয় হোল, তা বিন্দুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করা তার পক্ষে সম্ভব হ'ল না।

তারপর একথা সেকথার পর সবিতা বললে: 'আর

তো আমি ব'সতে পারিনে, নীচে অনেক কাজ প'ড়ে র'য়েচে। তোরা দুজনে তাহ'লে গল্পগাছা কর আমি যাই'—ব'লে সবিতা দরজার দিকে এগিয়ে গেল। মাধবী আর বিজন অত্যন্ত লজ্জিত হ'য়ে সবিতার অনুপস্থিতির পর কী ভাবে পরস্পরের সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হবে এই সমস্যায় স্তব্ধ হোয়েছিল, ঠিক সেই সময় সবিতা ফিরে দাঁড়িয়ে বললে: 'ভাল কথা, হাঁ রাণী—ক্ষিতি কোথায়? আজ সকাল থেকে তো তার চুলের টিকি পর্য্যন্ত দেখতে পাইনি। গেল কোথায় সে?'

'কোথায় আবার যাবে? শৈবালদার বাড়ী কেরম খেলচে' মাধবী বললে—'তার তো ঐ এক খেলা। রাত নেই, দিন নেই, কেবল খট্ খট্। কী ক'রে যে ভাল লাগে।'

মাধবীর কথার উত্তরে কি একটা ব'লতে গিয়ে সবিতা থেমে গেল। জুতার ভারি শব্দ করতে করতে কে যেন সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আসছে। সবাই চকিত ও কৌতূহলি হোয়ে দরজার দিকে তাকাল। সবিতা এগিয়ে গিয়ে দরজার বাইরে মুখ বাড়িয়ে স্নিগ্ধকণ্ঠে আহ্বান করলে—'এই যে শৈবাল, এসো—এসো।'

'হাঁ কাকীমা—রাঙ্কু কোথায়? তার যে সকাল বেলা আমার কাছে যাবার কথা ছিল যায়নি কেন, জানেন?' বলতে বলতে শৈবাল ঘরের সামনে এসে কুণ্ঠিতা মাধবীর দিকে চেয়ে বললে—'বেশ! আমি তোমার জন্য বাড়ীতে ঠায় ব'সে আছি, আর তুমি দিব্বি নিশ্চিন্দি হ'য়ে এখানে গল্প ক'রচো। তোমার না সকাল বেলা আমার বাড়ী যাবার কথা ছিল, রাঙ্কু? যাওনি যে বড়?'

মাধবীর চোখমুখ পলকে রক্তবর্ণ হ'য়ে উঠল। তার হ'য়ে জবাব দিল সবিতা। বললে—'আমার ভাই এসেচে কিনা, তাই তাকে ফেলে আর যেতে পারেনি। এই যে আমার ভাই বিজন। যার কথা তোমাদের প্রায়ই গল্প করতুম।'

'ও' বলে শৈবাল দুটি হাত যুক্ত ক'রে কপালে ঠেকিয়ে বললে—'বড় সুখী হোলুম পরিচয় ক'রে।'

'আমিও' বলে বিজন হেসে নমস্কার করলে।

'বসুন।'

'হাঁ, বসি।'

সবিতার সবচেয়ে দুর্ব্বলতা ছিল বিজনের সম্বন্ধে। ইতিপূর্ব্বে বহুবার বিজনের পরিচয় সে তাদের দিয়েছে এবং বলতে গেলে জিনিষটা সকলের কাছেই পুরাণো ও একঘেয়ে হ'য়ে উঠেছিল, দুর্ব্বলতার আধিক্যে সবিতা একথা বুঝত না। বিজন ও শৈবালের মুখোমুখি পরিচয় করিয়ে দিয়ে সবিতা আবার টাটকা ক'রে বিজনের পরিচয় দিতে গেল শৈবালকে। বলা তো যায় না—যদি ভুলে গিয়ে থাকে। সবিতা বলতে লাগল—বিজন শিলঙে খুব মোটা মাইনের চাকরী করে, একদিন সে ঐ আপিসের সর্ব্বেসর্ব্বা হবে, তখন তার মাইনের টাকার পরিমাণটাও হবে খুব লোভনীয়। তার ইউনিভার্সিটি কেরিয়র আশ্চর্য্য— অনেক বই পড়েছে। গান বাজনাতেও তার চমৎকার দখল; আবার এদিকে খামখেয়ালিতে ও তার জোড়া নেই। একই মানুষের মধ্যে এত রকম দুর্লভ গুণের সমাবেশ—ইত্যাদি ইত্যাদি।

উচ্ছ্বসিত প্রশংসার স্রোত আর হয়তো অনেকখানি এগোতে পারত কিন্তু বিজন আর স্থির থাকতে পারল না। কথার মাঝখানেই বাধা দিয়ে বললে—'দিদি, দোহাই আর এভাবে আমাকে শাস্তি দিয়ো না। তোমার চেয়ে এঁর বিদ্যে বুদ্ধি কোন অংশেই কম নয়। তোমার সার্টিফিকেট ছাড়াও ইনি এ রত্নটিকে যাচাই ক'রে নিতে পারবেন' শৈবালের দিকে চেয়ে হেসে বললে। 'আশা করি নারী-চরিত্রে আপনার কিছু অন্তর্দৃষ্টি আছে। থাকলে নিশ্চয় বুঝতে পারছেন—আমার এই দিদিটি অতুক্তি ক'রতে অদ্বিতীয়।'

শৈবাল হাসতে লাগল। কোন কথা বললে না।

মাধবী হেসে বিজনের মুখের উপর দুটি চোখ রেখে মিষ্টি গলায় বললে—'বিনয় করতে আপনিও কিন্তু অদ্বিতীয়।'

'কি রকম?'

'তা নয়তো কি? কাকীমা এখন আপনার সম্বন্ধে যা বললেন, তাতে তো আপনার খুব সাধারণ পরিচয়গুলোই দেওয়া হ'ল। একে ঘটা ক'রে অত্যুক্তি বলে আর বিনয় করচেন কেন?'

'আমার আবার অসাধারণ পরিচয়ও আছে নাকি?'

'আছে বৈ কি' মাধবী মুখ টিপে হেসে বললে—'আর সে পরিচয় কাকীমা আমাকে আগেই দিয়েছেন।'

'দিদি বেশ' বলে মাধবীর দিকে চেয়ে বললে— আপনি দিদির কথা বিশ্বাস করেন?'

'করি'

'তাহ'লে আপনার কাকীমা মোটেই অত্যুক্তি করেন না, এই আপনার বক্তব্য' বিজন বললে। 'কিন্তু একটু আগে আপনার কাকীমাটি যখন আপনার প্রশংসাপূর্ণ পরিচয় দিলেন, তখন জোর করে সেটাকে অত্যুক্তি ব'লে অমন সরবে রাঙা হ'য়ে উঠলেন কেন?'

মাধবী আরক্তমুখে কি ব'লতে গেল, বিজন বাধা দিয়ে বললে—'দয়া ক'রে বিনীত কথার বাণে জর্জ্জরিত ক'রবেন না। কিন্তু দিদি একটু ভুল করলে। আপিসে মোটা মাইনের চাকরী করি, এই গদ্যময় কথাটার বদলে বাপের পয়সায় দেশভ্রমণ করে বেড়াই এই কথাটা বসিয়ে দিলেই তো তোমার কৃপায় একেবারে দিলীপকুমার রায়ের উপন্যাসের নায়ক হ'য়ে উঠতে পারতাম।'

মাধবী খিল খিল ক'রে হেসে উঠল। শৈবালও হাসতে লাগল। শৈবাল ও মাধবী দুজনেই যখন হাসছে তখন বিজন নিশ্চয় একটা হাসির কথা ব'লেছে—সবিতা এমন ক'রে হাসতে লাগল যেন ঐ কথাটার রস সেই একা বুঝেছে। এই হাসির ফাঁকে শৈবাল নিমেষের মধ্যে আড়-চোখে দেখে নিলে মাধবী আনন্দ দীপ্ত মুখে একান্ত কৌতূহলী দৃষ্টিতে বিজনের মুখের দিকে চেয়ে তার প্রত্যেকটি কথার রস অনির্ব্বচনীয় আনন্দে উপভোগ করছে। আর তার দেহের প্রতিটি ইন্দ্রিয় উন্মুখ হোয়ে রয়েছে—বিজনের কথা শোনবার জন্য। আর একটা জিনিষ অতি সহজেই তার চোখে প'ড়লো, তা হ'চ্ছে বিজনের সঙ্গে মাধবীর আচরণ। সে আচরণে কোন বাধা নেই, বিঘ্ন নেই, লজ্জা নেই, যেন কত দিনের পরিচয় এমনি সহজ নিঃসঙ্কোচ, অনায়াসে তার কথা-বার্ত্তা ব্যবহার। এ সেই মাধবী, শৈবালের মুহূর্ত্তের মধ্যে স্মরণ হ'ল - লজ্জায় যে কারও সঙ্গে মুখ তুলে কথা পর্য্যন্ত ব'লতে পারত না। আজ হঠাৎ তার এমনতর পরিবর্ত্তন হ'ল কী ক'রে। শৈবাল এটাকে কিছুতেই সহজভাবে গ্রহণ ক'রতে পারলে না। এদিকে বিজনের রসিকতায় ও মাধবীর হাসিতে ঘরের আবহাওয়া চঞ্চলিত, মর্ম্মরিত হ'য়ে উঠল।

হাসি পরিহাস থামলে পর বিজন শৈবালকে বিনীতভাবে বললে: 'কিন্তু আপনার পরিচয় তো পেলাম না'। তারপর মাধবীকে বললে: 'এঁর পরিচয় আমাকে দিন!'

মাধবী রাঙা হ'য়ে দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে ব'লে উঠল—'আমি—আমি কি ব'লবো। ইনি—ইনি, বাঃ আপনি কাকীমাকে—বলো না তুমি কাকীমা।'

তার এই অসংলগ্ন কথায় বিজন অত্যন্ত বিস্মিত হ'ল। শৈবালের পরিচয় দিতে মাধবীর এমনতর লাজরক্ত কুণ্ঠা প্রকাশ পেলে কেন? বিস্ময়ের ভাবটা মুহূর্ত্তে কাটিয়ে বললে—'কাকীমা, কেন আপনি বলুন না।

ওঁর পরিচয় দিতে এত কুণ্ঠিত হ'চ্চেন কেন?'

'বাঃ কুণ্ঠিত হব কেন' মাধবী নিবিড় লজ্জা গোপন করবার প্রয়াস ক'রে জোর ক'রে মৃদু হাসি ফুটিয়ে বললে। 'ও সব কাকীমাই ভাল পারে। আমার তেমন—'

বিজন আর তাকে কিছু না ব'লে সবিতার দিকে তাকালে। ঐ দীর্ঘায়তন সুশ্রী যুবকটির পরিচয় জানবার জন্য সে অত্যন্ত উৎসুক হ'য়ে উঠেছিল। সবিতা পরিচয় দেবার উপক্রম ক'রতেই শৈবাল অকস্মাৎ বাধা দিয়ে বললে—'আমার পরিচয় জানবার জন্য ব্যাকুল হবার কোন কারণ নেই। সে এক সময় শুনলেই হবে।'

বিজন সে কথা কাণেই দিল না। উৎসুক হ'য়ে শৈবালের পরিচয় দেবার জন্য সবিতাকে জোরে তাগিদ দিল। শৈবাল বাধা দিয়ে বললে—'মিনতি করচি, আমাকে এখানে আর অপ্রস্তুতে ফেলবেন না। দেবার মত পরিচয় আমার কিছুই নেই। যেটুকু আছে—তা আপনার পরিচয়ের পাশে নিতান্ত নিষ্প্রভ মনে হবে।'

অজ্ঞাতে শৈবালের কণ্ঠস্বরে যে অভিমান ধ্বনিত হ'য়ে উঠল তার নিগূঢ় মর্ম্ম একজন ছাড়া কেউ হৃদয়দম ক'রতে পারলে না। বিজন লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে চাইলে। বললে—'ছি, ছি, কী যে আপনি বলেন।'

শৈবাল মাধবীর দিকে নিমেষে কটাক্ষপাত ক'রে বিজনকে বললে—'সত্যি কথাই ব'লচি, এর এক বিন্দুও বাড়ান নয়। আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয়, তবে ওকেই জিগ্‌গেস ক'রবেন' এই ব'লে শৈবাল আঙ্গুল দিয়ে নতমুখী মাধবীকে দেখাল।

সবিতা এবং বিজন বার বার এই কথার প্রতিবাদ ক'রতে লাগল। কিন্তু শৈবাল আর এ কথার জের

টানতে দিল না। অকস্মাৎ নিজেকে এই সমস্ত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করবার জন্য সে একবার নড়েচড়ে ব'সলে এবং যে নির্ম্মল আনন্দ ও হাসি নিয়ে সে এই ঘরে ঢুকেছিল সেই নিঃশেষিত আনন্দ ও শুভ্র হাসি নিজের মধ্যে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা ক'রে শৈবাল মাধবীকে উদ্দেশ ক'রে বললে—'কিন্তু আর তো দেরি ক'রলে চ'লবে না, রাণু! এদিকে দশটা বেজে গেছে। এগারটার মধ্যে আমাদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে।'

সবিতা বিস্মিত হ'য়ে বললে—'তোমরা আজ কোথাও যাবে নাকি?'

শৈবাল ততোধিক বিস্মিত হ'য়ে বললে—'বাঃ, রাণু আপনাকে কোন কথা বলেনি?'

'কই না।'

শৈবাল একবার মাধবীর মুখের দিকে চেয়ে সবিতাকে বললে—'সে কি। কাল রাত্তিরে জ্যাঠামশায়ের সামনে পর্য্যন্ত কথা হ'ল—আজ রাণুকে নিয়ে কলকাতায় আমার মাসীর বাড়ী হ'য়ে থিয়েটার দেখতে যাব। অন্যদিন বেশি রাত্তির হবে ব'লে আজ রবিবার ম্যাটিনীতে যাওয়া ঠিক করলাম। এত কথা হ'ল রাণু একটাও বলেনি। শ্রেফ্ ভুলে ব'সে আছে। আপনার এই ভাসুর-ঝিটির এবার চিকিৎসার দরকার হ'য়ে পড়েছে।'

সবিতা হেসে বললে—'তাই করানো উচিত, রাণীর যা ভুলো মন হ'য়েচে। এমন দরকারী কথাটাই আমাকে ব'লতে ভুলে গেলি?'

'উপায় কি' শৈবাল হেসে বললে—'বছর আট দশ আগে হ'লে না হয়—কানে হাত দিয়ে দেয়ালের কোণে দাঁড় করিয়ে দিতাম, কিন্তু এখন তো সে শাস্তি দেবার উপায় নেই। রাণু, ছেলেবেলাকার সে সব শাস্তির কথা তোমার মনে আছে?'

ব'লে শৈবাল হাসতে লাগল।

সবিতা শৈবালের মুখের দিকে চেয়ে বললে: 'আজ কি তোমাদের না গেলেই নয়?'

'না কাকীমা, আজ যেতেই হবে' শৈবাল বললে: 'অন্যদিন হ'লে কথা ছিল, কিন্তু আজ না গেলেই চলবে না।'

'কেন?'

শৈবাল বললে: 'মাসীমার বাড়ীর মেয়েরা আজ আমাদের নেমন্তন্ন করেচে। সেখান থেকে তাদের থিয়েটার নিয়ে যেতে হবে। তারা সবাই আমাদের আশায় ব'সে থাকবে। এই অবস্থায় আমরা যদি না যাই, তাহ'লে তারা কি ভাববে বলুন।'

সবিতা আস্তে আস্তে বললে—'এতদূর যখন হ'য়ে আছে তখন যাওয়াই উচিত। খাওয়া-দাওয়া এবেলা তো এখানে ক'রে যাবে?'

'হাঁ খেয়েই যাবো' ব'লে শৈবাল মাধবীর মুখের দিকে চেয়ে বললে—'তুমি তাহ'লে ঠিক হ'য়ে থেকো, আমি বারটার সময় গাড়ী নিয়ে আসবো। না, তাও ভুলে যাবে? কাকীমা আপনি রাণুকে মনে করিয়ে দেবেন না।'

মাধবীর কাণ দুটো তখন ঝাঁ ঝাঁ ক'রছে। সে কোন রকমে 'তোমাকে একটা কথা ব'লবো এস' ব'লে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এবং একটু পরে শৈবালকে অনুসরণ করিয়ে দোতলার একটা ঘরে ঢুকলে।

শৈবাল বিস্মিত কণ্ঠে বললে—'ব্যাপার কি রাণু?'

মাধবী শৈবালের মুখের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বললে—'আজ আমার যাওয়া হবে না, শৈবালদা।'

'যাওয়া হবে না—কেন?'

'কি ক'রে হবে বলো? বাড়ীতে অতিথি এসেচে যে।'

'বাড়ীতে অতিথি এসেচে, তাতে তোমার যাওয়া হবে না কেন?' শৈবালের কণ্ঠে এইবার ঈষৎ বিরক্তির আভাষ ফুটে উঠল। 'কাকীমার ভাই, তিনি বুঝবেন।'

'বাঃ, তা কি হয়। বাড়ীতে এমন একজন আত্মীয়, তাকে ফেলে গেলে তিনি কি ভাববেন' মাধবী ঈষৎ দ্বিধায় বললে—'আর এটা—এটা খুব ভদ্রতাও হবে না।'

শৈবালের সমস্ত মুখখানা অকস্মাৎ অপমানে রাঙা হ'য়ে উঠল। আজ মাধবীর প্রতি মন তার নানা কারণে ঠিক প্রসন্ন ছিল না। একমুহূর্ত্ত মাধবীর আনত মুখের দিকে স্থির-দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বললে—'তাহ'লে এবার থেকে দেখচি তোমার কাছেই ভদ্রতা শিখতে হবে। কিন্তু এই মান্য আত্মীয়টির সেবার ভার যদি তোমারই নেবার মতলব ছিল, তবে মাসীমার বাড়ী যেতে—থিয়েটারে যেতে রাজি হ'য়েছিলে কেন?'

পাকা-দেখা

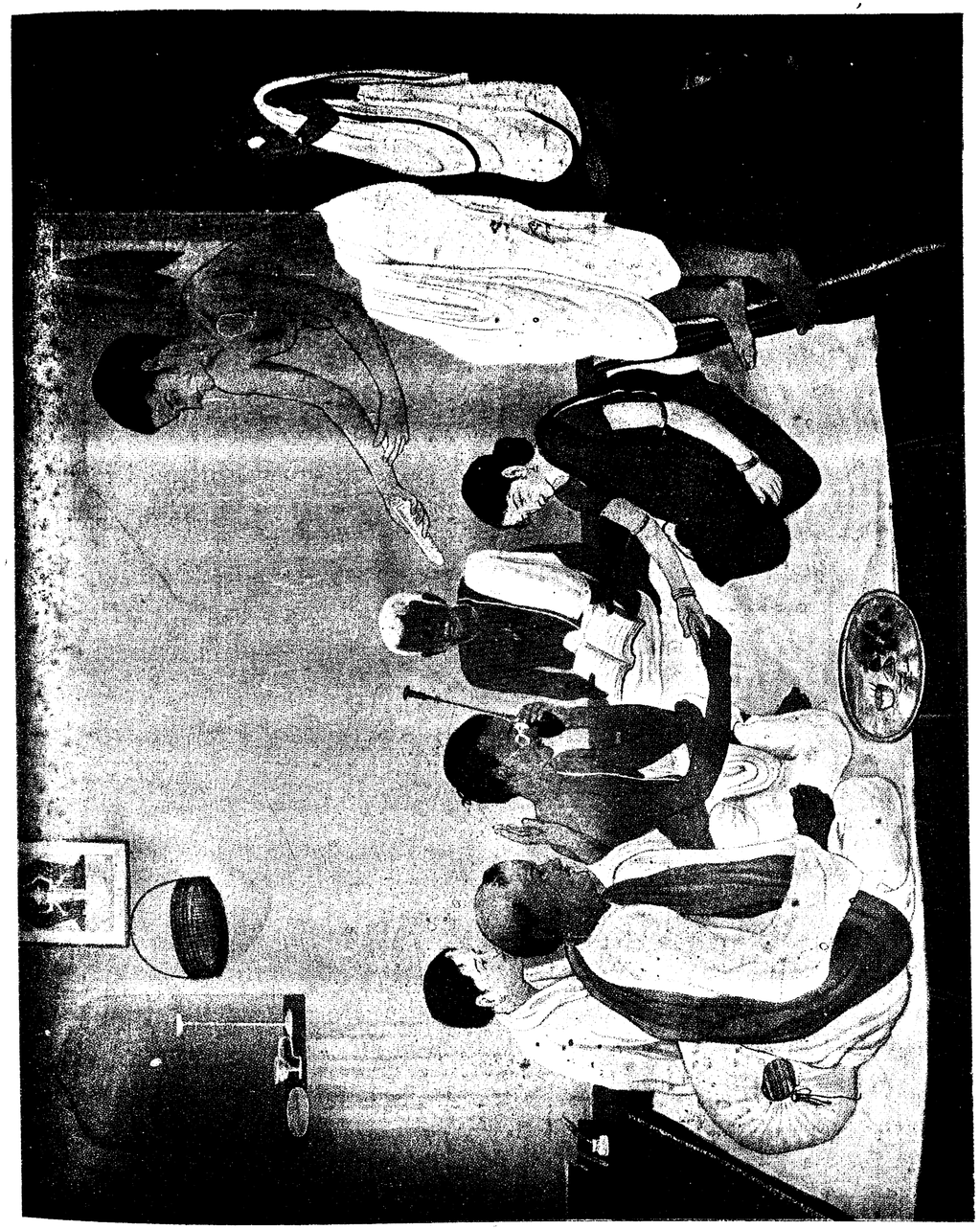

শিল্পী—শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর সাহা

ভারতবর্ষ

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

তার কথার পেছনে যে তীব্র শ্লেষ ছিল তা নিঃশব্দে হু ক'রে মাধবী শান্তকণ্ঠে জবাব দিল—'বিজনবাবু যে আজ আসবেন তা জানতাম না—তাই।'

'জানতে না?'

'না।'

শৈবাল আর স্থির থাকতে না পেরে জ্বলে উঠল। তীব্রকণ্ঠে বললে—'জানতে না? তুমি নিশ্চয় জানতে। আমাকে পাঁচজনের কাছে অপদস্থ করবার জন্যই তুমি এ ভুল করলে।'

'ছল করলাম?'

'হাঁ, তাই। তুমি জান না—আজ এর জন্য আমাকে কতখানি অপ্রস্তুতে পড়তে হবে?'

'অপ্রস্তুত আবার কি' মাধবী বললে—'তুমি ব'লবে তার একজন আত্মীয় অনেকদিন পরে এসেচেন। এই অবস্থায় তাঁকে ফেলে যাওয়া উচিত—একথা মাসীমার মত বুদ্ধিমতী নিশ্চয় ব'লবেন না।'

'তাহ'লে তুমি যাবে না, এই কথা তো?'

'হাঁ। এই অবস্থায় আমি কিছুতেই যেতে পারব না' মাধবী দৃঢ়কণ্ঠে বললে— 'আমাকে আর তোমার কোন দরকার আছে?'

'কিছুমাত্র না' রাগে মুখ ফিরিয়ে শৈবাল ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার বুকের ভেতরটা তখন জ্বালা ক'রছিল। সিঁড়ি দিয়ে নামবার আগে মাধবীর উদ্দেশে তীব্রকণ্ঠে শ্লেষ ক'রে ব'লে গেল—'আজ যে ব্যবহারটা আমার সঙ্গে ক'রলে, তা অতিথি-সৎকারের ফাঁকে একবার ভেবে দেখো। এ তোমারই উপযুক্ত হ'য়েচে।'

মাধবীকে আর একটি কথা বলবার অবসর না দিয়ে শৈবাল দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলো। (ক্রমশঃ)

জীবনের লক্ষ্য

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

কার্ত্তিকের ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় মহাশয় আমার প্রতিবাদের উত্তর দিয়াছেন দেখিয়া সুখী হইলাম। অনিলবাবু যে মত প্রচার করিতেছেন তাহার মধ্যে দুইটি পরস্পর বিরোধী কথা পাওয়া যায়। তিনি বলিতেছেন যে ভোগই জীবনের লক্ষ্য; আবার বলিতেছেন যে কাম, ক্রোধ, লোভ এই তিনটি হইতেছে নরকের দ্বার। যে ব্যক্তি ভোগকে জীবনের লক্ষ্য করিবেন, তাঁহাকে বলিতে হইবে যে তাঁহার ভোগ চাই। অর্থাৎ তাঁহার মনে ভোগের আকাঙ্ক্ষা থাকিবে। ইহারই নাম "কাম"। সুতরাং "কাম"কে ত্যাগ করিলে, ভোগকে কখনও জীবনের লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু অনিলবাবু বলিতেছেন যে কামকে ত্যাগ করা উচিত এবং ভোগকে জীবনের লক্ষ্য করা উচিত। ইহা সম্ভব নহে।

ভোগকে কেন জীবনের লক্ষ্য করা উচিত হয় না, হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে তাহা স্পষ্টভাবেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ভোগ কখনও চিরস্থায়ী হইতে পারে না। এক দিন ভোগ শেষ হইবেই। ভোগকে জীবনের লক্ষ্য করিলে তখন লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে হইবে। অনিলবাবু এ সমস্যার কোনও মীমাংসা করেন নাই। আশা করি তিনি এরূপ অসম্ভব কল্পনা করেন না যে ইহলোকের ভোগ চিরস্থায়ী হইবে। মানব জীবনের লক্ষ্য ভোগ নহে—লক্ষ্য ঈশ্বরলাভ। ঈশ্বরলাভ ব্যতীত চিরকাল আনন্দ পাওয়া যায় না, ইহা সত্য। এজন্য একথা বলা একেবারে ভুল হয় না—যে আনন্দলাভই মানবজীবনের লক্ষ্য।

গীতা ও উপনিষদে আমরা তিন প্রকার আনন্দের কথা দেখিতে পাই। (১) ইহলোকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় ভোগ করিয়া যে আনন্দ, (২) মৃত্যুর পর স্বর্গাদি উৎকৃষ্ট লোকে বিষয় ভোগের আনন্দ, (৩) ঈশ্বরলাভের আনন্দ। প্রথম ও দ্বিতীয় আনন্দ উভয়ই ভোগের অন্তর্গত। তৃতীয় আনন্দ ভোগের আনন্দ নহে। পরলোকের সুখভোগ ইহলোকের সুখভোগ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, কারণ উহা তীব্রতর এবং অধিককাল স্থায়ী। গীতায় প্রথমোক্ত আনন্দকে (ইহজীবনের সুখভোগকে) রাজসিক সুখ বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে (১৮।৩৮), * দ্বিতীয় আনন্দকেও (স্বর্গ-সুখকে) নিন্দা করা হইয়াছে (৯।২০, ২১) †। অতএব গীতাতে ইহ-

---

* বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্॥১৮।৩৮

"বিষয় এবং ইন্দ্রিয়ের সংযোগে যে সুখ তাহা প্রথমে অমৃতের ন্যায় বোধ হয়, কিন্তু পরে বিষের ন্যায় বোধ হয়। ইহার নাম রাজসিক সুখ।"

† তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্ম অনুপ্রপন্নাঃ
গতাগতং কামকামাঃ লভন্তে॥৯।২১

"তাঁহারা বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষীণ হইলে মর্ত্ত্যলোকে ফিরিয়া আসে। যাহারা বেদের কর্মকাণ্ডকেই অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহারা এইভাবে স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে যাতায়াত করিয়া থাকে।"

লোকের ভোগ এবং পরলোকের ভোগ উভয়েরই নিন্দা আছে। কেবল-মাত্র উপরিলিখিত তৃতীয় প্রকার আনন্দের—ঈশ্বরলাভজনিত আনন্দের—প্রশংসা আছে। যথা "যেন ব্রহ্মসংস্পর্শম্ অত্যন্তং সুখম্ আপ্নুতে"—সাধক ব্রহ্মলাভ করিয়া অত্যন্ত সুখ প্রাপ্ত হয়।

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতং।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥৮।১৫

"আমাকে প্রাপ্ত হইয়া মহাত্মাগণ দুঃখের আলয় এবং অনিত্য পুনর্জন্ম লাভ করেন না—তাঁহারা পরম সিদ্ধি লাভ করেন।"

এখানে যাহাকে "পরম সিদ্ধি" বলা হইয়াছে, তাহাই যে গীতার মতে জীবনের লক্ষ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা কোনও প্রকার ভোগ নহে—তাহা ঈশ্বর লাভ।

উপনিষদের মতও এইরূপ। ইহলোকের ভোগ সম্বন্ধে উপনিষদ বলিয়াছেন,

পরাচঃ কামান্ অনুযন্তি বালাঃ
তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্। কঠোপনিষদ্

"যাহারা বাহ্য বিষয় ভোগ অনুসরণ করে তাহারা মৃত্যুর বিস্তারিত পাশে পতিত হয়।"

পরলোকের ভোগ সম্বন্ধে উপনিষদ বলিয়াছেন,

"তদ্ যথা ইহ কর্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে
এবম্ এব অমুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে"
ছান্দোগ্য উপনিষদ্

"ইহলোকে কর্মের ফলে যে সুখভোগ হয় তাহা যেমন ক্ষয়শীল, পরলোকে পুণ্যের ফলে যে সুখভোগ হয় তাহাও সেইরূপ ক্ষয়শীল।"

জীবনের লক্ষ্য কি তাহা বৃহদারণ্যক উপনিষদে মৈত্রেয়ীর মুখ দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে,

"যেন অহং ন অমৃতা স্যাং, কিম্ অহং তেন কুর্য্যাং"
"আমি যাহাতে অমৃত না হইব, তাহার দ্বারা কি করিব।"

বলা বাহুল্য বিষয় সুখ ভোগ করিয়া কেহ "অমৃত" হইতে পারে না। সুতরাং বিষয় সুখভোগকে জীবনের লক্ষ্য করা উচিত নহে।

অমৃতলাভের উপায় সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উক্ত হইয়াছে,

"তম্ এব বিদিত্বা অতিমৃত্যুম্ এতি
নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়।"

"কেবলমাত্র ঈশ্বরকে জানিলেই মৃত্যু অতিক্রম করা যায়, মোক্ষলাভের অপর কোনও পথ নাই।"

সুতরাং উপনিষদেও ইহলোক ও পরলোক উভয়স্থানেই ভোগকে নিন্দা করা হইয়াছে এবং ঈশ্বরলাভ করিয়া মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতিলাভকেই জীবনের উদ্দেশ্য বলা হইয়াছে।

অনিলবাবু যে প্রকার ভোগকে জীবনের লক্ষ্য বলিতেছেন তাহার স্বরূপ একটু আলোচনা করা যাক্। এই ভোগ পরলোকের নয়,—কারণ তিনি বলিতেছেন পৃথিবীকে পূর্ণভাবে ভোগ করিতে হইবে, জীবনকে পূর্ণভাবে ভোগ করিতে হইবে, "ইহৈব" ইত্যাদি। সুতরাং তাঁহার লক্ষ্য যে ভোগ—তাহা ইহজন্মে ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় ভোগ ব্যতীত আর কিছু হইতে পারে না। তিনি অবশ্য বলিয়াছেন, "নীচ ইন্দ্রিয় ভোগ নহে।" একথা আমরা মানিতে প্রস্তুত আছি। কারণ ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় ভোগ, বৈধ এবং অবৈধ উভয় প্রকার হইতে পারে। বৈধ ভোগ পাপ নহে; অবৈধ ভোগই পাপ। সুতরাং অবৈধ বিষয়ভোগকে "নীচ ইন্দ্রিয় ভোগ" বলিয়া বাদ দিয়া, বৈধ বিষয় ভোগই অনিলবাবুর লক্ষ্য বলিতে হয়। ইন্দ্রিয়ের সাহায্য সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়া পৃথিবীকে ভোগ করা একেবারে অসম্ভব।

অনিলবরণবাবু তাঁহার লক্ষ্য ভোগকে কোনও কোনও স্থানে দিব্য ভোগ বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন,—বলিয়াছেন, "দেবতাদের সাহচর্য্যে তাঁহাদের ন্যায়ই জীবনকে ভোগ করিতে হইবে।" এখানে কিন্তু অনিলবরণবাবু একটু গোল করিয়া ফেলিয়াছেন। মৃত্যুর পর স্বর্গে গিয়া দেবতাদের সাহচর্য্যে তাঁহাদের ন্যায় ভোগ হয়। কিন্তু সে লোকের কথা অনিলবাবু তুলিতে চাহেন না। অনিলবাবুর ইহা উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে দেবতাদের মত ভোগ করিতে হইলে পরলোকে যাইতে হইবে। ইহলোকে তাহার সম্ভাবনা নাই।

গীতা বলেন, কর্ম কর,—কর্মের ফল চাহিও না; ত্যাগ কর, ত্যাগের ফল—ভোগ চাহিও না। অনিলবাবু বলেন, ত্যাগ কর, ত্যাগের ফল—ভোগ পাইবার জন্য। অতএব অনিলবাবু গীতার ধর্ম অনুসরণ করিতেছেন না।

অনিলবাবু বলিয়াছেন "মানব প্রকৃতির মধ্যে অশুভ যাহা কিছু আছে, খুঁটিয়া খুঁটিয়া বর্জ্জন করিতে হইবে।" মানব প্রকৃতির মধ্যে প্রধান অশুভ হইতেছে ভোগের আকাঙ্ক্ষা, যাহার নাম কাম। কিন্তু অনিলবাবুর মতে ভোগের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতে হইবে। অনিলবাবু বলিয়াছেন, "জগতের সর্বত্র যে ঈশ্বর বিরাজ করিতেছেন তাঁহাকে সমস্ত জীবন সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করিতে হইবে।" কিন্তু অনিলবাবু ভুলিয়া যাইতেছেন যে, এভাবে জীবন সম্পূর্ণ সমর্পণ করিলে ভোগকে জীবনের লক্ষ্য করা যায় না। জগতে কোনও বস্তু ভোগের অনুকূল, কোনও বস্তু ভোগের প্রতিকূল। যদি আমি ভোগকে জীবনের লক্ষ্য করি, তাহা হইলে ভোগের অনুকূল বস্তু আকাঙ্ক্ষা করিব। কিন্তু জীবন সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরে সমর্পণ করিলে, কোনও বস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষা থাকিতে পারে না; কারণ তখন এই বুদ্ধির উদয় হয় যে ঈশ্বর সকল বস্তুর মধ্যে বিরাজ করেন এবং তাঁহার ইচ্ছায় সকল ঘটনা সংঘটিত হয়। বস্তুতঃ ভোগের আকাঙ্ক্ষা এবং ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণ পরস্পর বিরোধী।

সমস্ত গীতা ও উপনিষদ শাস্ত্র মন্থন করিয়া অনিলবাবু তাঁহার প্রিয় ভোগবাদ সমর্থক মাত্র দুইটি বাক্য খুঁজিয়া পাইয়াছেন। ভোগনিবারক যে বহু বাক্য রহিয়াছে সেগুলি তাঁহার চক্ষে পড়ে নাই, পড়িয়াছে কেবল দুইটি ভোগ সমর্থক বাক্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই দুইটি বাক্য ভোগবাদ সমর্থন করে না। প্রথম বাক্যটি ঈশোপনিষদের নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে:—

ঈশাবাস্যম্ ইদং সর্বং জগৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মাগৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনং॥

"জগতের সকল বিকারশীল বস্তু ঈশ্বরের দ্বারা পরিব্যাপ্ত। অতএব ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর, কাহারও ধন আকাংক্ষা করিও না।"

"ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর" ইহার অর্থ এই যে, শব্দস্পর্শাদি বিষয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু মনের মধ্যে ত্যাগের ভাব থাকিবে।—বিশ্ব সকল "জগৎ" অর্থাৎ বিকারশীল, ক্ষণস্থায়ী, বিষয় ভোগের আকাংক্ষা থাকিলে পরিণামে দুঃখ হইবে, এজন্য বিষয় ভোগ করিবার সময়ও ভোগের আকাংক্ষা ত্যাগ করিতে হইবে—অর্থাৎ ভোগকে জীবনের লক্ষ্য করা হইবে না। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে অনিলবাবু "ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর" ইহার অর্থ করিয়াছেন "ভোগকে জীবনের লক্ষ্য কর।" অর্থাৎ উপনিষদের যাহা অভিপ্রায় তাহার বিপরীত। যাহারা ভোগকে জীবনের লক্ষ্য করে তাহাদিগকে পরবর্ত্তী তৃতীয় শ্লোকে "আত্মহনোজনাঃ" বলা হইয়াছে—তাহারা আত্মঘাতী—কারণ তাহারা আত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া বাহ্য বিষয় দ্বারা ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য জীবন অতিবাহিত করে এবং এই সব আত্মঘাতী লোক মৃত্যুর পর "অন্ধেন তমসাবৃতাঃ" অর্থাৎ ঘোরতর অন্ধকার সমাচ্ছন্ন "অসুর্য্য" লোকে গমন করিয়া থাকে। পুনরায় নবম শ্লোকে ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে ইহারা অবিদ্যার উপাসনা করে, অতএব "অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি" অর্থাৎ অন্ধকারে নিমগ্ন হয়। কেনোপনিষদে ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে "ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ"—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না; সুতরাং যাহারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় ভোগই জীবনের লক্ষ্য করে তাহারা ব্রহ্মকে পায় না, পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর কবলে পতিত হয়। ভোগের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ না করিলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিকারী হওয়া যায় না, এ কথা কঠোপনিষদে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে। ব্রহ্মকে লাভ করিবার উপায় "অধ্যাত্মযোগ" (কঠোপনিষদ, ২।১২)—অর্থাৎ বিষয় ত্যাগ করিয়া আত্মার সহিত মনকে সংযুক্ত রাখা, সুতরাং বিষয় ভোগাকাঙ্ক্ষা থাকিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। সাধুগণ ব্রহ্মকে লাভ করিবার জন্য বিষয় ভোগ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন—"যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি" (কঠোপনিষদ্ ২।১৫)। যাহার মনে ভোগবাসনা নাই সেই ব্রহ্মকে দর্শন করিতে পারে—"তম্ অক্রতুঃপশ্যতি বীতশোকঃ" (কঠ—২।২০)। ইন্দ্রিয় সকল বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া আত্মার মধ্যে ব্রহ্মের অনুসন্ধান করিলে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে—"কশ্চিৎ ধীরঃ প্রত্যগাত্মানম্ ঐক্ষৎ আবৃত্তচক্ষুঃ অমৃতত্বমিচ্ছন্" (কঠ—৪।১)। ভোগের দ্রব্য সকল অধ্রুব, তাহাদিগকে জীবনের লক্ষ্য করিলে ধ্রুব বস্তু (ব্রহ্মকে) পাওয়া যায় না, এজন্য জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ভোগকে জীবনের লক্ষ্য করেন না—"ধ্রুবম্ অধ্রুবেষু ইহ ন প্রার্থয়ন্তে" (কঠ—৪।২)। এই প্রকার ভোগবাদ বিরোধী বাক্যে উপনিষদ সকল পরিপূর্ণ। তথাপি অনিলবাবু বলেন, উপনিষদের মত এই যে ভোগকে জীবনের লক্ষ্য করিতে হইবে।

গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, "যাহার মন ভোগ ও ঐশ্বর্য্যে প্রসক্ত তাহাদের পরমেশ্বরাভিমুখী সমাধি হয় না" (গীতা ২।৪৪)। 'যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ, তিনি আত্মাতেই তুষ্ট, কোনও বাহ্য বিষয় আকাংক্ষা করেন না" (২।৫৫)। বাহ্য বিষয় ব্যতীত ভোগ হয় না, সুতরাং স্থিতপ্রজ্ঞ কখনও ভোগকে জীবনের লক্ষ্য করিতে পারেন না। 'যখন ইন্দ্রিয় সকল বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হয়, তখন প্রজ্ঞা স্থির হয়" (২।৫৮)। বলা বাহুল্য ইন্দ্রিয় বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হইলে ভোগ হয় না। "শান্তিলাভ করিতে হইলে মমত্ববোধ বিসর্জন দিতে হয়" (২।৭১)। মমত্বজ্ঞান বিসর্জন দিলে ভোগ হয় না। "যোগিগণ আত্মশুদ্ধির জন্য কর্ম করেন" (৫।১১), ভোগকে জীবনের লক্ষ্য করিলে ভোগের জন্যই কর্ম করিতে হয়; কিন্তু তাহা গীতার মতের বিরোধী। "ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংস্পর্শ হইতে যে ভোগ হয় তাহা দুঃখের কারণ" (৫।২২), গীতা যাহাকে দুঃখের কারণ বলিয়াছেন তাহাকে জীবনের লক্ষ্য বলিলে একটু ভুল হয় না কি? বস্তুতঃ গীতা ভোগবাদের বিরুদ্ধ কথায় পরিপূর্ণ। সুতরাং ভগবান যে অর্জুনকে বলিয়াছেন, "শত্রু জয় করিয়া রাজ্য ভোগ কর" ইহার উদ্দেশ্য এরূপ নহে যে অর্জুন ভোগকে জীবনের লক্ষ্য করিবেন। ভগবান বহুবার বলিয়াছেন যে ঈশ্বরলাভকেই অর্জুন জীবনের লক্ষ্য করিবেন, এক্ষণে রাজ্যভোগ উপস্থিত হইয়াছে, অনাসক্তভাবে রাজ্যভোগ করিতে হইবে, এই পর্য্যন্ত।

একটি বালক রাগ করিয়া ভাত খায় নাই। তাহার পিতা তাহাকে অনেক উপদেশ দিয়া বলিলেন, "যাও, ভাত খাইয়া এস"। এক্ষেত্রে কেহ যদি বলেন যে বালকটির পিতার অভিপ্রায় এইরূপ যে তাঁহার পুত্র অন্ন ভোজন করাকেই জীবনের উদ্দেশ্য করিবে, তাহা হইলে তাঁহার যে ভুল হইবে, অনিলবাবুরও ঠিক সেইরূপ ভুল হইয়াছে।

অনিলবাবু লিখিয়াছেন "ত্যাগের নেশায় ভোগকে নিন্দা করিয়া, পরলোকের চিন্তায় ইহলোককে অবহেলা করিয়া ভারতের সর্বনাশ হইয়াছে।" আমরা দেখিলাম যে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ভোগের নিন্দা করিয়াছেন। উপনিষদের ঋষিগণ ভোগের নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহাদের ত্যাগের নেশা হইয়াছিল কি না অনিলবাবুই বলিতে পারেন। কিন্তু ভোগকে নিন্দা করিলেই যে ইহলোককে অবহেলা করিতে হইবে তাহার কোনও অর্থ নাই। ভোগকে উপেক্ষা করিয়া ইহলোকের কর্ত্তব্য কর্ম করিতে হইবে ইহাই গীতার উপদেশ।

দেখিয়া সুখী হইলাম যে অনিলবাবু এবারের প্রবন্ধে বলিয়াছেন, 'পরলোক সত্য এবং মহান্"। পূর্বের প্রবন্ধে তিনি অন্যরূপ সুর ধরিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন যে নীটশের বাণী "যাহারা তোমাদিগকে পরলোকের আশা দিয়া রাখে তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিও না"—আধুনিক যুগবাণী, কালপুরুষের ইঙ্গিত। এ বিষয়ে অনিলবাবুর মত কথঞ্চিৎ পরিবর্তন হইয়াছে এজন্য আমার শ্রম সার্থক বোধ করিতেছি। কিন্তু পরলোক যদি সত্য ও মহান হয় তাহা হইলে ইহলোকে জীবনকে পূর্ণভাবে ভোগ করাকে জীবনের লক্ষ্য করা কেন অবশ্য কর্ত্তব্য হইবে তাহা বেশ বোঝা যায় না। অনিলবাবু যেরূপ পরলোককে সত্য ও

মহান বলিয়া স্বীকার করিতেছেন যদি সেইরূপ ঈশ্বরকে আরও সত্য, আরও মহান বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে ভোগকে জীবনের লক্ষ্য না করিয়া ঈশ্বরলাভকেই জীবনের লক্ষ্য করা উচিত; তাহা হইলে আমাদের বিবাদ মিটিয়া যায়।

অনিলবাবু বলিয়াছেন যে আমার মতে হিন্দুধর্মশাস্ত্রের উপদেশ এই যে "যখনই সম্ভব সংসার ত্যাগ, কর্ম ত্যাগ করিয়া পরকালের চিন্তায় মগ্ন" থাকা উচিত। আমি পূর্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে হিন্দুধর্ম সকল রোগীর জন্য এক prescription করে না। যাহাদের সংসার ত্যাগ ও কর্ম ত্যাগের অধিকার আছে, তাহারা অবশ্য ত্যাগ করিবে। কিন্তু খুব কম সংখ্যক লোকের এই অধিকার আছে। বাকী (এবং অধিকাংশ) লোকের পক্ষে সংসারে থাকিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম করিতে হইবে; কেহ শাস্ত্রচর্চ্চা করিবেন, কেহ যুদ্ধ করিবেন, কেহ কৃষিবাণিজ্য করিবেন, কেহ ব্যক্তিগত সেবা করিবেন। কিন্তু এই সব কর্ম করা হইবে ভোগকে লক্ষ্য করিয়া নহে, ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য। ইহাই সংক্ষেপে হিন্দুধর্মের উপদেশ।

কিসে ভারতের সর্বনাশ হইল তাহা নির্দেশ করা আজকাল একটা ফ্যাশান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রতিষ্ঠালাভ করিবার ইহাই আজকাল সর্বাপেক্ষা সহজ পথ। কেহ বলিলেন, প্রতিমা পূজা করিয়া ভারতের সর্বনাশ হইয়াছে; কেহ বলিলেন, জাতিভেদ হইতে সর্বনাশ—কেহ বলেন মেয়েদের অল্প বয়সে বিবাহ দিয়াই সর্বনাশ; কেহ বলেন, মা কালীর কাছে পাঁঠা কাটা হয় বলিয়া ভারতের সর্বনাশ। যাহার যা খুশী সে তাহাই বলিতেছে। কিন্তু এরূপ হাস্যাস্পদ কথা খুব কমই শোনা গিয়াছে যে ভোগকে জীবনের লক্ষ্য করে নাই বলিয়াই ভারতের অধঃপতন এবং ভোগকে জীবনের লক্ষ্য করিলেই ভারত দ্রুত উন্নতি লাভ করিবে।

অনিলবাবু বলিয়াছেন যে "এই যুগের সিদ্ধ মহাপুরুষগণের জ্যোতির্ময় দিব্য জীবন" আলোচনা করিলে না কি আমরা দেখিতে পাইব যে ভোগকে জীবনের লক্ষ্য করা উচিত। এই যুগের সিদ্ধ মহাপুরুষগণের মধ্যে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের খ্যাতিই সমধিক। তাঁহার উপদেশ ত "কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ"; তাঁহার জীবনে ত তাহাই দেখিতে পাই। তিনি বলিতেন, গীতা গীতা বার বার করিলে যাহা পাওয়া যায় (অর্থাৎ ভোগী বা ত্যাগী) তাহাই গীতার সার উপদেশ। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনও ত ভোগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত বলিয়া বোধ হয় না। আধুনিক যুগের সিদ্ধ মহাপুরুষ আরও কয়েক জনের নাম করা যাইতেছে —স্বামী ভাস্করানন্দ, তৈলঙ্গস্বামী, রামদাস কাঠিয়া বাবাজি, স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী ভোলাগিরি, বামাক্ষেপা, সন্তদাস মহারাজ। কই ইঁহারা ত কেহ ভোগকে জীবনের লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় নাই। পাছে আমরা শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, শ্রীচৈতন্যের নাম করি, এজন্য অনিলবাবু "আধুনিক" এই বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক যুগের মহাপুরুষদের সাক্ষ্যও ত অনিলবাবুর মতের বিরুদ্ধে।

পূর্ব্বের প্রবন্ধে অনিলবাবু লিখিয়াছিলেন যে শঙ্করাচার্য্য মায়াবাদ প্রচার করিবার ফলে "ঐহিক জীবনে ভারতের প্রকৃত অধঃপতনের সূত্রপাত হইল। গার্হস্থ্য জীবনকে অতি হীন চক্ষে দেখা হইল, তাহাকে বিধি নিষেধের অসংখ্য বন্ধনে পিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল।" স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে যে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধিনিষেধগুলিকেই এখানে লক্ষ্য করা হইয়াছে—লোকাচার বা মেয়েলি আচারকে এখানে লক্ষ্য করা হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে অনিলবাবু বলিয়াছেন, "আমি শাস্ত্রের নিন্দা কোথাও করি নাই, মনুসংহিতা বা স্মৃতিশাস্ত্রকে আক্রমণ করি নাই।" খুব ভাল কথা। অতঃপর অনিলবাবু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, 'হিন্দু সমাজ যে আজ অসংখ্য বিধিনিষেধের অত্যাচারে জর্জ্জরিত সে সমস্ত যে মনুসংহিতা হইতে আসে নাই, বসন্তকুমারবাবু কি তাহা অস্বীকার করিতে পারেন?" এ বিষয়ে আমার মত জানিবার জন্য যদি অনিলবাবুর কিছুমাত্র কৌতূহল হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে বলিতে পারি যে হিন্দু সমাজ বিধিনিষেধের অত্যাচারে যে পরিমাণে জর্জ্জরিত হইয়াছে তদপেক্ষা অনেক বেশী জর্জ্জরিত হইয়াছে গীতা-উপনিষদের দুর্ব্যাখ্যাকারীদের উৎপাতে। যে ব্যবস্থা মনোনীত না হইলে তাহাই বর্ত্তমান যুগের উপযুক্ত নহে এই বলিয়া পরিত্যাগ করা যাইতে; অর্থাৎ কোন্ কার্য্য কর্ত্তব্য ইহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য শাস্ত্র নির্দ্দেশের উপর নির্ভর না করিয়া নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করা হইবে। কিন্তু এ ব্যবস্থা গীতার ঠিক বিপরীত। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন কোন্ কর্ম কর্ত্তব্য এবং কোন্ কর্ম অকর্ত্তব্য এ বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ (গীতা ১৬।২৪)। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি নিজ বুদ্ধি অনুসারে কর্ত্তব্য নির্ণয় করিবার চেষ্টা করে তাহা হইলে তাহার ভুল করিবার সম্ভাবনা খুব বেশী; (বেদব্যাস অর্জ্জুনের ভুল হইয়াছিল, তাঁহার মনে হইয়াছিল যুদ্ধ না করাই তাঁহার কর্ত্তব্য)। এইরূপ ভুল হইবার কারণ এই যে সাধারণ মানবের চিত্ত রাগদ্বেষের অধীন—কিন্তু শাস্ত্রবাক্য রাগদ্বেষহীন ঈশ্বরের উক্তি। পুরাতন যুগের সামাজিক ব্যবস্থা বর্ত্তমান যুগে চলিতে পারে না, এই ধুয়া পাশ্চাত্য জগতেই প্রথমে উঠিয়াছে এবং আরও অনেক ভুল মতের মতন এই মতটিও আমাদের ইংরাজি শিক্ষিত ব্যক্তিগণ পাশ্চাত্য দেশ হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। এই ধুয়া অনুসারে পাশ্চাত্য জগতে আজকাল অনেকে বলিয়া থাকেন, বিবাহপ্রথাটি বড়ই সেকেলে প্রথা, আধুনিক যুগে ইহা চলিতে পারে না; ইত্যাদি।

অনিলবাবু বলিয়াছেন "মনুসংহিতার যুগ হইতে আমরা অনেক দূরে সরিয়া আসিয়াছি, ইহা অস্বীকার করা অন্ধ গোঁড়ামী ভিন্ন আর কিছু নহে।" অনিলবাবু যদি আমাকে একজন অন্ধ গোঁড়া বলিয়া মনে করেন তাহা হইলে আমি অবশ্য অত্যন্ত ব্যথিত হইব। কিন্তু আমার মনে হয় যে পাশ্চাত্য কুশিক্ষায় যাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হয় নাই তিনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে মনুসংহিতার (এবং অন্যান্য স্মৃতি শাস্ত্রের) ব্যবস্থাগুলি সকল যুগেরই সমাজের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলজনক। ইহা

সমর্থনে আমি পূর্ব্ব প্রবন্ধে গীতা ও উপনিষদ হইতে বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি।* অনিলবাবু গীতা ও বেদ উভয়ই মানেন অথচ এই বাক্যগুলি অশ্রদ্ধা করেন—এই রহস্য তিনি না বুঝাইয়া "অন্ধ গোঁড়ামি" বলিয়া সমস্যাটির অতি সহজ মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। দুঃখের বিষয় যুক্তি হিসাবে এই মীমাংসার কোনও মূল্য নাই। অমূল্য উপদেশ সকলের আকর মনুসংহিতার মধ্যে তিনি মক্ষিকাবৃত্তি দ্বারা দুইটি ত্রুটি খুঁজিয়া পাইয়াছেন। প্রথমতঃ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—"এখন কি সকল ব্রাহ্মণই শুধু যজন যাজন দান গ্রহণ প্রভৃতি বৃত্তি লইয়াই থাকিতে পারেন?" না, পারেন না। তখনও থাকিতেন না। মনুই ব্রাহ্মণের নানাবিধ বৃত্তির উল্লেখ করিয়াছেন, কতকগুলি প্রশংসনীয়, কতকগুলি নিন্দনীয়। যজন যাজন প্রভৃতি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ না হইলে ব্রাহ্মণ সৈনিকের বৃত্তি এবং কৃষি, বাণিজ্য, গোপালন প্রভৃতি বৃত্তিও গ্রহণ করিতে পারে, ইহা মনুরই বিধান। অতএব এক্ষেত্রে অনিলবাবু মনুসংহিতার দোষ ধরিতে গিয়া বিফলকাম হইলেন। অনিলবাবুর দ্বিতীয় যুক্তি এই যে মনুসংহিতায় লেখা আছে যে শূদ্র বেদ শ্রবণ করিলে তাহার কানে সীসা গরম করিয়া ঢালিয়া দিতে হইবে। প্রাচীনকালে সত্য সত্যই যে যখন তখন শূদ্রদিগকে ধরিয়া তাহাদের কানে গরম সীসা ঢালিয়া দেওয়া হইত, ইহা সত্য নহে। সত্য হইলে, পুরাণে বা ইতিহাসে এরূপ ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যাইত। কিন্তু এরূপ ঘটনার উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। বেদের কোনও উপদেশই যে শূদ্রকে প্রদান করা হইবে না, ইহাও ঐ নিয়মের উদ্দেশ্য নহে। কারণ বেদের যাহা সার উপদেশ—তাহা গীতা, ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে, শূদ্রের তাহা পড়িতে কোনও বাধা নাই। কিন্তু বেদমন্ত্র অসম্পূর্ণ ভাবে শিখিয়া শূদ্র যদি যজ্ঞ করিবার চেষ্টা করে তাহা হইলে সমাজের অনিষ্ট হইতে পারে—এজন্য একটা ভীতিজনক ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হইয়াছে মাত্র। অনিলবাবু পণ্ডিচারী আশ্রমের একজন বিশিষ্ট সাধক এজন্য তাঁহার মত কিছু বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হইল।

* তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥ গীতা ১৬।২৪
"যদ্ বৈ কিঞ্চ মনুঃ অবদৎ তৎ ভেষজম্ ইব শরীরিণাং" বেদ

পৃথিবীর প্রতিবেশী

শ্রীনরেন্দ্র দেব

পৃথিবীর নিকটতম প্রতিবেশী 'মঙ্গল' গ্রহকে নিয়ে অনেক দিনই পৃথিবীর অধিবাসীরা মাথা ঘামাচ্ছেন। একদল বলছেন যে মঙ্গলে মানুষের বসবাস আছে এবং তারা না কি পৃথিবীর মানবক অপেক্ষা অধিকতর প্রতিভাশালী অর্থাৎ এক কথায় অতিমানব! শিক্ষায়, সভ্যতায়, জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে মঙ্গলবাসীরা পৃথিবীর মানুষকে অনেক পশ্চাতে ফেলে এগিয়ে চলেছে!

মঙ্গলগ্রহ যে পৃথিবী অপেক্ষা অনেক উচ্চে একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই; কেন না জ্যোতির্বিদেরা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয় ক'রে নীহারিকাপুঞ্জের যে নক্সা প্রস্তুত ক'রেছেন তাতে পৃথিবী আছেন দেখা যায় মঙ্গলের অনেক নীচেয়। কিন্তু সে যাই হোক, এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে—যথার্থই কি মঙ্গলেও মানুষ আছে? ওই গ্রহটির প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক অবস্থা, ওর বায়ুমণ্ডল, জ্যোতির্ম্মণ্ডল অর্থাৎ মোটের উপর ওর পাঞ্চভৌতিক আবহ কি সত্যই মনুষ্যবাসের উপযোগী?

মনীষী রাস্কিন্ তাঁর "মডার্ণ পেণ্টার্স" পুস্তকের এক-

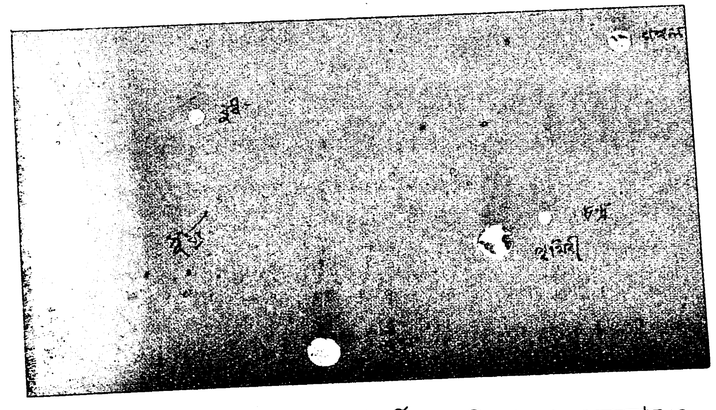

নীহারিকা পুঞ্জের নক্সা (সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী গ্রহগুলির পরস্পরের অবস্থান ও আকারের একটা মোটামুটি ধারণা হবে এ থেকে)

স্থানে লিখেছেন যে—"আপনাকে মনুষ্য বাসের উপযোগী ক'রে তোলবার জন্য পৃথিবীকে যেদিন নানা আয়োজন ক'রতে হ'য়েছিল, তার মধ্যে প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন হয়েছিল তার এমন একটি আঁধার অবগুণ্ঠনের বা আবরণের—যেটি ঠিক মধ্যবর্ত্তিনীর ন্যায়ই মানুষ ও পৃথিবীর নগ্নতার মাঝখানে আপনাকে বিস্তৃত ক'রে দিয়েছিল। এরই অন্তরালে চলেছিল চিরস্থায়ী পৃথিবীর রূঢ় কঠিনতার সঙ্গে ক্ষণস্থায়ী মানুষের প্রাণ-চঞ্চল লীলা!"

"এমন কি মানুষের স্বর্গবাসের যোগ্য হবার জন্য স্বর্গকেও প্রস্তুত হ'তে হয়েছিল। তার দীপ্ত জ্যোতির্ম্ময় আলোক

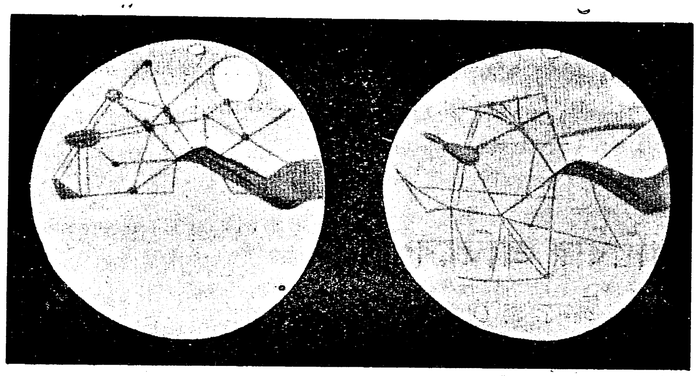

মঙ্গলগ্রহের চিত্র (শীতের প্রারম্ভে এই চিত্র নেওয়া হ'য়েছে। মাথার দিকে ফোঁটার মত সাদা দাগ প্রথম তুষারপাতের চিহ্ন। দক্ষিণের চিত্রটি এক সপ্তাহ পরে তোলা।)

শিখার—তার গভীর শূন্যতারও একটি গুণ্ঠন অপরিহার্য্য হ'য়ে উঠেছিল যার সাহায্যে সে মানুষের একান্ত ক্ষীণতা ও দৌর্ব্বল্যের অনুকূলে আপনার অসহনীয় গৌরবোজ্জ্বল মহিমাকে সংবরণ ক'রে রাখতে পারে। তবেই সম্ভব হয়েছিল মানুষের বৈচিত্র্যময় জীবন প্রবাহের সঙ্গে আকাশের অপরিবর্ত্তনীয় গতির এক আশ্চর্য্য মিতালী!"

"মানুষ ও পৃথিবীর মধ্যে এসেছিল সেদিন নব কিশলয় পল্লবচ্ছায়া! আকাশ ও মানুষের মধ্যে এসেছিল সেদিন নবঘন নীরদ মণ্ডল! তাই মানুষের জীবন হ'য়ে উঠেছে কতকটা শাখাচ্যুত পল্লবের ন্যায় অধোগামী, কতক বা লঘু শুভ্র বাষ্পতুল্য ঊর্দ্ধগামী।"

কবির কল্পনায় এই ছিল সেদিন নিজেকে মনুষ্যবাসের উপযোগী ক'রে তোলবার জন্য স্বর্গ মর্ত্ত্যের তথা গ্রহ নক্ষত্রের আয়োজন। বৈজ্ঞানিকের ভাষায় যা বলা হয়েছে তা ভাষার দিক থেকে অন্য রকম শোনালেও, মোদ্দা কথাটা কিন্তু প্রায় একই। তাঁরাও বলেন বায়ু তাড়িত বৃক্ষপত্র এবং ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত বাষ্প চিহ্নই হ'চ্ছে মনুষ্যবাসোপযোগী গ্রহের প্রধান লক্ষণ! মনুষ্যবাসোপযোগী বলতে এইটেই বুঝতে হবে যে, তারা ঠিক মানুষ না হ'লেও—এমন কোনো জীব—যারা দেহে মনে অবিকল মানুষেরই সমকক্ষ। যে গ্রহের মধ্যে কেবলমাত্র অনাবৃত পাহাড় সূর্য্যালোকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে এবং যার শূন্যতা শুধু শুষ্ক বাতাসে ভরা সেখানে জৈব প্রাণী বা শারীরী-জীব থাকতে পারে না।

জীবনের প্রধান গুণই হ'চ্ছে জৈব দেহের সেই শক্তি—যা মৃত বস্তুকেও নিজের মধ্যে গ্রহণ ও আত্মসাৎ ক'রে নিতে পারে, অর্থাৎ যা অন্যের দেহকে ধ্বংস ও পরিপাক ক'রে নিজের পুষ্টি ও শক্তি অব্যাহত রাখে। উদ্ভিদ্ ও প্রাণী জীবনের মধ্যে পার্থক্য সেইখানেই—যেখানে উদ্ভিদ্ অনায়াসে জড়পদার্থ ও অজৈব বস্তুকেও গ্রাস করতে পারে, কিন্তু, প্রাণীর বাঁচবার জন্য প্রয়োজন হয় এমন বস্তুর, যার ইতিমধ্যেই জৈব পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে। কাজেই, যেখানে প্রাণী আছে সেখানে উদ্ভিদ্ যে থাকবেই, এ যেমন অবিসম্বাদী সত্য, তেমনি উদ্ভিদ্ যেখানে আছে সেখানে যে জলের অস্তিত্ব আছে এ সম্বন্ধে একেবারে নিঃসন্দেহ হ'তে পারা যায়। কারণ জলই হ'চ্ছে একমাত্র নিরপেক্ষ দ্রাবণক্ষম পদার্থ এবং এই জলীয় পদার্থই উদ্ভিদ্ ও প্রাণী উভয়েরই জীবন ধারণের পক্ষে প্রধান প্রয়োজনীয় পানীয়। সুতরাং উন্নত শ্রেণীর জীবের উদ্ভব ও প্রসার একমাত্র সেইখানেই সম্ভব—যেখানে প্রচুর জল ও পর্য্যাপ্ত উদ্ভিদের সমাবেশ আছে।

কিন্তু, যতদূর জানা গেছে, তাতে দেখা যায় যে জল দ্রব অবস্থায় থাকতে পারে একান্ত সঙ্কীর্ণ আবহের গণ্ডীর

মধ্যে। পৃথিবীর এই আবহের মধ্যে তাপমান ৩২ ডিগ্রীতে নামলেই জল আর দ্রব অবস্থায় থাকে না এবং তাপমান ২১২ ডিগ্রীতে উঠলেই জল একেবারে ফুটন্ত গরম হ'য়ে ওঠে! সাধারণতঃ দেখা যায় পৃথিবীর আবহ মধ্যম তাপক্রম হিসাবে তাপমানের ৬০ ডিগ্রীর মধ্যেই থাকে। কেবলমাত্র ভূমধ্য রেখার সন্নিহিত প্রদেশগুলিতেই মোটামুটি মধ্যম তাপক্রম হিসাবে ৮০ ডিগ্রীর কাছাকাছি উত্তাপ পাওয়া যায়। সুতরাং পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানেই জল বেশ দ্রব অবস্থায় নিরাপদে থাকতে পারে। কেবল উত্তর ও দক্ষিণ মেরু প্রদেশের আবহই তাপমানের ৩২ ডিগ্রী নীচেয় থাকে; কাজেই, সেখানে জল জমে তুষার বা বরফের

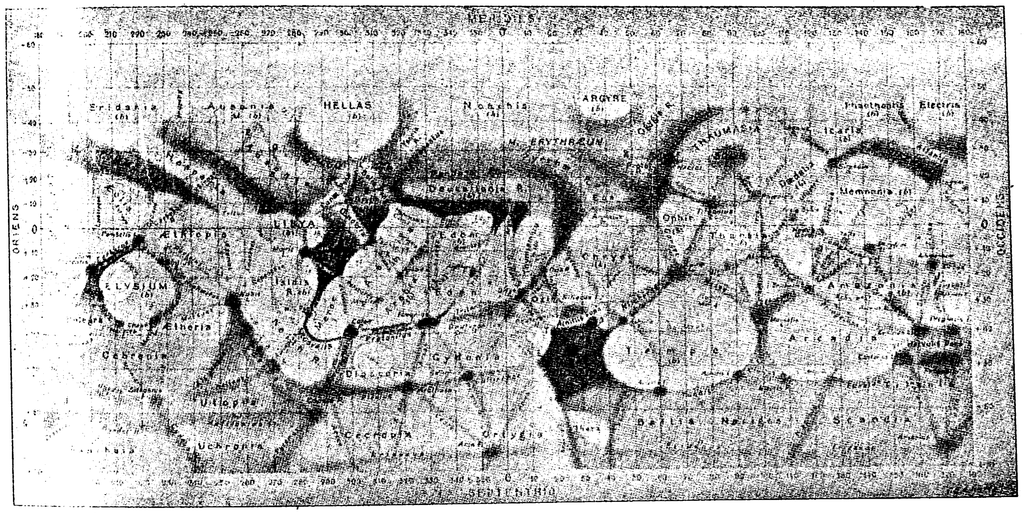

মঙ্গলগ্রহের নক্সা (কালো স্থানগুলি কোনো পুরাকালে হয়ত সমুদ্র ছিল এখন শুকিয়ে গেছে, পড়ে আছে শুধু গহ্বর! কালো রেখাগুলিকেই খাল বলে চালাবার চেষ্টা করছেন কেউ কেউ!)

আকার ধারণ ক'রেই থাকে। তবে এ দুই প্রদেশের কতকাংশ বৎসরের মধ্যে আট মাস তাপমান ৩২ ডিগ্রীর উপরে থাকে ব'লে এখানেও—মানুষের বাস না থাক্, জীবনের অস্তিত্ব আছে। তাছাড়া, উষ্ণ দেশবাসী জীব-জন্তু এমন কি মানুষের যাতায়াতও এখানে নিয়ত দেখা যায়।

সুতরাং মঙ্গলগ্রহে মানুষ বাস করে কিনা এ প্রশ্নের সমাধান করতে হ'লে প্রথমেই জানা দরকার—মঙ্গলের আবহাওয়ার অবস্থা কি রকম। সৌরমণ্ডলের অবস্থান থেকে আমরা জানতে পারি যে পৃথিবীর উপর সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপ যে পরিমাণ এসে পড়ে, তার সাত ভাগের তিন ভাগ মাত্র 'মঙ্গল' গ্রহের উপর আসে। পৃথিবী যদি সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপ পূর্ণ সাত ভাগ পাওয়ার ফলে মধ্যম তাপক্রম হিসাবে তাপমানের মাত্র ৬০ ডিগ্রীতে পৌঁছতে পেরে থাকে, তা'হলে সেই সাত ভাগের তিন ভাগ মাত্র পাওয়ার ফলে মঙ্গল মধ্যম তাপক্রম হিসাবে তাপমানের মাত্র দশ ডিগ্রীতে পৌঁছতে পারে। অথচ, দেখা যাচ্ছে যে তাপমানের ৩২ ডিগ্রীতে জল জমে বরফ হ'য়ে যায়! সুতরাং, মঙ্গলে তরল জল থাকা সম্ভব নয়। সেখানে জল তুষার, তুহিন বা বরফের মত জমাট অবস্থায় থাকতে পারে।

চিরতুষারাচ্ছন্ন কোনো গ্রহের উপর সূর্য্যের আলোকপাত হ'লে তা' উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের মত ঝল্‌মল্ করে। কিন্তু, মঙ্গলের কোনো জ্যোতি নেই। চন্দ্রের মতই মঙ্গলও একটি নিস্তেজ গ্রহ। দেখতে অগ্নিপিণ্ডের ন্যায় উজ্জ্বল রক্তবর্ণ হ'লেও তার কোনো দ্যুতি প্রতিফলিত হ'তে দেখা যায় না। এ জন্য সহজেই মনে হ'তে পারে যে তবে কি মঙ্গলেও চাঁদের ন্যায় জলের অস্তিত্ব নেই? সেও কি চাঁদের মত শুধুই লতাগুল্মহীন অনাবৃত পাহাড় পর্ব্বতে ভরা? জ্যোতির্বিদেরা বলেন—তা নয়। তাঁরা দূরবীক্ষণ

স্থানে লিখেছেন যে—"আপনাকে মনুষ্য বাসের উপযোগী ক'রে তোলবার জন্য পৃথিবীকে যেদিন নানা আয়োজন ক'রতে হ'য়েছিল, তার মধ্যে প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন হয়েছিল তার এমন একটি আঁধার অবগুণ্ঠনের বা আবরণের—যেটি ঠিক মধ্যবর্ত্তিনীর ন্যায়ই মানুষ ও পৃথিবীর নগ্নতার মাঝখানে আপনাকে বিস্তৃত ক'রে দিয়েছিল। এরই অন্তরালে চলেছিল চিরস্থায়ী পৃথিবীর রূঢ় কঠিনতার সঙ্গে ক্ষণস্থায়ী মানুষের প্রাণ-চঞ্চল লীলা!"

"এমন কি মানুষের স্বর্গবাসের যোগ্য হবার জন্য স্বর্গকেও প্রস্তুত হ'তে হয়েছিল। তার দীপ্ত জ্যোতির্ম্ময় আলোক

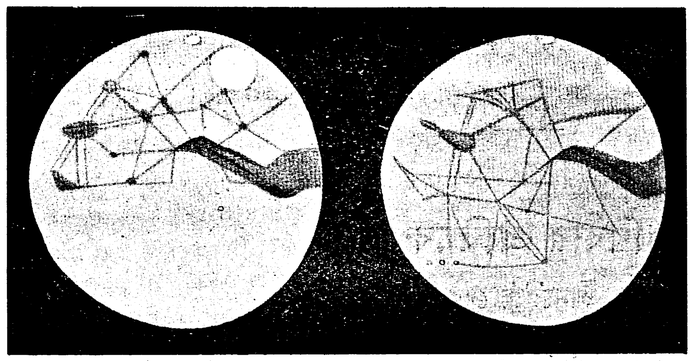

মঙ্গলগ্রহের চিত্র (শীতের প্রারম্ভে এই চিত্র নেওয়া হ'য়েছে। মাথার দিকে ফোঁটার মত সাদা দাগ প্রথম তুষারপাতের চিহ্ন। দক্ষিণের চিত্রটি এক সপ্তাহ পরে তোলা।)

শিখার—তার গভীর শূন্যতারও একটি গুণ্ঠন অপরিহার্য্য হ'য়ে উঠেছিল যার সাহায্যে সে মানুষের একান্ত ক্ষীণতা ও দৌর্ব্বল্যের অনুকূলে আপনার অসহনীয় গৌরবোজ্জ্বল মহিমাকে সংবরণ ক'রে রাখতে পারে। তবেই সম্ভব হয়েছিল মানুষের বৈচিত্র্যময় জীবন প্রবাহের সঙ্গে আকাশের অপরিবর্ত্তনীয় গতির এক আশ্চর্য্য মিতালী!"

"মানুষ ও পৃথিবীর মধ্যে এসেছিল সেদিন নব কিশলয় পল্লবচ্ছায়া! আকাশ ও মানুষের মধ্যে এসেছিল সেদিন নবঘন নীরদ মণ্ডল! তাই মানুষের জীবন হ'য়ে উঠেছে কতকটা শাখাচ্যুত পল্লবের ন্যায় অধোগামী, কতক বা লঘু শুভ্র বাষ্পতুল্য ঊর্দ্ধগামী।"

কবির কল্পনায় এই ছিল সেদিন নিজেকে মনুষ্যবাসের উপযোগী ক'রে তোলবার জন্য স্বর্গ মর্ত্ত্যের তথা গ্রহ নক্ষত্রের আয়োজন। বৈজ্ঞানিকের ভাষায় যা বলা হয়েছে তা' ভাষার দিক থেকে অন্য রকম শোনালেও, মোদ্দা কথাটা কিন্তু প্রায় একই। তাঁরাও বলেন বায়ু তাড়িত বৃক্ষপত্র এবং ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত বাষ্প চিহ্নই হ'চ্ছে মনুষ্যবাসোপযোগী গ্রহের প্রধান লক্ষণ! মনুষ্যবাসোপযোগী বলতে এইটেই বুঝতে হবে যে, তারা ঠিক মানুষ না হ'লেও—এমন কোনো জীব—যারা দেহে মনে অবিকল মানুষেরই সমকক্ষ! যে গ্রহের মধ্যে কেবলমাত্র অনাবৃত পাহাড় সূর্য্যালোকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে এবং যার শূন্যতা শুধু শুষ্ক বাতাসে ভরা সেখানে জৈব-প্রাণী বা শরীরী জীব থাকতে পারে না।

জীবনের প্রধান গুণই হ'চ্ছে জৈব দেহের সেই শক্তি—যা মৃত বস্তুকেও নিজের মধ্যে গ্রহণ ও আত্মসাৎ ক'রে নিতে পারে, অর্থাৎ যা অপর দেহকে ধ্বংস ও পরিপাক ক'রে নিজের পুষ্টি ও শক্তি অব্যাহত রাখে। উদ্ভিদ্ ও প্রাণী জীবনের মধ্যে পার্থক্য সেইখানেই—যেখানে উদ্ভিদ্ অনায়াসে জড়পদার্থ ও অজৈব বস্তুকেও গ্রাস করতে পারে, কিন্তু, প্রাণীর বাঁচবার জন্য প্রয়োজন হয় এমন বস্তুর, যার ইতিমধ্যেই জৈব পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে। কাজেই, যেখানে প্রাণী আছে সেখানে উদ্ভিদ্ যে থাকবেই, এ যেমন অবিসম্বাদী সত্য, তেমনি উদ্ভিদ্ যেখানে আছে সেখানে যে জলের অস্তিত্ব আছে এ সম্বন্ধে একেবারে নিঃসন্দেহ হ'তে পারা যায়। কারণ জলই হ'চ্ছে একমাত্র নিরপেক্ষ দ্রাবণক্ষম পদার্থ এবং এই জলীয় পদার্থই উদ্ভিদ্ ও প্রাণী উভয়েরই জীবন ধারণের পক্ষে প্রধান প্রয়োজনীয় পানীয়। সুতরাং উন্নত শ্রেণীর জীবের উদ্ভব ও প্রসার একমাত্র সেইখানেই সম্ভব—যেখানে প্রচুর জল ও পর্য্যাপ্ত উদ্ভিদের সমাবেশ আছে।

কিন্তু, যতদূর জানা গেছে, তাতে দেখা যায় যে জল দ্রব অবস্থায় থাকতে পারে একান্ত সঙ্কীর্ণ আবহের গণ্ডীর

মধ্যে। পৃথিবীর এই আবহের মধ্যে তাপমান ৩২ ডিগ্রীতে নামলেই জল আর দ্রব অবস্থায় থাকে না এবং তাপমান ২১২ ডিগ্রীতে উঠলেই জল একেবারে ফুটন্ত গরম হ'য়ে ওঠে! সাধারণতঃ দেখা যায় পৃথিবীর আবহ মধ্যম তাপক্রম হিসাবে তাপমানের ৬০ ডিগ্রীর মধ্যেই থাকে। কেবলমাত্র ভূমধ্য রেখার সন্নিহিত প্রদেশগুলিতেই মোটামুটি মধ্যম তাপক্রম হিসাবে ৮০ ডিগ্রীর কাছাকাছি উত্তাপ পাওয়া যায়। সুতরাং পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানেই জল বেশ দ্রব অবস্থায় নিরাপদে থাকতে পারে। কেবল উত্তর ও দক্ষিণ মেরু প্রদেশের আবহই তাপমানের ৩২ ডিগ্রী নীচেয় থাকে; কাজেই, সেখানে জল জমে তুষার বা বরফের

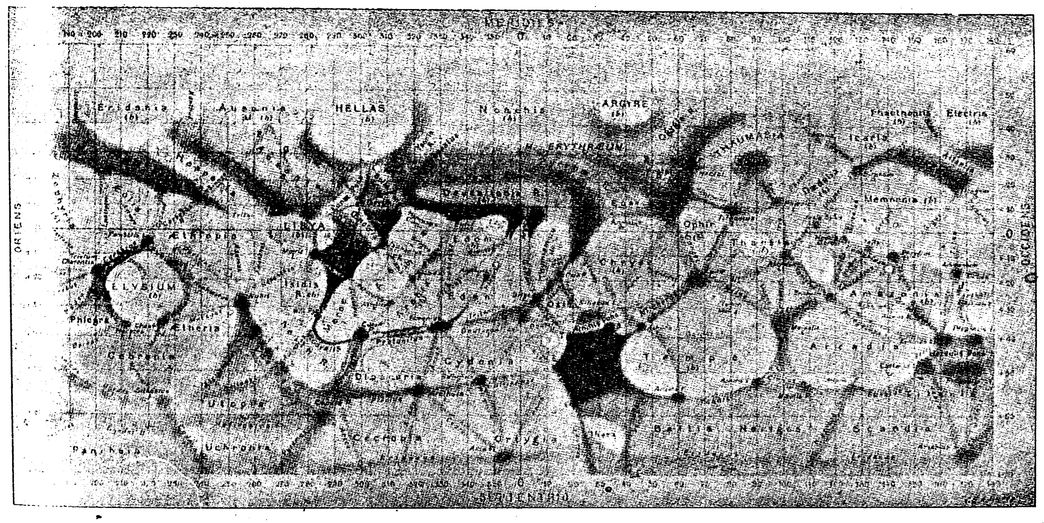

মঙ্গলগ্রহের নক্সা (কালো স্থানগুলি কোনো পুরাকালে হয়ত সমুদ্র ছিল এখন শুকিয়ে গেছে, পড়ে আছে শুধু গহ্বর! কালো রেখাগুলিকেই খাল বলে চালাবার চেষ্টা করছেন কেউ কেউ!)

আকার ধারণ ক'রেই থাকে। তবে এ দুই প্রদেশের কতকাংশ বৎসরের মধ্যে আট মাস তাপমান ৩২ ডিগ্রীর উপরে থাকে ব'লে এখানেও—মানুষের বাস না থাক্, জীবনের অস্তিত্ব আছে। তাছাড়া, উষ্ণ দেশবাসী জীব-জন্তু এমন কি মানুষের যাতায়াতও এখানে নিয়ত দেখা যায়।

সুতরাং মঙ্গলগ্রহে মানুষ বাস করে কিনা এ প্রশ্নের সমাধান করতে হ'লে প্রথমেই জানা দরকার—মঙ্গলের আবহাওয়ার অবস্থা কি রকম। সৌরমণ্ডলের অবস্থান থেকে আমরা জানতে পারি যে পৃথিবীর উপর সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপ যে পরিমাণ এসে পড়ে, তার সাত ভাগের তিন ভাগ মাত্র 'মঙ্গল' গ্রহের উপর আসে। পৃথিবী যদি সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপ পূর্ণ সাত ভাগ পাওয়ার ফলে মধ্যম তাপক্রম হিসাবে তাপমানের মাত্র ৬০ ডিগ্রীতে পৌঁছতে পেরে থাকে, তা'হলে সেই সাত ভাগের তিন ভাগ মাত্র পাওয়ার ফলে মঙ্গল মধ্যম তাপক্রম হিসাবে তাপমানের মাত্র দশ ডিগ্রীতে পৌঁছতে পারে। অথচ দেখা যাচ্ছে যে তাপমানের ৩২ ডিগ্রীতে জল জমে বরফ হ'য়ে যায়! সুতরাং, মঙ্গলে তরল জল থাকা সম্ভব নয়। সেখানে জল তুষার, তুহিন বা বরফের মত জমাট অবস্থায় থাকতে পারে।

চিরতুষারাচ্ছন্ন কোনো গ্রহের উপর সূর্য্যের আলোকপাত হ'লে তা' উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের মত ঝল্‌মল্ করে। কিন্তু, মঙ্গলের কোনো জ্যোতি নেই। চন্দ্রের মতই মঙ্গলও একটি নিস্তেজ গ্রহ। দেখতে অগ্নিপিণ্ডের ন্যায় উজ্জ্বল রক্তবর্ণ হ'লেও তার কোনো দ্যুতি প্রতিফলিত হ'তে দেখা যায় না। এ জন্য সহজেই মনে হ'তে পারে যে তবে কি মঙ্গলেও চাঁদের ন্যায় জলের অস্তিত্ব নেই? সেও কি চাঁদের মত শুধুই লতাগুল্মহীন অনাবৃত পাহাড় পর্ব্বতে ভরা? জ্যোতির্বিদেরা বলেন—তা নয়। তাঁরা দূরবীক্ষণ

যন্ত্রের সাহায্যে বিশেষ ভাবে নিরীক্ষণ ক'রে দেখেছেন যে ঠিক পৃথিবীর ন্যায়ই মঙ্গলের দুই মেরুপ্রদেশও তুষার কিরীটে আবৃত, অন্যান্য অংশ নয়। শীতের সময় এই উভয় মেরু প্রদেশের তুষার আবরণ ক্রমশঃ অধিকদূর পর্য্যন্ত প্রসার লাভ করে, আবার গ্রীষ্মকালে তা' ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হয়। শীত ও গ্রীষ্মে মঙ্গলের মেরুপ্রদেশে এই যে পরিবর্ত্তন দেখতে পাওয়া যায়, কেবলমাত্র কঠিন পাষাণ চূড়ার পক্ষে এটা সম্ভব নয়। এ যে নিশ্চিত বরফ জমে ওঠা ও বরফ গলে যাওয়ার ব্যাপার, তা'তে আর কোনো সন্দেহ

গ্রীষ্মকালে মঙ্গলের রূপ (নিম্নের উজ্জ্বল অংশের জ্যোতির্বিদেরা নাম রেখেছেন "আয়েরিয়া"। সূর্য্যের তেজ কম থাকে যখন তখন এ অংশ সাদা দেখায়। মধ্যাহ্নে লাল্ মাটি স্পষ্ট চোখে পড়ে। কাল অংশটুকুর নাম রেখেছেন জ্যোতির্বিদেরা 'সায়ার্টিস্ মেজর'; এর উপরের বড় সাদা টিপটিকে বলে 'হেলাস্' দ্বীপ। তারও উর্দ্ধে একেবারে কিনারার সাদা টিপটি তুষারাচ্ছন্ন মেরুশিখর)

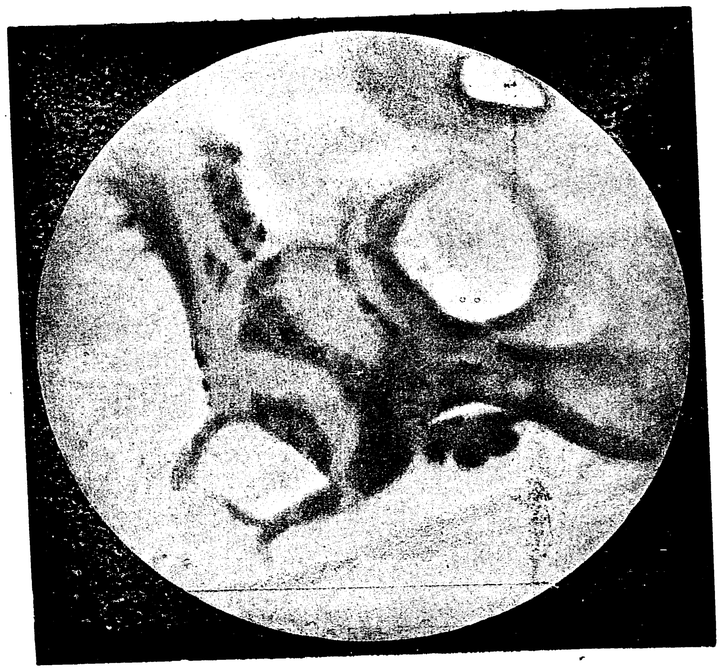

থাকতে পারে না। এখন কথা হ'চ্ছে এই যে—বরফ গলে গিয়ে কি অবস্থায় থাকে? তরল জলের রূপ ধারণ করে কি?

শীতের সময় পৃথিবীর মেরুপ্রদেশে তুষরাবরণের প্রসার যতটা বাড়তে দেখা যায়, মঙ্গলের মেরুপ্রদেশে কিন্তু অতটা চ'খে পড়ে না। আবার গ্রীষ্মকালে যখন কমতে থাকে পৃথিবীর মেরুপ্রদেশে তা কতকটা ক'মে আর কমে না! কিন্তু মঙ্গলের মেরুপ্রদেশে তা কমতে কমতে ক্রমশঃ একেবারে নিঃশেষে লুপ্ত হয়ে যায়। এই কারণে কেউ কেউ মনে করেন যে মঙ্গল শীতপ্রধান গ্রহ হ'তেই পারে না, বরং পৃথিবী অপেক্ষা সে অনেক বেশী উষ্ণতর, বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে।

বিশেষজ্ঞেরা বলেন, এ ধারণা নিঃসন্দেহে বলে মেনে নেওয়া চলতো—যদি আমরা মঙ্গলের সম্পূর্ণ রূপ সকল দিক থেকে দেখবার সুযোগ পেতুম। কিন্তু দূরবীক্ষণের সাহায্যে মঙ্গলের যেটুকু অংশ আমরা দেখতে পাই সেটাকে মঙ্গলগ্রহের একটা মোটামুটি চেহারা বলা চলে না। পৃথিবীর দিকে ফিরিয়ে আছে সে শুধু তার সুন্দর মুখখানি। আমরা দেখতে পাই কেবলমাত্র তার হাসিমুখ বা প্রসন্নমূর্ত্তিটি! অর্থাৎ দূরবীক্ষণে দেখা যায় মাত্র মঙ্গলের অয়নান্তবৃত্ত-ভাগ—তার নিদাঘ মধ্যাহ্নের দীপ্ত রূপ! কিন্তু আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে থেকে যায়—তার শীতকাতর হিমাবৃত অংশটুকু!

পৃথিবীর মধ্যম তাপক্রম মোটামুটি ৬০ ডিগ্রী হ'লেও তার অয়নান্তবৃত্তের তাপমান গ্রীষ্মকালে ১০০ ডিগ্রীরও উপরে উঠে যায়। সুতরাং পৃথিবীর পরিবর্ত্তনের এই অনুপাতে যদি মঙ্গলগ্রহের তাপমানের হিসাব ধরা যায়—তাহলে এর বিষুব-রেখার মধ্যভাগের তাপ ৫০ ডিগ্রীতে এসে দাঁড়ায়। দূরবীক্ষণে মঙ্গলের এই অবস্থাই আমাদের চোখে প'ড়ে। কিন্তু মঙ্গল সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানতে হ'লে এই গ্রহের মধ্যম তাপক্রম কি তা অবগত হওয়া দরকার,

তার আবহের ক্রম পরিবর্ত্তনের হিসাব পাওয়া চাই। মধ্যাহ্ন থেকে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত এর তাপক্রম কখন কি অবস্থায় থাকে, গ্রীষ্ম ও শীতে এর তাপক্রম কি এবং বিষুব-রেখা থেকে মেরুপ্রদেশ পর্য্যন্ত এর আবহক্ষেত্রের বিভিন্ন অবস্থা জানা চাই।

অনুমানে মনে হয় পৃথিবী অপেক্ষা মঙ্গলগ্রহে এই আবহ ও তাপক্রমের পরিবর্ত্তন অনেক বেশী। পৃথিবী ও মঙ্গল গ্রহের মাধ্যাকর্ষণের পার্থক্যের উপরই এই অনুমান প্রতিষ্ঠিত। যতদূর জানা গেছে তাতে স্থির হয়েছে যে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের যা বেগ বা গতি—মঙ্গলে তার পরিমাণ আট ভাগের তিন ভাগ মাত্র। অর্থাৎ, পৃথিবীতে দেখা যায় একটা কোনো ভারি জিনিস উপর থেকে নীচেয় পড়তে তার গতির সীমা প্রতি সেকেণ্ডে ১৬ ফুট পর্য্যন্ত! কিন্তু মঙ্গল গ্রহে যদি কোনো ভারি জিনিস উপর থেকে নীচেয় পড়ে তবে তার বেগ বা গতির সীমা এক সেকেণ্ডে ছ'ফুটের বেশী হবে না। এ থেকে বোঝা যায় যে মঙ্গল গ্রহের আবহাওয়ার অবস্থা পৃথিবী হ'তে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র! পৃথিবীতে সওয়া তিন মাইলের কিছু উর্দ্ধে উঠলেই মাথার উপর দিকে আবহের চাপ একেবারে অর্দ্ধেক কমে যায়। আরও সওয়া তিন মাইলের কিছু উর্দ্ধে উঠলে বাকি চাপটুকুর আবার অর্দ্ধেক কমে যায়, এমনি ক'রে ক্রমেই কমতে থাকে। এই ভাবে যদি মঙ্গল গ্রহ থেকে উর্দ্ধে ওঠা যায়, তাহ'লে অন্ততঃ পৌনে ন'মাইল উপরে উঠলে তবে সেখানে আবহের চাপ অর্দ্ধেক কম পাওয়া যাবে এবং তার আবার অর্দ্ধেক কমে যাবে সাড়ে সতেরো মাইল উর্দ্ধে উঠলে। পৃথিবীর আবহের চাপ যে পরিমাণ দেখা যায়, মঙ্গলগ্রহের আবহ যদি ঠিক তদনুরূপ হ'ত, তাহ'লে তার চাপের পরিমাণ দাঁড়াতো পৃথিবীর আবহ চাপের তিনগুণ বেশী! অর্থাৎ, সে অবস্থায় মঙ্গল গ্রহের রূপ আমাদের দৃষ্টি গোচর হোত না! অথচ দূরবীক্ষণে মঙ্গলের রূপ আমরা বেশ সুস্পষ্টই দেখতে পাই। চাঁদের উপরটি যেমন পরিষ্কার আমাদের চোখে পড়ে, মঙ্গলের বহিরাবরণও ঠিক তেমনি পরিষ্কার আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়! সুতরাং, এই একটা বিষয়ে এখন বেশ নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যে মঙ্গলের উপরের আবহ আবরণ চাঁদের মতই অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও ক্ষীণ। হয়ত তা পৃথিবীর আবহ চাপের সাত ভাগের এক ভাগ মাত্র! অথবা, তার চেয়েও কম!

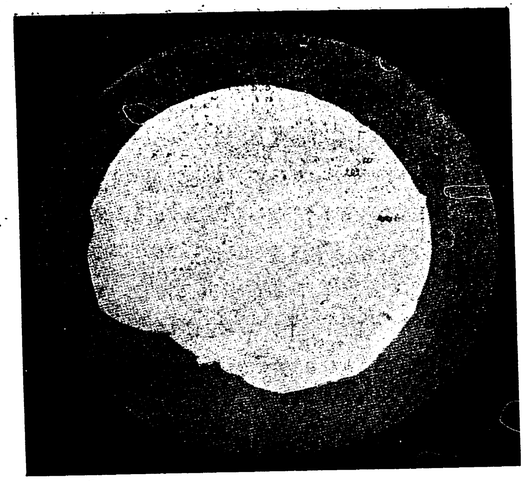

কিন্তু এই লঘুত্বের হেতু হচ্ছে—সেখানে বায়ুর অত্যধিক স্বচ্ছতা বা অপ্রগাঢ়তা! তা যদি হয়, তাহ'লে এও সুনিশ্চিত যে

মঙ্গলের দক্ষিণ গোলার্দ্ধের মানচিত্র (শীতের সময় মেরু প্রদেশের তুষারাস্তরণ যে কতখানি বিস্তৃত হ'য়ে পড়ে, তা এ থেকে বোঝা যাবে)

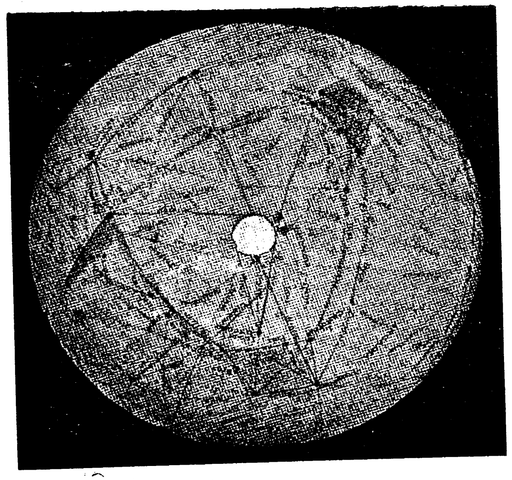

মঙ্গলের উত্তর গোলার্দ্ধের মানচিত্র (গ্রীষ্মের দিনে মেরু প্রদেশের তুষারাবরণ কমে কত ছোট হ'য়ে পড়ে, তা এ থেকে জানা যাবে)

পৃথিবীর আবহের পরিবর্ত্তনের তুলনায় মঙ্গলের আবহের পরিবর্ত্তন অনেক বেশী পরিমাণে বৈচিত্র্যময়!

মঙ্গল গ্রহে ঋতুচক্রের পরিক্রমণ কিন্তু অত্যন্ত মন্থরগতিতে চলে। এর কারণ—সূর্য্যের উত্তাপ সেখানে অতি সামান্যই প্রবেশ করে এবং এই গ্রহের 'মাধ্যাকর্ষণের বেগও নিতান্ত ক্ষীণ। একটা ঢিল ফেললে সেখানে যেমন এক সেকেণ্ডে ছ' ফুটের বেশী বেগে সেটা নীচের দিকে পড়ে না, অথচ পৃথিবীতে সেটা এক সেকেণ্ডে ষোলো ফুট ছোটার বেগে নামে, সেই রকম মঙ্গলগ্রহে তপ্ত বায়ু বা উষ্ণ বাষ্পও উপরদিকে ওঠে তেমনিই ধীর মন্থর গতিতে! কোনো কোনো 'মঙ্গল' গ্রহ-সন্ধানীরা লিখে গেছেন—সেখানে নাকি দিনরাত ঝড়ের বেগে বাতাস বইছে! দুর্য্যোগের দিনে সেখানে প্রলয় ঝঞ্ঝার উন্মত্ত নৃত্য সুরু হয়, ঘূর্ণী বাতাসও ঘোরতর আঁধির প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা চলে। তাঁদের এ অনুমান কিন্তু সত্য নয়। মঙ্গলের শান্ত নির্ম্মল সূক্ষ্ম আবহের অভ্যন্তরে এরূপ দানবীয় তাণ্ডব কোনো মতেই সম্ভব হ'তে পারে না। তাঁদের এই উদ্ভট অনুমানের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। এ সমস্ত অনভিজ্ঞদের নিছক কল্পনা মাত্র!

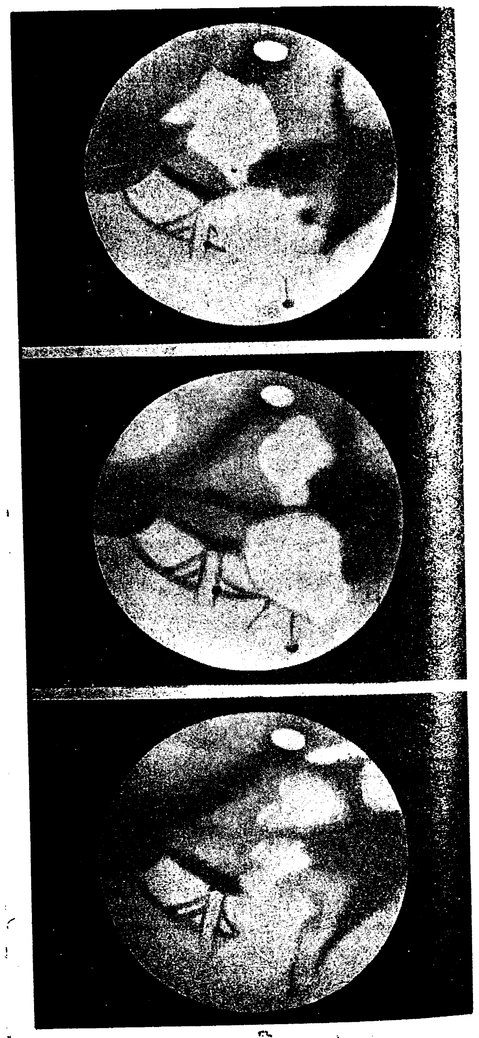

মঙ্গলে মেঘোদয় (জনৈক জার্ম্মাণ জ্যোতির্বিদ মঙ্গলে বিষুব রেখার চারপাশে এই বাষ্পমণ্ডল দেখতে পান এবং এর আকারের দ্রুত পরিবর্ত্তন থেকে তিনি একে মেঘোদয় ব'লেই স্থির করেন। তাঁর এ অনুমান যদি নির্ভুল প্রমাণ হয়, তাহ'লে মঙ্গলে জীবের বাস অসম্ভব হবে না। কারণ যেখানে মেঘ দেখা যায় সেখানকার আবহাওয়া প্রাণী জীবনের অনুকুল)

মঙ্গলে মেঘোদয় (রূপান্তর)

মঙ্গলে মেঘোদয় (আবার রূপান্তর)

মঙ্গলগ্রহের মেরুশিখরে যে তুষার কিরীট দেখা যায়,

নিদাঘ সূর্য্যের খরতাপে যাঁরা তা' গলে যেতে দেখেছেন, তাঁদের এই সংবাদেরও দু'দিক থেকে প্রতিবাদ করা চলে। প্রথমতঃ যেরূপ সত্বর এই বরফের আবরণ গলে যায়, তাঁরা বলেন তাতে আর যাই হোক এটা নিশ্চিতরূপে প্রমাণ হয়ে যায় যে সূর্য্যের উত্তাপে এমনটা সম্ভব নয়। কারণ পৃথিবী মঙ্গলগ্রহের অপেক্ষা বহুগুণ বেশী সূর্য্যের উত্তাপ ভোগ ক'রে, তথাপি পৃথিবীর মেরু প্রদেশ চির তুষারাচ্ছন্নই থেকে যায়! তা'ছাড়া দ্বিতীয় কথা হ'চ্ছে মঙ্গলগ্রহ যে বছরের কোনো সময়ে যথার্থই গভীর তুষারাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ে—এর কোনো নিঃসন্দেহ বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি এ পর্য্যন্ত; বরং সেখানে প্রবল তুষারপাত কোনো কালে সম্ভব হ'তে পারেনা বলেই মনে করার যথেষ্ট নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। "মঙ্গলগ্রহে যখন দারুণ শীতের আবির্ভাব হয় তখন অতি ক্ষুদ্র জলকণাও জমে তুষার কণায় রূপান্তরিত হয় এবং তা সূর্য্যালোকে বরফের কুচির মতই চিক্‌মিক্ ক'রে" এমন কথাও কেউ কেউ বলেছেন। অপর পক্ষে দেখা যায় যে মঙ্গল গ্রহের মধ্যম তাপক্রম যদিও পৃথিবী অপেক্ষা অনেক কম, তবু সেখানকার দৈনিক আবহ অথবা বার্ষিক ঋতুর এমন একটা চরম পরিবর্ত্তন মোটেই অসম্ভব বা অভূতপূর্ব্ব নয়, যখন মঙ্গলের তাপমান প্রায় পৃথিবীর সম-পর্য্যায়ে এসে দাঁড়াতে পারে। বিশেষ করে—বিষুবরেখার অন্তর্গত প্রদেশে নিদাঘ মধ্যাহ্নে সূর্য্য যখন ঠিক মাথার উপর আসে, সেই সময় প্রতিদিন অন্ততঃ ঘণ্টা দুয়ের জন্য সেখানকার আবহ পৃথিবীর সঙ্গে সমান হ'য়ে ওঠবারই কথা। এই সম্পর্কে মঙ্গলগ্রহের আর একটা ব্যাপার মনে রাখা দরকার যে—সেখানকার আবহের চাপ অত্যন্ত লঘু হওয়ায় ফলে জল সেখানে তাপমানের ১০০ থেকে ১২৫ ডিগ্রীর মধ্যেই ফুটন্ত গরম হয়ে ওঠে, কিন্তু পৃথিবীর পক্ষে তাপমান ২১২ ডিগ্রীতে না পৌঁছলে জল ফুটন্ত গরম হয়ে ওঠা সম্ভব নয়! সুতরাং ঐ যে ক্ষুদ্রতম তুষার কণাগুলির জমে ওঠার সম্ভাবনা শোনা যায় সেগুলির বরং গলে যাওয়া বা শূন্যে মিলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই সমধিক!

মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে এই যে ধারণায় এসে পৌঁছেচেন বর্ত্তমান জ্যোতির্বিদেরা, তার কারণ, ঘন ঘন এই গ্রহটিকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নানাদিক থেকে বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করার ফলে তাঁদের এই বিশ্বাসই দৃঢ় ও বদ্ধমূল হ'য়ে উঠেছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দিক থেকে মঙ্গলগ্রহের একাধিক আলোকচিত্র নিয়ে তাঁরা দেখেছেন যে এর ভৌগলিক অবস্থা মোটেই সুবিধাজনক নয়। মঙ্গলগ্রহের মধ্যে যে অসংখ্য নদী বা খাল কাটা আছে ব'লে একটা সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে সেটা একেবারেই আজগুবি! আলোকচিত্রে প্রতিফলিত যে রেখাগুলিকে জলপ্রবাহ ব'লে ধ'রে নেওয়া হ'য়েছে তা সম্পূর্ণ ভুল, কারণ পূর্ব্বেই বলেছি মঙ্গলে জলের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। তবে এটা ঠিক যে সকালে ও সন্ধ্যায় সেখানে একটা লঘু শুভ্র তুষার আবরণ মেরু প্রদেশকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখে, কিন্তু দিবসে দিবাকর তাপে তা মিলিয়ে যায় এবং মঙ্গলের লালমাটি সুস্পষ্ট চোখে পড়ে।

কিন্তু সে যাই হোক মঙ্গলের আবহাওয়ার এই এলোমেলো অবস্থায় পৃথিবীর প্রতিবেশী এই গ্রহটির মধ্যে কোনো উদ্ভিদের ভূমিষ্ঠ হওয়ার চেয়ে বেঁচে থাকা আরও কঠিন। প্রাণী বা জীবজন্তুর অস্তিত্ব ত' দূরের কথা, ক্ষুদ্র তৃণ-গুল্মের পর্য্যন্ত মঙ্গলগ্রহে বাস করা অসম্ভব! অতএব মঙ্গলে মানুষের বাস যে নেই একথা বলাই বাহুল্য!

পাক-চক্র

শ্রীবটকৃষ্ণ রায়

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গণেনবাবুর সুসজ্জিত কক্ষ

(টেবিলের ধারে বসিয়া গণেনবাবু কাগজ পত্র দেখিতেছেন। তাঁহার গায়ে ড্রেসিং গাউন, চোখ চশমা ও হাতে একটি লাল পেন্‌সিল। চোখ হইতে চশ্‌মা খুলিয়া ও পেন্‌সিল কাগজের উপর রাখিয়া 'কলিংবেল' টিপিলেন। একজন ভৃত্য প্রবেশ করিল।)

গণেন। ওরে! গাড়ী বার ক'র্‌তে বল।

ভৃত্য। দিদিমণি মোটর নিয়ে বেরিয়েছেন। মা ও গেছেন—বলে গেছেন এখনই ফিরবেন।

গণেন। আচ্ছা যা। ড্রাইভারকে কোথাও এখন যেতে মানা ক'রে দিস্।

(এমন সময় বাহিরে একটা গোলমাল শুনা গেল। ক্ষণ পরেই কার্ত্তিককে ধরিয়া লইয়া রমেন প্রবেশ করিল ও একটা ইজি চেয়ারে তাহাকে শোয়াইয়া দিল; পশ্চাৎ পশ্চাৎ মণিমালা ও তাহার মা ব্যস্তভাবে প্রবেশ করিলেন।)

কমলা। দেখ দেখি তোমার মেয়ের কাণ্ড! ভাল মানুষ ছেলে রাস্তা দিয়ে আসছিল, আর তোমার মেয়ে—মহিষমর্দ্দিনী—একেবারে তার গায়ের ওপর গাড়ী তুলে দিলে!

রমেন। ওর বেশী লাগে নি, মাসীমা! তুমি মণিকে অত ব'কো না।

গণেন। কিরে মণি, তুই ছেলেটিকে মোটর চাপা দিয়েছিস্?

রমেন। না মেসোমশাই, চাপা নয়—শুধু ইয়ে—এই গায়ে একটুখানি ধাক্কা লেগে গেছ ল।

মণি। আমার কোনও দোষ নেই বাবা; দেখলাম উনি ফুটপাথে উঠে যাচ্ছেন। আমি খুব আস্তে গাড়ীটা দরজায় লাগাচ্ছিলাম, এমন সময় উনি হঠাৎ নেমে দাঁড়াতেই, একটা মাডগার্ড একটু ওঁর গায়ে লেগে গেল।

কমলা। একটু লাগা নয় মণি! বাছা আমার "সপাটে" পড়ে গেল। কিন্তু এমন ভাল ছেলে গো, যে তখনই উঠে প'ড়ে হাস্‌তে লাগ্‌ল—বলে "আমারই দোষ—আমার দেখা উচিত ছিল।"

রমেন। মণি, তুমি দৌড়ে "জলপটি" নিয়ে এসে ওর হাত দুটোয় লাগিয়ে দাও। (কমলার প্রতি) সত্যিই মণির কিছু দোষ নেই। ও যেন তোমাদের আস্‌তে দেখে কেমন ইয়ে হয়ে গেল। নিজেকে সামলাতে পারলে না।

গণেন। তবে আর মণির কি দোষ বল? হাঁ করে রাস্তা চল্‌লে, মানুষে তার কি করবে?

(মণি আসিয়া জলপটি লাগাইয়া দিল)

কার্ত্তিক। আজ্ঞে, ওঁর দোষ একেবারেই নেই। আর, এখন আমি কোন ব্যথাই বুঝতে পারছি না। জলপটি দিতেই সব ব্যথা যেন জল হয়ে গেল।

গণেন। তোমার কোনও মতলব ছিল না ত হে বাবু!

কার্ত্তিক। (অপ্রতিভভাবে) আজ্ঞে?

কমলা। তোমার যেমন কথা--তোমার মেয়ে দিলে ধাক্কা, আর ওর থাক্‌ল মতলব।

গণেন। তুমি জান না—মতলব কখনও কখনও থাকে। বল না হে ছোক্‌রা, কিছু মতলব ছিল? সম্প্রতি মোটা টাকার লাইফ ইনসিওর করেচ না কি?

কার্ত্তিক। আজ্ঞে, না।

গণেন। (রমেনের প্রতি) আমি শুনেছি অনেক ছেলে 'লাভে' টাভে প'ড়েও ঐ রকম আত্মহত্যা করতে গিয়েছে।

কার্ত্তিক। (বিরক্তির ভাণ করিয়া) আমি loveএ পড়ে? উঃ—

কমলা। (তাড়াতাড়ি) না বাবা, না! ওসব কথার তুমি জবাব দিও না।

রমেন। কার্ত্তিক আমার বন্ধু, মেসোমশাই! ওর শরীরে—বা মনে—কোনও দোষ নেই। স্ত্রীলোককে ভালবাসা দূরে থাক, ওর কেমন তাদের ওপর একটা ইয়ে—অর্থাৎ কেমন একটা—মানে ভালবাসা ত সম্ভবই নয়, বরঞ্চ ইয়ে (মণি একটা জলপটি ভাল করিয়া লাগাইয়া দিতেছিল, পটিটা

তাহার হাত হইতে পড়িয়া গেল। সে কুড়াইতে ভুলিয়া গিয়া রমেনের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল)।

কার্ত্তিক। (বেদনার ভাণ করিয়া) উঃ!

গণেন। আহা—মণি! দেখতে পাও না? পটিটা পড়ে গেছে যে! ভাল ক'রে লাগিয়ে দাও (পাশের ঘরে প্রস্থান)

(মণিমালা জলপটি পুনরায় লাগাইল)

কার্ত্তিক। আঃ—(মণির প্রতি গদগদভাবে চাহিতে—মণি চোখ ফিরাইয়া মুখ নত করিল)

রমেন। দেখ মাসিমা, আর্থিক অবস্থা এদের খুবই ভাল—আর লেখাপড়াতেও কার্ত্তিক বেশ পণ্ডিত। গেলবারে 'ল' পাশ করেছে। মা বাপের ছোট ছেলে। এবার ত ওর বিয়ে করা উচিত?—এঁ্যা? কি বল মাসিমা? এখন বউ নিয়ে এলে সে কত আদরের বউ হবে! ও কিন্তু কিছুতেই—

কমলা। তেমন ভাগ্যিমানি মেয়ে জন্মে থাকলে তবে ত ওর বিয়ের মন হবে। রূপে-গুণে এমন ছেলেকে যারা জামাই পাবে তাদের কত বড় অদৃষ্ট! উনি আবার এই ছেলেকে বলেন—"আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল;" কথার ধরণ দেখ না!

রমেন। আমি কিন্তু ওকে ছাড়বো না, মাসীমা! একটি যথার্থ সুন্দরী মেয়ে—এই কিছু লেখাপড়া শিখেছে—ভাল গান-টান গাইতে পারে—এই রকম একটি মেয়ের সন্ধান করচি দাঁড়াও। বিয়ে কোর্ব্বো না বল্লেই বিয়ে কোর্ব্বো না? আর সুবিধেও যে আছে। বড় ছেলে ত নয়—কেবল বোস্ ছাড়া সব ঘরেই হবে। বেশী খুঁজতে হবে না।

কমলা। ওর পছন্দ ত নয়, তুই তোর নিজের পছন্দ মত কথা বলচিস্। লেখাপড়া, গান বাজনা ও সব কি ওর—

রমেন। না মাসীমা! ও বিয়ে করতে নারাজ বটে, কিন্তু মেয়েরা লেখাপড়া শেখে, গান গায়, এমন কি মোটর চালায়, তাও ওর পছন্দ।

(কার্ত্তিক মণিমালার মুখের প্রতি চাহিতেই মণির সহিত চোখো-চোখি হইয়া গেল। মুহূর্ত্ত পরে উভয়ে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল)

কার্ত্তিক। একটু ঠাণ্ডা জল! উঃ!

কমলা। যা না রে, মণি! সরবৎ তৈয়ারী আছে, একটু নিয়ে আয় দেখি। (মণির প্রস্থান)

রমেন। আমি ততক্ষণ একটা গাড়ী ডাকি মাসীমা।

কমলা। (একটু দূর হইতে) এখনই যেতে পারবে কি ও ছেলে?

রমেন। খুব পারবে।

কার্ত্তিক। (রমেনের দিকে মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার চাহিয়া—এখানে আর একটু থাকিবার ইচ্ছা জানাইল) উঃ—উঃ—

রমেন। (কার্ত্তিকের নিকটে সরিয়া দাঁড়াইয়া, চাপা গলায়) এই চুপ কর্।

কমলা। বলচি, আর একটু থেকে গেলে হোতো না?

কার্ত্তিক। (কাতরভাবে) তা—একটুখানি—না হয়—উঃ—

রমেন। (নিম্নস্বরে) বাড়াবাড়ি করিস্‌নে হতভাগা! কাল তোকে ফের নিয়ে আসবো। (কমলার প্রতি) মাসীমা, আজ ওর—ইয়ে—যে চোট্‌টা লেগেছে, দেরী করে যেতে গেলে, হয়ত তখন আর ওকে নড়ানই যাবে না।

(সরবৎ লইয়া মণির প্রবেশ)

রমেন। এই কার্ত্তিক! আমি চট্ করে গাড়ীটা নিয়ে আসি— (প্রস্থান)

মণি। (সরবতের গ্লাস কার্ত্তিকের কাছে রাখিয়া)—একটুখানি সরবত—

কার্ত্তিক। (গ্লাস ধরিয়া তুলিতে অক্ষম এইরূপ ভাণ করিয়া) একি হোলো?—হাতটায় জোর পাচ্ছি না কেন? নিজে কি করে খাবো?

(গণেনের প্রবেশ)

গণেন। মণি! বেচারিকে তুমি খাইয়ে দাও না! একটু বিবেচনা নেই তোমাদের?

(মণি কার্ত্তিককে খাওয়াইতে লাগিল। সে পরমসুখে খাইতে লাগিল)

গণেন। (কমলার প্রতি) এই তোমার শিক্ষা আর শাসনে, মণিও সেকেলে হয়ে যাচ্ছে। একটা কি অকারণ সঙ্কোচে মানুষের যেটা অবশ্য কর্ত্তব্য—তা করতেও সাহস পায় না।

কমলা। তোমার মেয়েকে মোটর চালাতেও কি আমি

শিখিয়েছি নাকি? একটু সেকেলে হলে বরং ওর ভালই হতো।

গণেন। (নিম্নস্বরে) হাঁ যেমন ভাল সেদিন নেমন্তন্ন বাড়ীতে তোমার হয়েছিল! সে-কেলে হ'য়ে চোখ না চেয়ে চলার চমৎকার শিক্ষা হ'য়েছিল ত?

(রমেনের প্রবেশ)

রমেন। গাড়ী এসেছে। এবার ওকে নিয়ে যাই মেসোমশাই!

গণেন। আচ্ছা—কিন্তু ছেলেটি কেমন থাকে, কাল জানিও। আর, যদি বেশ ভাল থাকে ত সঙ্গে করে এখানে বেড়াতে নিয়ে এসো।

কার্ত্তিক। কাল আমি ভালই থাকব নিশ্চয়!

রমেন। (নিম্নস্বরে) আঃ! থাম্‌না গাধা।

গণেন। তা হলে রমেন, কাল এখানে চায়ের নিমন্ত্রণ রইল—তোমাদের দুজনের।

রমেন ও কার্ত্তিক। যে আজ্ঞে। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

মদনবাবুর বাটীর কক্ষ

প্রাণেশ। আচ্ছা মা! বিয়ের দিনটা তোমরা অত দেরী করে ফেললে কেন বল দেখি?

সুরমা। এর মধ্যে পাঁজিতে যে আর দিন নেই, বাবা। ঐ দিনটা এ মাসের সব প্রথম বিয়ের দিন। তাও আবার লগ্ন সেই রাত্রি দু'টোর সময়।

প্রাণেশ। ছ্যাখো, কেন যে তোমরা মিছে পাঁজি পাঁজি করে বেড়াও, তা জানিনে। এই সাহেবেরা ত পাঁজি পুঁথি দেখে না। ওদের বিয়ে হয় কি করে? আর তাতেই যেন ওদের সর্ব্বনাশ হচ্চে?

সুরমা। ওরে যাদের যা নিয়ম, সেটা মেনে চলতে হয়। পুরুষানুক্রমে যে তাই চলে আসচে।

প্রাণেশ। যে জিনিষটার কোনও মানে নাই তাই যদি তাঁরা নির্ব্বিবাদে মেনে আসতে পারেন, আমি তাঁদের বুদ্ধির প্রশংসা করতে পারি না।

সুরমা। বলিস কি তুই? অমন কথা মুখে আন্‌তে আছে?

প্রাণেশ। কেন থাকবে না? একটা যা-তা নিয়ম কোরে দিলেই হলো? তোমরা বলে পাঠাও যে ঐদিন আমি বিকেলবেলা বিয়ে কোর্ব্বো।

সুরমা। তাই নাকি হয়? এমন কথাও কখন শুনি নি। বল্‌তে পারিস তুই ওঁকে গিয়ে বল্‌গে যা। আমি ত এখনও পাগ্‌ল হই নি, যে ঐ সব কথায় থাকবো।

প্রাণেশ। যা খুসী তোমরা কর। এর পরে কিন্তু যদি কিছু গোল হয় তখন আমাকে দুষো না।

(মদনের প্রবেশ)

সুরমা। কি সাহেব ছেলেই হয়েছে তোমার—বলে বিকেলবেলা বিয়ে করবো। (হাসিয়া) আবার বলে "বিয়ের দেরী ক'র্‌চ কেন?"

মদন। সাহেবদের সঙ্গে রাতদিন মেলামেশা করেও একটু ঐ রকম হয়ে গেছে। ও-সব দুদিনে এঁদের সেরে যাবে। তা, হ্যাঁগা! আমি একবার ক'নেটি পর্য্যন্ত দেখতে যাবো না?

সুরমা। তুমি আর এখন দেখতে গিয়ে কি করবে? ছেলের যখন এমন পছন্দ হয়েচে যে আজই তাকে ঘরে আনতে চায়—তখন তোমার দেখতে গিয়ে কি লাভ? মেয়ে, কিম্বা তার বাপ মা, কি তাদের আর কোনও কিছু—যদি তোমার মনোমত নাই হয়, তা তোমার ছেলের সুখের জন্য এখন আর কোন আপত্তি করা চলবে না।

মদন। তা বটে!

সরমা। ও গো, কে আসছে তোমার কাছে।

মদন। তাই ত! তুমি একটু সরে যাও।

(সুরমার প্রস্থান)

মদন। এই যে নলিনবাবু! কি মনে করে? আসুন, আসুন।

নলিন। এলাম আপনার কাছে দুটো কাজে। আপনার "লাইফ্" ত আমি ইনসিওর করিয়েছিলাম—এইবার ছেলেকেও একটু বলে দিন।

মদন। হ্যাঁ ও ক'র্‌বে। তবে সম্প্রতি ওর বিয়ের স্থির হয়েছে। সেইটে চুকে গেলে আমি ওকে বলে দেবো।

নলিন। বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে? এ্যাঁ—বলেন কি? আমিও যে একটা ঘটকালি করতে এসেছিলাম। তা কোথায় স্থির হোলো?

মদন। উকিল গণেন ঘোষের মেয়ের সঙ্গে।

নলিন। মদন মিত্তিরের লেনে? এই সোমবার বিয়ের দিন ঠিক ছিল?

মদন। ছিল কেন? আছে।

নলিন। হ্যাঁ, কিন্তু সেখানে—আমার এই কার্য্যসূত্রে গিয়ে, যে-রকম কথাবার্ত্তায় বুঝলাম তাতে তাঁদের মতটা যেন বদ্‌লে গেছে বলে মনে হোলো। দেখুন, আমি যে মেয়েটির কথা বলছি—সেটি সকল রকমে ভাল। তারও এক জায়গায় বিয়ের স্থির ছিল—এই সোমবারে।

মদন। তার পর?

নলিন। তার পর পাত্র সম্বন্ধে কতকগুলো খবর পেয়ে সে বিয়ে তাঁরা দেবেন না। আমি যদি ঐ দিনে কোনও ভাল পাত্রের সঙ্গে এই মেয়ের বিয়ে দিতে পারি—তাহলে কন্যাকর্ত্তা একটা মোটা টাকা ইন্‌সিওর ক'র্‌বেন ব'লে প্রতিশ্রুত হ'য়েচেন।

মদন। কিন্তু একটা হেস্তনেস্ত না হলে ত—

নলিন। তাদের যে আবার ঐ দিনে বিয়ে নইলেই নয়। উদ্যোগ আয়োজন হ'য়ে গেছে কি না! (একটু চিন্তার ভাণ করিয়া)—তা হেস্তনেস্ত আমরা নিজেরাই ত করে নিতে পারি।

মদন। কেমন করে?

নলিন। আপনি গণেনবাবুর মেয়েকে দেখেছেন ত?

মদন। না।

নলিন। তাঁদের বাড়ীতেও যান নি?

মদন। না।

নলিন। ও! (একটু চিন্তা করিয়া) তাহলে একবার নিজে মেয়ে দেখবার অছিলায় যান না। তাহলেই হাওয়াটা বুঝতে পারবেন। তার পর না হয় আমি আপনাকে কাঁসারি-পাড়ার সে মেয়ে দেখিয়ে আনবো। এর বাপ মস্ত জমিদার ছিলেন। মেয়ের নিজ নামে অগাধ বিষয় রেখে গেছেন।

মদন। বটে? তবে তাই যাওয়া যাবে।

নলিন। হ্যাঁ কালই যাবেন। নইলে অতবড় সম্বন্ধটাও হয় ত হাতছাড়া হয়ে যাবে। লোকে সন্ধান পেলে কি আর ছাড়বে মশাই!

মদন। আচ্ছা, কালই আফিসের ফেরত—ছ'টার সময়—ওদের ওখানটা হ'য়ে আসবো।

নলিন। যে আজ্ঞে। আমি তাহলে আবার এসে খবর নেবো। আজ উঠি! নমস্কার!

মদন। আচ্ছা, নমস্কার—

(নলিনের প্রস্থান)

* * * *

তৃতীয় দৃশ্য

ড্রীমার্স্ ক্লাব সংলগ্ন লন্ (lawn)

(ক্লাবের ভোজ শেষ করিয়া জনকয়েক মেম্বর আমোদ আহ্লাদে ব্যস্ত। গল্প সিগারেট প্রভৃতি চলিতেছে।)

কার্ত্তিক। নাঃ—আজ এখানকার খাওয়াটা বড় জোর হ'য়ে গেল।

সরোজ। খেতে যাবার আগে রমেন যে রকম সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে, সে আগুন পেটের ভিতর ছড়িয়ে গিয়ে একেবারে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবেই ত। কিন্তু ভাই তোমার প্রেমের লক্ষণগুলো বিলক্ষণ গোলমেলে।

কার্ত্তিক। কেন বল্ দেখি?

সরোজ। যে প্রেমিক প্রতীক্ষায় বসে আছে তার ক্ষিদে, তেষ্টা, ঘুম, কিছুই থাকে না। কিন্তু তোর যেন সব উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।

কার্ত্তিক। (কীর্ত্তন সুরে) ওরে!

পাব না বলিয়া তাহারে স্মরিয়া
মরি যে রে আপশোষে।
হতাশ হইয়া পেটটা ঠুসিয়া
খেয়েছি বেজায় ক'ষে॥

নলিন। (গুড়গুড়ি হস্তে প্রবেশ)

আমি নলটি ধরিয়া—নয়ন মুদিয়া,
তামাক্ খাইব ব'সে॥

সরোজ। নলটা একবার দাওনা নলিন্‌দা! দুটো টান দিয়েই দিচ্চি—অনেকক্ষণ খাইনি।

নলিন। বঁধুয়া—বড় সুখের কথাটি ওরে!

দিব পরিপাটী দইএর মাথাটি
দুধের সরটি তোরে॥

কার্ত্তিক। আচ্ছা, আমি প্রস্তাব করচি যে তোমাদের

মধ্যে চট করে যে একটা তামাকের গান গাইতে পারবে সেই আগে টান্‌বে।

নলিন। Right you are! তবে শোনো, আমাকে যে তামাক ধরিয়েছিল তার নিজের বাঁধা গান।

(গীত)

গুড়্‌গুড়ি তোর নলটি মুখে নিয়ে আমি কত আরাম পাই।
সকালে—একলা ব'সে, কি মজাসে, ভুড়ুক ভুড়ুক
গুড়ুক তামাক খাই।
বালাখানার মিঠে কড়া—তাওয়া দেওয়া কোল্‌কে ভরা,
তাকিয়ায় ঠেস লাগিয়ে, নলটি নিয়ে কেবল তুলি হাই॥
দুপুরে—একটু শু'লে, নলটি আমার ঘুমে ঢুলে,
আলসে প'ড়ে খ'সে, ভালবেসে যাচে বুকে ঠাঁই॥
রাতে—যখন তামাক টানি, গিন্নি পানের ডিবে আনি,
সোহাগে বস্‌লে কাছে, ভাবি পাছে বলে "গয়না চাই"।

সকলে। ফার্ষ্ট ক্লাস! নলিনদারই জয়।

কার্ত্তিক। (গুড়্‌গুড়ির নলটি নলিনের হাতে দিয়া) এটি তোমারই নিশ্চয়!

সরোজ। (নলিনের প্রতি) তা হলে মদনবাবুকে কনে দেখার প্রস্তাবে রাজি করে এসেছ তুমি। বাহাদুর ছেলে যা হোক!

নলিন। হ্যাঁ সব ঠিক করে এসেছি মদনবাবুর সঙ্গে। কাল বৈকালে ছ'টা নাগাদ—তিনি স্বয়ং গণেন বাবুর বাড়ী আসছেন।

রোহিণী। বেশ! আমরা তার একটু আগে গণেন বাবুর ওখানে গিয়ে, তাঁর কাণে এমন মন্ত্র দেবো যে তাঁকে একেবারে তুবড়িটি তৈয়ারী করে রাখব। একটু ফুলকি মদনবাবুর মুখ থেকে পড়লে—আর দেখতে হবে না।

রমেন। আর কার্ত্তিক! তুমিও আমার সঙ্গে সেখানে গিয়ে হাজির থাকবে। বুঝেছ?

কার্ত্তিক। বুঝি, আর না বুঝি—তোমার সঙ্গে যাবও ঠিক, আর হাজিরও থাকব নিশ্চয়।

রমেন। আজ আর তোর গায়ে ব্যথাটাথা কিছু নেই ত?

কার্ত্তিক। আরে রামোঃ! ঐ ধাক্কাটুকুতে ব্যথা হবে? খেপেছ তুমি?

রমেন। আচ্ছা তুই রাস্তা পার হয়ে বেশ ত ফুটপাথ অবধি উঠে এলি। আবার পেছিয়ে রাস্তায় নেমে গেলি কেন, বল্ দেখি?

কার্ত্তিক। ঐখানটাতেই ত' হোলো কবিত্ব।

রমেন। কবিত্ব? মোটরের ধাক্কার মধ্যে কবিত্ব কোথায়—তা ত' বুঝিনে।

কার্ত্তিক। (ভাবাবিষ্টের ভঙ্গীতে) ফুটপাথে সবে উঠেছি—এমন সময় মোটরের হর্ণ্ শুনে যেমন বাঁ দিকে চেয়েছি অমনি দেখি আমারই সেই মানস প্রতিমা আমার দিকে চেয়ে, চম্পক কোরকের মত আঙ্গুলগুলি দিয়ে Horn এর Bulb টাকে নির্দ্দয়ভাবে নিপীড়িত করচেন। চূর্ণ কুন্তল নানারূপ লীলাভঙ্গে তাঁর মুখের উপর বিক্ষিপ্ত হয়ে আমাকে যেন ক্ষিপ্ত করে দিলে (দ্রুত বলিয়া চলিল) অন্তরের ভেতর দোলা দিয়ে কে যেন আমাকে বল্লে—"কার্ত্তিক! এমন সুযোগ আর পাবি নে, এখন আর অগ্র-পশ্চাৎ ভাব্‌বার সময় নেই, অগ্র ছেড়ে দিয়ে পশ্চাদ্দিকে রাস্তায় নেমে পড়্—তারপর তোর অদৃষ্ট।"

নলিন। আরে কেয়াবাৎ! একি কাণ্ড হোলো রে? ক্যাব্‌লা কার্ত্তিক একেবারে প্রকাণ্ড কবি হয়ে উঠল যে রে!

কার্ত্তিক। যখন মণিমালার মোটরের মাডগার্ড আমায় ধাক্কা দিয়ে ধরাশায়ী কর্লে, আমি সেই অবস্থায়—শুয়ে শুয়ে—আমার সর্ব্বস্ব তার শ্রীচরণ কমলে সমর্পণ করবার সুযোগ পেয়ে ধন্য হলাম।

রমেন। ধন্য ত হলি, কিন্তু অন্য কথাটা তুই কি মোটেই ভাবলি নে? মোটর গাড়ীর একটা জঘন্য চরিত্র হচ্ছে এই—যে মানুষের দেহ চূর্ণ করে হাড়শূন্য করতে সে সকল যানের অগ্রগণ্য।

কার্ত্তিক। ওহে বুদ্ধিশূন্য! সাধারণ নিয়ম মানু করতে গেলে সব সময় চলে না। চালকের নৈপুণ্য হিসাবে ও সব গাড়ীর ব্যবহার হয় বিভিন্ন। আমার অন্তরে একটা অসামান্য ভাবের বন্যা আসার জন্য, অন্য কথা আর তখন মনেই হোলো না।

রমেন। নেহাৎ ধাক্কা খেয়ে অক্কা পাওয়া তোর কপালে লেখা ছিল না তাই রক্ষা পেয়ে গেলি। তবে হ্যাঁ—করেছিস্ ভাল—no risk, no gain—এখন চল্।

চতুর্থ দৃশ্য

গণেন বাবুর সজ্জিত কক্ষ।

মণিমালা জিনিষ-পত্র গুছাইতেছে ও গান গাহিতেছে।

(গীত)

ওই সখি রে! যমুনাতীরে
বাঁশীর স্বরে মাতায়ে তোলে।
পরাণ যে রে কেমন করে
কাঁদন ভরা গানের বোলে॥
কাঁপন লাগে বুকের মাঝে,
কাঁকন পাছে চলিতে বাজে,
বণিলে নূপুর মরিব লাজে,
তাই সে আছে বাঁধা আঁচলে॥
ফিরিছে কাণু, লইয়া ধেনু,
ডাকিছে মোরে আকুল বেণু,
ব্যাকুল মনে ছুটিয়া এনু,
গোপন পথে সন্ধ্যা হ'লে—
চরণ রেণু কুড়ায়ে নেবো
বিরহ জ্বালা জুড়াবে ব'লে॥

[গণেন বাবু ও সরোজকে আসিতে দেখিয়া মণিমালার প্রস্থান]

(গণেনবাবু ও সরোজের প্রবেশ)

সরোজ। (পূর্ব্ববঙ্গের অনুকরণে) না মোশয়! অ্যাড্ডা বিহিত আপনার করতে অইব। অইলেনই বা তিনি বরলোকের ছাইলা—যার ছাইলা তারই থাকেন জানি!

গণেন। (অন্যমনস্ক ভাবে) আপনার মামলাটা আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না!

সরোজ। হঃ! বোঝতে পারলেন না—না হি? আমি বুঝ্‌ছি মোশয় বুঝ্‌ছি; আপনারে ইনসাল্‌টো করার ফি'ডা আপনার হাতের মধ্যে না পড়্‌লে কিছু কাজ অইব না। এই লয়েন। (পকেট হইতে ফি'র দরুণ টাকা বাহির করিয়া টেবিলে রাখিলেন)

গণেন। না—না, তা নয়। (টাকা লইলেন) আপনি বলুন না—আর একটু আস্তে আস্তে বলবেন।

(উভয়ের উপবেশন)

সরোজ। উঁ! আচ্ছা আমি—আস্তেই কইছি।

গণেন। বলুন—একটু সংক্ষেপে; খালি কাজের কথাটুকু।

সরোজ। হঃ, কাজের কথা কইবার লাইগা আসছি—কাজ সাইরাই চইলা যাইমু। ঐ যে গণেন মিত্রের লেনে মদনবাবু কেড়া আছে না—তার ছাইলা—(মুখ বিকৃত করিয়া) ওর নামডা যেন কেমন!

গণেন। আরে মশাই আপনাকে পে'রে ওঠা যাবে না। ব্যাপারটা কি বলুন।—

সরোজ। শোনেন—ওডা খুব ওড়্‌তে লাগছে—ওড়া বোঝেন না হি?

গণেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ—আপনি বলে যান।

সরোজ। এই ডানাকাটাদের সাথে লইয়া ওড়ছে আর কি! তাই কয়খানা গহনা আমার কাছে বন্দক রাখচে। অখন দেহি সে গুলান—(কতকগুলি কেমিক্যালের গহনা বাহির করিল)

গণেন। কে? মদনবাবুর ছেলে "প্রাণেশ"?

সরোজ। হ, মোশয়! আপনি চমক মাইরা ওঠেন ক্যান্? সে আপনার কোন কুটুম্ব না হি?

গণেন। (অন্যমনস্কভাবে) হুঁ।—

সরোজ। হঃ! তা বুঝ্‌ছি। তবে আর আপনার কাছে আমার কোন প্রয়োজন নাই। আপনারে দিয়া আমার কোন কামই অইব না। নমস্কার। (প্রস্থান)

গণেন। ওগো—শুন্‌চো? (কমলার প্রবেশ) তুমি শুনেছ—লোকটা যে সব কথা বলে গেল?

কমলা। তাই ত! এ সব কথা কে জানবে বলো?

গণেন। আমি মনে করতে পারতাম যে কেউ ভাঙ্‌চি দিতে এসেছে; কিন্তু লোকটা কথা কইতে সুরু ক'রেই—ফিয়ের দরুণ অতগুলো টাকা দিয়ে দিলে। টাকা খরচ ক'রে, মেয়ের বাপের কাছে কেউ ভাঙ্‌চি দিতে আসে—এ কথা কখনও শুনি নি।

কমলা। সত্যি এখন যে আমার বড় ভয় করচে গো! সে ছেলেকে দেখেই আমার "কেমন কেমন" মনে হয়েছিল; কেবল "অরুদি"র কথায় আমি অমত করি নি। আরও কত কি শুনতে পাবো তা কে জানে?

গণেন। এখন মনে হচ্চে এ সম্বন্ধ না এলেই ভাল হতো।

কমলা। হ্যাঁ নইলে এই কার্ত্তিক—সত্যিই কার্ত্তিক! দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়—আমি ওকেই জামাই করতাম।

গণেন। তা আমাদের একটা মেয়ে—ওর পক্ষে যা ভাল হবে—তা আমরা এখনো কোর্ব্বো। এ আবার কে আসে? (কমলার প্রস্থান)

(মাতালের ভঙ্গীতে রোহিণীর প্রবেশ)

রোহিণী। আপনার নাম গণেনবাবু?

গণেন। (বিরক্তভাবে) হ্যাঁ—আপনি কে?

রোহিণী। আমার নাম অখিল—আপনি ত উকিল?

গণেন। আপনার কি চাই?

রোহিণী। আমি প্রাণেশের—প্রাণের বন্ধু—আমরা দুজনে booze—bosom friend.

গণেন। তা বেশ, এখানে কি দরকার?

রোহিণী। আমার আর কোনও প্রকার দরকার নেই, কেবল বন্ধুর জন্যে—booze—bosom friend এর জন্যে

গণেন। (রাগতভাবে) তা' আমার কাছে কি?

রোহিণী। আপনার কাছে যে এইমাত্র এসেছিল, সে আপনার হবু জামাইকে কাবু করবে বলে ঘুরে বেড়াচ্চে। ওর মকর্দ্দমা আপনি নর্দ্দমায় ফেলে দেবেন। আপনি নেবেন না, ওর মকর্দ্দমা।

গণেন। আচ্ছা, তার জন্যে মশাইয়ের আসার আবশ্যক ছিল না।

রোহিণী। না—না, তবু—আপনি হবু শ্বশুর—আমার প্রাণের বন্ধুর শ্বশুর (কাঁদিয়া ফেলিয়া) আপনি আমার গুরুজন। আপনাকে—(পা জড়াইয়া ধরিল)

গণেন। এই—এই—তুমি বাইরে যাও দেখি।

রোহিণী। সে লোকটা আমার বন্ধুর এখন শত্রু। সামান্য টাকার জন্য সে—(কাঁদিতে লাগিল)

গণেন। (একগাছা লাঠি দেখাইয়া) বেরোও বলছি। এটা দেখেছ?

রোহিণী। (উঠিতে উঠিতে) ওটা বুঝি আপনার অতিথ-মারা লাঠি? না বাবা—যাচ্চি—(যাইতে যাইতে) হবু জামাইয়ের Bosom friend—তবু অতিথ-মারা লাঠি—ওরে বাবা! সব মাটি!

(রোহিণীর প্রস্থান)

গণেন। (বসিয়া পড়িয়া) উঃ বাবা! এ কতদূরে গিয়ে পড়েছি? (হাতে মুখ ঢাকিয়া মাথা নীচু করিয়া বসিলেন)

(মদনের প্রবেশ)

মদন। কৈ মশাই? গণেনবাবু বাড়ী আছেন নাকি? তাঁকে একটু খবর দিতে হবে যে—গণেন মিত্র লেনের মদনবাবু এসেচেন।

গণেন। (মুখ তুলিয়া দেখিয়া গম্ভীরমুখে দাঁড়াইয়া উঠিলেন)

মদন। একি? আপনি—তুমি? (অবজ্ঞার ভঙ্গীতে) তুমি এখানে কি কর্‌তে এসেছ?

গণেন। আজ্ঞে এটা আমার বাড়ী কি না। (অতি সম্মানের ভাণ করিয়া) এই অধীনেরই নাম গণেন্দ্রনাথ ঘোষ।

মদন। বটে? তুমিই গণেন? একেবারে যে বিনয়ের খনি সেজে বসে আছ? ল্যাজে পা পড়েছে বলে বুঝি?

গণেন। আমার বাড়ী ব'য়ে অপমান করতে এসেছেন না কি?

মদন। আঃ! আমি তোমার মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে দিতে যাচ্ছিলাম! কি দুর্ভাগ্য!

গণেন। অ—অতটা দুর্ভাগ্য—আমার মেয়ের অন্ততঃ—আর হচ্ছে না নিশ্চয়! তোমার ছেলেটি যে একেবারে মহীরাবণের বেটা অহীরাবণ, তা কে জানতো?

মদন। আমার ছেলে—এই তোমার মত জানুবানের বাড়ীতে, তার জুতোর ধূলো—বুঝলে, জুতোর ধূলো ঝাড়তেও এসে দাঁড়াবে না।

গণেন। ছাখো, এতক্ষণ যে আমার জুতোটাও ঝাড়ি নি, তাই সে ছেলের বাপ্ আমার সামনে দাঁড়িয়ে কথা কইছে—এই রকম করে।

মদন। কি রাস্কেল?

[উভয়ের হাতাহাতি সুরু হইল, এমন সময় রমেন ও কার্ত্তিক প্রবেশ করিল। রমেন ইঙ্গিতে মদনের সহিত কার্ত্তিককে লড়িতে বলিয়া অপর কক্ষে লুকাইল—কার্ত্তিক হুঙ্কার দিয়া মদনের ঘাড়ে পড়িয়া গণেনকে ছাড়াইয়া লইল ও মদনকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল এবং গণেন বাবুর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল]

গণেন। উঃ! আর একটু হলে ঐ পাষণ্ডের হাতে প্রাণটা গিয়েছিল আর কি! বাঁচিয়েচ বাবা! আর কি বোলবো? উঃ (ভিতর দিকে প্রস্থান)

(কার্ত্তিক চেয়ারে বসিল)

(রমেন, কমলা ও মণিমালার প্রবেশ)

রমেন। ভাগিয়ে দিয়েছ ত? আমাদের কার্ত্তিকের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হয় এমন মানুষ এখনও জন্মায় নি।

(কমলাকে ও মণিকে কার্ত্তিকের হাতখানি দেখাইয়া) এমনি হাত যেন মাখনের মত নরম। কিন্তু ঘুষি বর্ষণ করবার সময়ে যেন একেবারে বজ্রমুষ্টি (কার্ত্তিক হাসিতে লাগিল)

কমলা। আহা ছেলে আমাদের জন্যে কত কষ্টই পেলে। কাল মণি দিলে অত বড় ধাক্কা। আজ আবার ঐ দস্যির সঙ্গে যুদ্ধ। বাছার এখনও গায়ের ব্যথা সারে নি।

রমেন। না—না, কিছুদিন আগেই ওর একটা ইয়ে—এই ব্যথা লেগেছিল। সেইটেই কাল একটু যেন ফের বেড়ে গিয়েছিল। আজ আবার নরম পড়েছে।

কমলা। উনি একটা ভাল ব্যথার মালিশ জানেন, তাই লাগিয়ে দিতে বোলবো? ওঁর হাতে অনেক লোকের সেরেচে।

মণি। (রমেনের প্রতি মৃদুস্বরে) ডেকে আনবো বাবাকে?

রমেন। না, না, তাঁকে ডাকবার দরকার নেই। তুমি একটা কাজ করো দেখি।

মণি। কি?

রমেন। একটু চা নিয়ে এসো। ততক্ষণ মাসীমার সঙ্গে আমার দুটো কথা আছে।

মণি। চা তৈয়ারী আছে—এখনই আনচি।

(মণির প্রস্থান)

(কমলা ও রমেন একটু দূরে দাঁড়াইলেন)

রমেন। মাসীমা! মণিরও সম্বন্ধ ত ভেঙ্গে গেল দেখচি। অথচ এই সোমবারে বিয়ের সব আয়োজন তোমাদের ঠিক। এখন তোমাদের যদি কার্ত্তিককে পছন্দ হয় ত বলো। আমি বোধ হয় সব স্থির করে দিতে পারি।

(মণিমালা চায়ের ট্রে লইয়া আসিল ও কার্ত্তিকের কাছে টেবিলে রাখিল। কার্ত্তিক কিন্তু সোজা হইয়া বসিয়া কমলার উত্তর শুনিতে উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল।)

মণি। (কার্ত্তিকের প্রতি) চা খান। এইটেতে কিছু pastry আর নোন্‌তা খাবার আছে। আমি আর একটু মিষ্টি আনি। (মণির প্রস্থান)

(কার্ত্তিক একাগ্রমনে রমেন ও কমলার কথাবার্ত্তা শুনিতেছে, আর যন্ত্রচালিতের ন্যায় চা ও জলখাবার খাইতেছে।)

কমলা। (রমেনের প্রতি) তুমি পারবে ও ছেলেকে রাজী করতে?

রমেন। সেদিন মোটরের ধাক্কাতে ওর উপকার হয়েছে মাসীমা! বুদ্ধির মালমশলা ওর মাথায় একটু বোধহয় এলোমেলো ভাবে ছড়ানো ছিল—নাড়াচাড়া পেয়ে সব ঠিক জায়গায় এসে জড়ো হয়েছে। মণিমালাকে বিয়ে করতে চায় কিনা—কাল আমি ওকে একথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। এক কথায় ও ফস্ করে বলে ফেল্লে—"হ্যাঁ"।

(কার্ত্তিক চায়ের বাটিতে একটা চুমুক দিয়া নিম্নস্বরে বলিল "আঃ")

কমলা। একটু আগে ওঁয়াকে এই কথাটিই আমি বলছিলাম। উনি কার্ত্তিকের উপর খুব সন্তুষ্ট।

কার্ত্তিক। (প্রসন্নমুখে চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়া) আ—

কমলা। কার্ত্তিকের বাপ মা রাজী হলে আমরা ওর সঙ্গেই মণির বিয়ে দেবো।

কার্ত্তিক। (চায়ের বাটীতে আবার চুমুক দিয়া আ—)

রমেন। আমি তোমাদের সুমুখেই ওর মুখের কথা নিচ্চি দাঁড়াও, মাসীমা। (কার্ত্তিকের কাছে আসিয়া) তুই বিয়ে করতে রাজী আছিস ত?

(জলখাবার ও চা খাইতে লাগিল)

কার্ত্তিক। কাকে?

রমেন। এই ধর—মণিমালাকে।

কার্ত্তিক। (মৃদুস্বরে) আবার ধরবো কেন? ঠিক্ ঠিক্ বলো না।

রমেন। আচ্ছা মণিকে বিয়ে করবি ত?

কার্ত্তিক। (জোর গলায় অথচ লজ্জিতভাবে) বাবাকে বলো গে।

রমেন। তা তো বোলবোই। তিনি আমাকে বলেই রেখেচেন যে কার্ত্তিক যদি কোন মেয়েকে পছন্দ করে—আর

সে যদি ভাল ঘরের মেয়ে হয়—তাহলে তাঁর কোনও আপত্তি থাকবে না। তুই ভাল করে বল্, ঠিক্ রাজী কি না?

(খাবারের প্লেট হাতে মণির প্রবেশ)

কার্ত্তিক। বা রে! আবার কি করে বলব? তুই ভারি বোকা! (হাসিল)

রমেন। (হঠাৎ কার্ত্তিককে টানিয়া তুলিয়া) বেশ! এখন তবে এস খোকা (উভয়ে প্রস্থানোদ্যত)

কমলা। (রমেনের প্রতি) আহা দাঁড়াও—জলখাবার টুকু খেতে যাও। তুমিও একটু খেয়ে যাও।

কার্ত্তিক। আজ্ঞে, আমার যথেষ্ট হয়েচে। (মণির দিকে চাহিয়া) চা, জল খাবার—সব চমৎকার!

রমেন। আমি আর দেরী করতে পারচি নে—মাসীমা! আমি এখনই কার্ত্তিকের বাড়ী যাচ্চি। (একটু হাসিয়া) এবার যেন দুপক্ষের কর্ত্তারা নিজেরা দেখাশুনা করে কথা-বার্ত্তা ঠিক করে নেন। (রমেনের প্রস্থান)

(কমলা ও মণিমালা তাহাদের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিতে লাগিল)

পঞ্চম দৃশ্য

মদনের বাটীর কক্ষ

(সুরমা অপ্রসন্ন মুখে আগে আগে যাইতেছেন। প্রাণেশ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে, তাহার পোষাকে আজ বিশেষ পারিপাট্য। হাতে রূপা-বাঁধানো মোটা ছড়ি একগাছি।)

প্রাণেশ। ছাখো মা! সব কথায় তুমি অমন রাগ কোরো না ব'লচি।

সুরমা। রাগ কোর্ব্বো না? বলিস্ কি? ভদ্রলোককে কথা দেওয়া হ'য়ে গেছে—আজ বাদে কাল বিয়ে—এখন তাকে কোন্ মুখে ব'ল্‌তে যাব—যে তোমার মেয়েকে বিয়ে ক'র্‌তে আমার ছেলে আর রাজী নয়।

প্রাণেশ। তা তোমরা এত দেরী করলে কেন? আমি ত' তখনই তোমাদের বলেছিলাম। তা নয়, তোমরা দিন দেখ্‌তে ব'সে গেলে।

সুরমা। তা ত' ব'লেছিলি—আর এই ক'দিনে অম্‌নি মন বদ্‌লে গেল?

প্রাণেশ। যাবে না? বাড়ীর বাইরের পৃথিবীটা যে কি রকম জোর চ'ল্‌চে তা ত' জানো না! তাই বুঝ্‌তে পারো না সব। মিনিটে মিনিটে মানুষের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিচ্চে।

সুরমা। তোর মাথা মুণ্ডু! যত অনাসৃষ্টি!

প্রাণেশ। শুধু তিনটে দিন তুমি সন্ধ্যাবেলা বালিগঞ্জের "লেকের" দিকটা, কিম্বা পার্কের ভিতরটা ঘুরে এসো দেখি। কিম্বা এই সব বায়োস্কোপ থিয়েটারের কাছাকাছি রাস্তায় একটু হেঁটে বেড়িয়ে এসো দেখি—তা হ'লে বুঝ্‌বে ব্যাপারটা কি।

সুরমা। তোর কি হয়েছে বল্ দেখি?

প্রাণেশ। আমার আর একজনের সঙ্গে ভাব হয়েছে। সে কি রকম জানো মা? এই কতকটা মার্লিন ডেট্‌স্, কতকটা মে ওয়েষ্ট, কতকটা এলিসা ল্যাণ্ডি, কতকটা গ্রেটা গার্ব্বো। তার ওপর কি রকম নাচে! ওঃ মিস্ সিম্‌কেও হার মানিয়ে দেয়। (সুরমা একদৃষ্টিতে ছেলের মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে আছেন) তার গান শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুম আসে; তার এসেন্সের গন্ধে অজ্ঞান হ'য়ে যেতে হয়। বুঝেছ? ট্রামে "বাসে" যারা রোজ চড়ে তারা সকলেই জানে—সে যে কি বস্তু। অন্ততঃ এক ডজন লোককে সে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চে।

সুরমা। সেই মেয়েকে তুই বিয়ে ক'র্‌বি?

প্রাণেশ। নিশ্চয়! কত লোক, শুধু আমায় হিংসে ক'র্‌তে ক'র্‌তে স্রেফ্ আত্মহত্যা ক'র্‌বে। এ একটা conquest.

সুরমা। তুই পাগল হ'য়েচিস্, না একেবারে গোল্লায় গিয়েচিস্—আমি ঠিক্ বুঝ্‌তে পারচি নে।

প্রাণেশ। সে যাই বলো, আমি তোমার ও "মণিমালা ফণীমালাকে" তা ব'লে বিয়ে কর্‌চি নে। উঃ—কি সুন্দর নাম বল দেখি! "তুফান—তুফান"! আমি আজ সন্ধ্যা-বেলা নিয়ে আস্‌বো তুফানকে আমাদের বাড়ীতে। তখন বল্‌বে "হ্যাঁ, ছেলের পছন্দ আছে।"

সুরমা। খবরদার বল্‌চি, আনিস্ নে এ বাড়ীতে। উনি একথা শুনলে তোকে আর আস্ত রাখ্‌বেন না। এখন আমরা বলি কি এদের, আমি শুধু তাই ভাব্‌চি। কথা দিয়ে ফিরিয়ে নেওয়া—একি সোজা অপমান!

(পিছনে চাহিতে চাহিতে ছুটিয়া মহাদেব চাকরের প্রবেশ)

মহাদেব। মা-জী! বাবু বাহারসে আয়া—য্যায়সে

পাগলাকা মাফিক হো কে। আউর হামসে লাঠি মাঙ্‌তা—বোল্‌তা "খুন করেঙ্গে"।

প্রাণেশ। (ভয়ে) বাবা তাহ'লে শুনেচেন না কি এরই মধ্যে!

মহাদেব। ওহি বাবু আ গয়া— (প্রস্থান)

(অপরদিকে মদনের প্রবেশ)

মদন। ওরে ব্যাটা মহাদেব! আমার লাঠিগাছটা কোথা? (লাঠি খুঁজিতে লাগিলেন)

সুরমা। (মদনের সম্মুখে আসিয়া) এখন লাঠি কি হবে? (মদনের অবস্থা দেখিয়া) ওমা! এ আবার কি? জামা কাপড় ছেঁড়া, চুলগুলো উস্কো খুস্কো, মুখে কাল্‌শিরের দাগ—কি হয়েছে তোমার?

মদন। আমি খুন ক'রবো—একধার থেকে মেরে লাট্ ক'রে দেবো।

(প্রাণেশ ত্রস্ত হইয়া ঘরের এককোণে আশ্রয় লইল)

সুরমা। কাকে গো?

মদন। (শূন্যে হাত ছুড়িয়া আপন মনে ও উচ্চৈঃস্বরে) আগে ঐ ব্যাটাকে, তার পর যাকে সাম্‌নে পাব।

সুরমা। বটে? আমাকেও খুন কর্‌বে না কি?

মদন। তোমাকে কেন খুন কর্‌তে যাবো? এই তোমার আদুরে ছেলে—যেখানে বিয়ে ক'রবেন ব'লে অজ্ঞান হ'য়েচেন—উঃ! কি অপমান কর্‌লে! আমি লাঠি-পেটা ক'র্‌বো ব্যাটাকে। (ছুটিয়া প্রাণেশের হাত হইতে মোটা ছড়িটা কাড়িয়া লইলেন)

প্রাণেশ। (ভয়ে তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া) না বাবা! আর কাউকে আমি বিয়ে কর্‌বো না—ঐ গণেনবাবুর মেয়েকেই আমি বিয়ে ক'র্‌ব।

মদন। বটে! গণেনবাবুর মেয়েকে! (লাঠির খোঁচা দিয়া) তবে ওঠ্—বেরো আমার বাড়ী থেকে!

(প্রাণেশ আস্তে আস্তে উঠিয়া হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল)

সুরমা। তবু—বেরুবে তোমার বাড়ী থেকে? কেন, ও ত' ব'ল্‌চে যে—গণেনবাবুর মেয়েকেই বিয়ে ক'রবে।

মদন। (ব্যঙ্গসহকারে) হ্যাঁ, করবে বৈ কি! তা আমাকে তা'রা যত অপমানই করুক্! কেমন? দু'জনে এক জোট্ হ'য়ে সব পাকাপাকি করা হ'য়েচে। নিশ্চয় সব কথা জেনে-শুনেই হ'য়েচে।

সুরমা। কি বল্‌চ তুমি?

মদন। এই জন্যে আমাকে বলা হ'য়েছিল "তোমার আগে যাবার দরকার নেই—যেদিন বিয়ে সেইদিন সকাল-বেলা আশীর্ব্বাদ ক'র্‌তে ওদের বাড়ী গেলেই চলবে"। অর্থাৎ তখন আর বিয়ে ভাঙ্গা কিছুতেই চল্‌বে না। এই ত?

সুরমা। তুমি কি তাদের ওখানে গিয়েছিলে না কি?

মদন। আজ্ঞে হ্যাঁ—গিয়েছিলাম। (চোয়ালের ঘুঁষির দাগের উপর হাত দিয়া সকাতরে) উঃ! আমি এর শোধ যেমন করে পারি নেবো। (প্রাণেশের গায়ে আবার লাঠির খোঁচা দিয়া) যদি ওখানে বিয়ে ক'র্‌তে চাস্ ত বেরো আমার বাড়ী থেকে!

প্রাণেশ। আমি ওখানে বিয়ে কর্‌বো না—এই আমি প্রতিজ্ঞা ক'র্‌চি।

মদন। (খুসি হইয়া) বেশ! এই ত ছেলে! আচ্ছা, যা তুই—দেখে শুনে একটি মেয়ে পছন্দ ক'রে আয়। এবার তুই যে মেয়ে পছন্দ ক'র্‌বি, আমি তারই সঙ্গে তোর বিয়ে দেবো—আর এই দিনেই দেবো—এ আমার প্রতিজ্ঞা। ঐ জাম্বুবানটাকে তারপর আমি একদিন উত্তম মধ্যম শিক্ষা দেবো।

সুরমা। তুমি তার বাড়ী গেলে, আর সে এম্‌নি ক'রে তোমায় মারলে?

মদন। তার সাধ্য কি যে আমাকে মারে। ওকে দেখেই আমার রাগ চ'ড়ে গেল। ধ'রেছিলাম—তার টুঁটি টিপে। কোথা থেকে একটা ছোঁড়া এসে তাকে বাঁচিয়ে দিলে। এ বেটা যেন Machine Gunএর মত ঘুঁষি ছাড়ে। উঃ! (পুনরায় চোয়ালটা হাত দিয়া চাপিয়া ধরিল)।

প্রাণেশ। তা'কে একবার আমায় চিনিয়ে দিও ত' বাবা! আমি দেখে নেবো সে কেমন Boxer.

মদন। থাম্, বেটা অষ্টাবক্র! তোকে কে ছাখে তার ঠিক্ নেই! তুই যা সহজে পার্‌বি তাই কর্—চট্ ক'রে একটা মেয়ে পছন্দ করে আয়। এই দিনে তোর বিয়ে দিতে না পারলে, এখন আর আমার মান থাকবে না। (মুখের উপর হাত চাপা দিয়া প্রস্থান)

প্রাণেশ। (লম্ফ দিয়া) মা! ছাখো—কি জোর

বরাত তোমার ছেলের। নইলে এত সহজে (ভাবের সহিত) ওঃ! যে একাধারে মার্লিন ডেট্রিস, এলিসা ল্যাণ্ডি, মে ওয়েষ্ট, গ্রেটা গার্ব্বো and so on & so on (অতিশয় প্রফুল্লমনে সুরমার পায়ে টিপ্ করিয়া একটা প্রণাম ও দ্রুত প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

কার্ত্তিকের বাটী

প্রীতিভোজনে নিমন্ত্রিত বন্ধুগণ উপস্থিত।

রোহিণী। আমাদের কার্ত্তিকের বিয়েটা কিন্তু হ'ল বড় মজার।

সরোজ। তা আর বল্‌তে! মাছ ধরার চার ফেল্‌লে প্রাণেশ, কিন্তু মাছ এসে লাগল কার্ত্তিকের বঁড়সীতে।

রোহিণী। তোমরাই ত প্রাণেশের চার ঘুলিয়ে দিলে। তার জন্যে আমার এখন একটু একটু দুঃখ হ'চ্চে।

নলিনী। দুঃখের কোনও কারণ নেই হে! তুমি সে খবরটা রাখো না বুঝি? প্রাণেশও যে কার্ত্তিকের সঙ্গে একই দিনে বিয়ে ক'রে ফেলেচে। সে এখন রীতিমত প্রেমের তুফানে হাবু-ডুবু। এই দেখ না তা'রা এল ব'লে। আমি একখানা কার্ড মিসেস্ ও মিষ্টারের নামে দিয়ে এসেছি। সাহেব লোক যখন নেমন্তন্ন নিয়েছে তখন তারা জোড়ে নিশ্চয় আস্‌বে।

সরোজ। বল কি? ভাল, ভাল—তবু ভাল। তা বিয়ে করে হাবুডুবু সবারই খেতে হবে—অল্প বিস্তর। শুধু প্রাণেশ কেন? ধর ত, ভাই! ধর ত নলিনদা—আজ সেই গানটা—সেই—"নয়কো সোজা—ঘাড়ের বোঝা বিয়ে হ'লেই বাড়ে"—

(গীত)

নলিন। নয়ক' সোজা—ঘাড়ের বোঝা বিয়ে হ'লেই বাড়ে।
বাঁধন যে তার বেজায় ক'ষে বসে—নাহি ছাড়ে॥
গেরস্তদের বাস্তভিটে রাখ্‌তে আলো ক'রে
ব্যাস্ত হ'য়ে আসেন নেমে আস্তো চাঁদটি ঘরে;
সুধা ছড়ান তুষ্ট যখন, রুষ্ট হ'লে পরে
সৃষ্টি কালো-কিষ্টি করেন ডুবিয়ে অন্ধকারে॥

(বরবেশে কার্ত্তিক ও কণে-সাজে মণিমালিকে সঙ্গে করিয়া রমেনের প্রবেশ)

রমেন। অন্ধঠাকুর ভালবাসার ভূতটি চাপান ঘাড়ে,
বরাত কিন্তু ব'সে ব'সে কলকাঠিটি নাড়ে।

(তুফান সহ প্রাণেশের প্রবেশ)

নলিন। পাকচক্রে কারও মুখের গ্রাসটি শেষে কাড়ে—
(আর) হালছাড়া কেউ তুফান-ভরা প্রেমের পাথারে॥*

* এই নাটিকার মাত্র দুইটি দৃশ্য পূর্ব্বে পত্রান্তরে প্রকাশিত হইয়াছিল।

ভারতীয় বীমার সরকারী বিবরণ

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

গত নভেম্বর মাসে গভর্ণমেণ্ট একচুয়ারীর ১৯৩৪ খৃঃএর রিপোর্ট বা 'ব্লু-বুক' * প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা হইতে জানা যায় যে ভারতবর্ষের ৩৪১টি বীমা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৯৪টি প্রতিষ্ঠান ভারতীয় এবং বাকী ১৪৭টি বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে ব্যবসায় চালাইতেছে। অর্থাৎ বিদেশী বীমা কোম্পানী অপেক্ষা স্বদেশী বীমা কোম্পানীর সংখ্যা ৪৭টি বেশী—প্রত্যেক ভারতবাসীর পক্ষেই ইহা বিশেষ আনন্দের কথা সন্দেহ নাই।

১৯৪টি ভারতীয় বীমা কোম্পানীর মধ্যে ১৪৫টি কেবল জীবন বীমার কাজ করিয়া থাকে। ৩৪টি জীবন বীমার সহিত অন্যান্য বীমার কাজ এবং ১৫টি জীবন বীমা ছাড়া অন্যান্য বীমার কাজ করিয়া থাকে।

পক্ষান্তরে দেখা যায় বিদেশী কোম্পানীগুলির অধিকাংশই জীবন বীমা ছাড়া অন্য বীমার কাজ করিয়া থাকে—ইহার উদ্দেশ্য কি, তাহা পরে বিবৃত করা যাইবে।

১৪৭টি বিদেশী বীমা কোম্পানীর মধ্যে ১২৩টি জীবন বীমার কাজই করে না, কেবল ১১টি মাত্র কোম্পানী জীবন বীমায় কাজ করে—বাকী ১৩টি জীবন বীমার সহিত অপরাপর বীমার কাজ করিয়া থাকে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে—ভারতবর্ষের বীমা কোম্পানীগুলির

* The Indian Insurance Year Book, 1934

মধ্যে কাজ কর্ম্মের বিশেষ তারতম্য আছে। অর্থাৎ ভারতীয় কোম্পানীগুলি জীবন বীমার কাজ কর্ম্মের দিকে বেশী ঝুঁকিয়াছে এবং অ-ভারতীয় বা বিদেশী কোম্পানীগুলি সামান্য পরিমাণ জীবন বীমার কাজ করিয়া তাহাদের সমগ্র প্রচেষ্টাকেই অন্যান্য বীমার কাজের দিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে—বিদেশী কোম্পানীগুলির এই ব্যবসায়িক মনোভাবের কারণ এই যে, বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও জাহাজী কারবারী গুলির মালেকান হয়—বিদেশীর এবং সেই সকল বিদেশী ব্যবসাদারগণ নিজ নিজ ব্যবসায় সম্পর্কিত নানাবিধ বীমার কাজ সম্পূর্ণভাবে বিদেশী কোম্পানীগুলির একচেটিয়া করিয়া দিয়াছে। বিদেশী কোম্পানীগুলির পরস্পর সাম্প্রদায়িক সহযোগিতা ও পক্ষপাতিত্ব থাকিবারই কথা। জীবন বীমা সম্পর্কেও এ কথা বলা যায় যে, ভারতীয় কোম্পানীতে বিদেশীর জীবন বীমা আছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল। দুই এক ক্ষেত্রে ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানে বিদেশীর জীবন বীমা থাকিলেও তাহার মূল কারণ অনুসন্ধান করিলে জানা যায়—"You scratch mine and I scratch yours" ডান পকেটের মাল হাতান্তরিত হইয়া বাম পকেটে না আসিলে ভারতীয় ব্যবসায়কে সাহায্য করিবার পাত্র বিদেশী নহে। কিন্তু ভারতীয়গণের এরূপ উদারতার দৃষ্টান্ত আমরা প্রতিনিয়তই দেখিতেছি—'স্বদেশী' গ্রহণের যত বড় মন্তব্যই কেন আমরা জোর গলায় প্রচার করি। বিদেশী বীমা কোম্পানীর এই প্রকার সংখ্যা-বাহুল্য এবং প্রতি বৎসর নূতন বীমা সংগ্রহের আধিক্য—আমাদের দেশ বলিয়াই সম্ভব হইয়াছে। অন্য দেশে দেখিতে পাওয়া যায়—স্বদেশী বীমা কোম্পানীর সংখ্যা এবং কাজের আধিক্য এবং পসারপ্রতিপত্তিই সর্ব্বাধিক; কেবল কয়েকটীমাত্র বিদেশী কোম্পানী সেখানে কাজ কর্ম্ম করিতেছে।

সেইজন্য আজ ভারতবর্ষে স্বদেশী বীমার সংখ্যা যে বিদেশীর চাইতে অধিক এবং তাহাদের কাজের প্রসারও যে বিদেশী কোম্পানীগুলিকে ছাড়াইয়া চলিয়াছে ইহা খুবই স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত—। ভারতবাসীর মধ্যে স্বদেশী অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের প্রতি যে ক্রমশঃই অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতেছে ইহা তাহারই পরিচয়। একচুয়ারী মহাশয়ের এই তথ্যটি ভারতবাসীমাত্রকেই বিশেষভাবে উৎসাহিত করিবে। কিন্তু ইহার অপরদিকও আছে—সেকথা আমরা পরে বলিতেছি।

ভারতবাসীর উৎসাহ ও আনন্দবর্দ্ধনের উপযোগী আরো কয়েকটি তথ্য আমরা—১৯৩৪ সালের আলোচ্য ব্লু-বুকে দেখিতে পাই।

ভারতবর্ষের সমস্ত বীমা কোম্পানীগুলির ১৯৩৩ সালের একীভূত নূতন জীবন-বীমার পরিমাণ ১৮৩ হাজার বীমা-পত্রে পর্য্যবসিত ৩৩ কোটি টাকা এবং এই বীমা-সংক্রান্ত প্রিমিয়াম বা চাঁদার বার্ষিক আয় সর্দ্দসমেত ১৭২ লক্ষ টাকা।

ইহার মধ্যে ভারতীয় কোম্পানীতে ২৪ কোটি টাকার ১৫৫ হাজার পলিসি বা বীমা-পত্র গৃহীত হইয়াছে—এবং তাহার বার্ষিক প্রিমিয়াম বা চাঁদার আয় ১২৫ লক্ষ টাকা। কিন্তু সে স্থানে অ-ভারতীয় বা বিদেশী কোম্পানী মাত্র ৯ কোটি টাকার জীবন বীমার কাজ করিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, আলোচ্য বর্ষে ভারতীয়-বীমা-কোম্পানীর গৃহীত বীমাপত্রের গড়পড়তা দাম যেখানে ১,৫৫৫৲ টাকা—সেখানে বিদেশী কোম্পানীর গড়পড়তা বীমাপত্রের দাম হইয়াছে ৩,১২৬৲ টাকা। কিন্তু বিদেশী কোম্পানীর সংখ্যানুপাতে ৯ কোটি টাকার নূতন জীবন বীমার কাজ আদৌ অবজ্ঞা করিবার মত নহে। কেন না আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিদেশী জীবন-বীমা কোম্পানীর সংখ্যা মাত্র ১১টি—এবং সেস্থলে স্বদেশী জীবন-বীমা কোম্পানীর সংখ্যা—১৪৫টি। অর্থাৎ ১৪৫টি স্বদেশী কোম্পানী ২৪ কোটি টাকার কাজ করিয়া থাকিলে মাত্র ১১টি বিদেশী কোম্পানীর পক্ষে ৯ কোটি টাকার কাজ করা কম কথা নহে;—ভারতীয় বা স্বদেশী কোম্পানীগুলির পক্ষে ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। কারণ, দেশের হাওয়া যখন ঘরমুখী হইয়াছে তখন আপন আপন মাল্লামাঝি ঠিক করিয়া, 'জয় মা' বলিয়া তরী ভাসাইবার সমুচিত আয়োজনের প্রয়োজন এবং দেশের শুভ বুদ্ধি উদ্বোধন করিবার প্রকৃত সময়ও উপস্থিত হইয়াছে। মতি স্থির রাখিয়া দেশের বৃহত্তর স্বার্থরক্ষার কথাই আমাদিগকে ভাবিতে হইবে। নিজেদের মধ্যে কলহ-কোলাহল বন্ধ করিয়া, ভারতীয় আর্থিক কল্যাণসাধনে সমগ্র ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির সংঘবদ্ধ হইবার আশু প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

যাহা হউক, ভারতবর্ষের হাত নাগাদ মোট চলতি বীমার পরিমাণ ধরিলেও দেখা যায় যে উহা ১৯৩৩ সালের শেষ পর্য্যন্ত—৮৬৭ হাজার বীমাপত্রে বোনাস সমেত ১৯৩ কোটি টাকা রহিয়াছে। এই সাকুল্য চলতি বীমার বার্ষিক প্রিমিয়াম বা চাঁদার আয়—৯২.৩ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে ভারতীয় কোম্পানীর অংশ—৬৩৬ হাজার বীমাপত্রে চলতি ১১৪ কোটি টাকা এবং ইহার প্রিমিয়াম বা চাঁদার বার্ষিক আয়—৫½ কোটি টাকা। সে স্থানে বিদেশী কোম্পানীর ২৩১ হাজার বীমাপত্রে চলতি মোট বীমার পরিমাণ ৭৯ কোটি টাকার।

জীবন বীমা ছাড়া অন্যান্য বীমার ব্যাপারে বিদেশী কোম্পানীগুলিই ভারতবর্ষে প্রধানতম স্থান অধিকার করিয়া আছে।

১৯৩৩ সালের অন্যান্য বীমা বাবদ প্রিমিয়াম বা চাঁদার আয় হইয়াছিল মোট ২৫০ লক্ষ টাকা; তন্মধ্যে ভারতীয় কোম্পানীর অংশ মাত্র ৭১ লক্ষ টাকা এবং বিদেশী কোম্পানীর অংশ বাকী ১৭৯ লক্ষ টাকা।—তুলনায় হতাশ হইতে হয়।

উপরোক্ত ২৫০ লক্ষ টাকার মধ্যে—১২৮ লক্ষ টাকার—অগ্নিবীমা, ৪২ লক্ষ টাকার নৌ-বীমা এবং ৮½ লক্ষ টাকার হরেক রকম বীমা বাবদ আদায় হইয়াছে। ইহার মধ্যে ভারতীয় কোম্পানী প্রায় ৩০½ লক্ষ টাকার অগ্নি-বীমা, ৭ লক্ষ টাকার নৌ-বীমা এবং ৩৪ লক্ষ টাকার হরেক রকম বীমা বাবদ আদায় করিয়াছেন।

জীবন-বীমা ছাড়া অন্যান্য বীমা—যথা—অগ্নি, নৌ, দুর্ঘটনা প্রভৃতি বীমার ব্যাপারে ভারতবর্ষ কেন পিছাইয়া আছে তাহার প্রধান কারণ আমরা পূর্ব্বেই অনেকটা বলিয়াছি। যতদিন পর্য্যন্ত সুবৃহৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও জাহাজী কারবারগুলির মধ্যে বিদেশী বণিকের স্বার্থ সর্ব্বপ্রধান হইয়া থাকিবে, যতদিন শিল্প-ব্যবসা ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতবাসী নিজের স্থান স্বার্থ সংরক্ষণের অনুকূল করিয়া তুলিতে না পারিবে, ততদিন

শুধু জীবন-বীমা ছাড়া অন্য প্রকার বীমার ব্যাপারে ভারতবর্ষে—স্বদেশী বীমা-প্রতিষ্ঠানের প্রাথান্য লাভের উপযুক্ত সুযোগ ও সুবিধা আসিবে না।

কিন্তু সুযোগ সুবিধা আসিবার পূর্ব্বে আমাদের স্বদেশী বীমা-কোম্পানীগুলির একতাবদ্ধ হইবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। কিছুদিন হইতে আমরা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি—যে আমাদের বিভিন্ন বীমা কোম্পানীর কর্ম্মীগণের মধ্যে এমন অশোভন ও অন্যায় প্রতিযোগিতা চলিতেছে এবং নিজ নিজ স্বার্থসেবার জন্য তাঁহারা ভবিষ্যতের সুমহান জাতীয় কল্যাণের কথা বিস্মৃত হইয়া কেবল আত্মকলহে এবং তাহার অনিবার্য্য পরিণতি নিন্দা ও গ্লানি প্রচারে পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের কার্য্যকলাপ দেখিয়া এ ধারণা করা অসঙ্গত নহে যে—বীমার কর্ম্মক্ষেত্রে আজ ভারতীয় কোম্পানীগুলির মধ্যে যে অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতার দূষিত আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে—তাহার পশ্চাতে কোনও ভারতীয় বা তথাকথিত ভারতীয় কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষেরও সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ সহযোগ রহিয়াছে। আমাদের এই "আত্মলাঘবকারী" পরশ্রীকাতরতা জাতীয় কল্যাণের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আজ যদি আমাদের নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থে অন্ধ হইয়া আমারই দেশের বর্দ্ধমান অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের গৌরব ও সার্থকতায় শ্লাঘাবোধ না করিয়া হীন উপায়ে তাহাকেও হীন করিবার গোপন চেষ্টায় ব্যাপৃত হই, তাহা হইলে সকল জাতির কল্যাণ ও অভ্যুত্থানের পথে আমরাই ত বিপত্তির সৃষ্টি করিব। আজ দেশের এই আর্থিক সমস্যার দিনে আত্মস্থ হইয়া মহাজনের পথই আমাদিগকে অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে।

নূতন বীমার কাজ বৃদ্ধি করিবার জন্য পরস্পর যে প্রতিযোগিতা অবশ্যম্ভাবী তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু যে প্রতিযোগিতা আমাদের জাতিকে হীনবল ও বিদেশীর কাছে আমাদের সকল প্রচেষ্টাকে হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিতেছে, যে প্রতিযোগিতা করিতে গিয়া আমাদের নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ ও বিদূষণ-বিদ্যার পাল্লাপাল্লি চলিতেছে এবং যে অশোভন ও কুৎসিত প্রতিযোগিতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া আজ বিদেশী কোম্পানীগুলি আমাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে তাহা কি আজ সংঘবদ্ধ ভাবে আমাদের পক্ষে পরিত্যাজ্য নহে?

আজ জীবন বীমার ক্ষেত্রে ভারতীয় বীমা কোম্পানীর অগ্রগতি দেখিয়া যেমন আনন্দ হয়, উৎসাহ আসে, তেমনি সংখ্যালঘিষ্ঠ বিদেশী কোম্পানীরা যে সমগ্র ভারতীয় বীমা কাজের ½ অংশেরও বেশীর অধিকারী তাহা দেখিয়া—নিজেদের দুর্ব্বলতায় লজ্জিত ও ক্ষুণ্ণিত না হইয়া পারি না।

আলোচ্য সরকারী বিবরণ পাঠে যদি আমাদের মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগে, কোথায় গলদ রহিয়াছে সে সম্বন্ধে চৈতন্যের উদয় হয়, তবেই আমার এ আলোচনা কতকাংশে সার্থক হইল মনে করিব।

দেবতার স্বর্গ তাই মোর কাম্য নহে—

শ্রীমৃণাল সর্ব্বাধিকারী এম্-এ

মোরা মর্ত্ত্যবাসী, নহি স্বর্গের দেবতা,
সুখ, দুঃখ, মিলন, বিরহ সহি' কত
মোরা রচি দৃশ্যমান বস্তুরাশি যত
বক্ষে জাগে সৃষ্টির আনন্দ চঞ্চলতা।
মোরা নহি দেবতার চেয়ে ছোট কভু,
আঁখি চাহে খুঁজে নিতে শূন্যের কিনারা
সমুদ্র পর্ব্বতে মোরা নহি গতিহারা,
এ জগতে মোরাই মোদের শুধু প্রভু।
হেথায় বেদনা আছে, আছে সুখ শত
আছে প্রেম, জন্ম-মৃত্যু, মিলন বিরহ,
আছে আশা, নিরাশা যে অশেষ অসহ
তারি মাঝে মোরা থাকি প্রেম-স্বপ্নে রত।
আমাদের প্রেম নহে দেবতার খেলা
দেবতার মত নহি নিষ্ঠুর নির্ম্মম;
আমাদের প্রেম অপরূপ অনুপম,
হৃদয়ে বেদনা জাগে বিদায়ের বেলা।
নয়ন রহে না শুষ্ক আসন্ন বিরহে
লীলা-বধূ ছেড়ে গেলে ধূলির ধরণী
মোরা রচি কাব্য গান স্মৃতির স্মরণি
দেবতার স্বর্গ তাই মোর কাম্য নহে।

অভিজ্ঞতার মূল্য

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি-এল

সতের

সকাল কাছারীর শনিবার। দ্বিপ্রহরে মক্কেলের প্রতীক্ষার বালাই নাই। গ্রীষ্মের আতিশয্যে ঘরের মধ্যে হাফরের মত উষ্ণ বাতাস, বাহিরে উত্তপ্ত লু'এর প্রকোপ! দরজা জানালা বন্ধ করিয়া, অলস ঘর্ম্মাক্ত দেহ এলাইয়া, হাত পাখার সাহায্যে কোন ক্রমে একবার চক্ষু বুজিতে পারিলে ঘণ্টা কয়েক নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে স্থান পাইয়া কোন গতিকে সেদিনকার মত অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়!

গৃহিণীর অভাবে অবিন্যস্ত গৃহ। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কেতাব কাগজ, দোয়াত কলম, আসবাব পত্রের মধ্যস্থলে একটা তক্তাপোষের ময়লা ফরাসের উপর শায়িত রামজনমের প্রগাঢ় সুপ্তি সেদিন অপরাহ্ণে ভঙ্গ হইল—সহৃদয় বন্ধুবর্গের অযাচিত শুভাগমনে!

মুরলীমনোহর সম্প্রতি 'ব্রীজ' খেলা শিখাইয়া মোক্তার সাহেবের মানসিক ক্লেশ অপনোদনের আয়াস পাইতেছিলেন এবং সঙ্গীরূপে ব্রিজবিহারী ও রামপদারথ কৃপাপরবশ হইয়া তাহাতে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। অবশ্য অবকাশও ছিল পর্য্যাপ্ত—যেহেতু প্র্যাক্‌টিশের বাজার ইদানিং সকলেরই মন্দা যাইতেছিল।

যথারীতি তাসের বৈঠক বসিল বটে, কিন্তু আসর যেন আজ কিছুতেই জমিল না। মোক্তার সাহেবের অন্যমনস্কতায় প্রায়ই খেলা ভুল হইয়া যাইতে লাগিল এবং সেজন্য ব্রিজবিহারী কয়েকবার মৃদু তিরস্কারও করিলেন।

রামপদারথ বিজেতার আনন্দে বলিলেন—ওঁর কি আজকাল মাথার ঠিক আছে যে এত খেয়াল রেখে খেলবেন? উনি যে রাজি হয়ে এতক্ষণ খেলে যাচ্ছেন, এই তোমাদের সৌভাগ্য!

ঠিক এই সময়ে এক প্রকাণ্ড ভুল করার জন্য রামজনমকে অনেকগুলা 'ডাউন' দিতে হওয়ায় ব্রিজবিহারী তাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

মুরলীমনোহর বলিয়া উঠিলেন—আরে, এই 'রবার'টা শেষ করে যাও!

রাগিয়া ব্রিজ বলিলেন—'রবার'! বারোশো 'ডাউন' দিয়ে তারপর আবার 'রবার'! যাঃ, এমন খেলা না খেলাই ভাল।

মুরলী হাসিয়া বলিলেন—তোমায় বুঝি এই সাড়ে ছয়টার ট্রেণে বাড়ী যেতে হবে, তাই মোক্তার সাহেবের দোষ দিয়ে উঠে পড়লে?

বাহির হইয়া যাইবার সময় ব্রিজবিহারী বলিয়া গেলেন—যাবই ত, বাড়ী যাব না? আমার ত আর ওঁর মত হাল হয় নি!

রামপদারথ উঠিয়া জুতা পরিতে লাগিলেন—তবে আমিও আর বসে কি করবো। এই বেলা যাত্রা করা যাক্।

মুরলীর স্ত্রী গিয়াছিলেন ভাগলপুরে—পিত্রালয়ে। সুতরাং তাঁহার কোথাও যাইবার তাড়া ছিল না। তাহা ছাড়া তাঁহার ফৌজদারী প্র্যাক্‌টিসই ছিল ভাল, সেজন্য উকীল হইলেও মোক্তার সাহেবের সহিত বনিত অন্য সকলের চেয়ে বেশী।

ফরাসের উপর দেহটাকে ছড়াইয়া তাকিয়ায় হেলান দিয়া মুরলীমনোহর বলিলেন—এ কিন্তু অন্যায় হচ্ছে মিসেস লালের। আপনার তক্‌লিফের কথাটা একবার ভেবে দেখা ত উচিত।

রামজনম একটি চাপা দীর্ঘশ্বাসের সহিত বলিলেন—আজ হয়ে গেল সাতদিন!

মুরলী হাই তুলিয়া উঠিয়া বসিলেন—আচ্ছা, দু'দিন থেকে কিশোরী বেশ ভালই আছে ত শুন্‌ছি? তবে আর কেন সেখানে পড়ে থাকা?

রামজনম হেঁট হইয়া মৃদু মৃদু দুলিতেছিলেন। একটু পরে মুখ তুলিয়া কহিলেন—কে বল্‌তে যাবে ভাই? তা হলে এখনই একটা ঝগড়া বেধে যাবে। কি গলতিই না করে ফেলেছি!

হাত মুখ নাড়িয়া বক্তৃতার ভঙ্গীতে মুরলী বলিতে লাগিলেন—তখনই আপনাকে বলেছিলাম। স্ত্রীলোককে

স্বাধীনতা কোন প্রকারেই দিতে নেই, ওদের বিশ্বাসই বা কি? একবার হাতের বাইরে চলে গেল, আর নাগাল মেলা ভার। সব কাযেই এগিয়ে বসে থাক্‌বে। আরে, পর্দ্দা যে আমাদের দেশে প্রচলন করা হয়েছিল, সে অনেক দেখে শুনে, বুদ্ধি বিবেচনা খরচ করে। আপনারা গেলেন কিনা সেই পর্দ্দা তুলে দিয়ে, ওদের ঘরের বাহির করে, সব পুরুষদের চোখের সামনে ধরে, মিশতে দিতে! এতে আমাদের কত রকমের অসুবিধা, ওদের কত প্রকার বিপদের সম্ভাবনা, এখন মালুম হচ্ছে ত পদে পদে? বেশী দূর যেতে হবে না, চেয়ে দেখুন না বাঙ্গালা দেশে, এর ফল কী ভীষণ হয়েছে। আজকাল ক্রমে ক'লকাতায় এর ঢেউ বেশ এসেছে। সেখানে গিয়ে দেখ্‌বেন—মেয়েরা সব রাস্তায়, ট্রামে, বাসে, অবাধে—হাতে ব্যাগ, পায়ে জুতা ঘুরে বেড়াচ্ছেন, যার সঙ্গে খুসী মিশ্‌ছেন, যেখানে যখন ইচ্ছা যাচ্ছেন, অভিভাবকদের আর সাধ্য নেই যে তাঁদের আটক করে রাখেন। শুধু কি তাই? যার সঙ্গে যিনি প্রেমে পড়বেন, তাতে কোন কথা কইবার জো নেই; যদি কিছু বলতে যান ত অচিরেই দেখ্‌তে পাবেন হয় তারা অদৃশ্য, আর না হয়ত তাদের দেহ কোন ট্যাঙ্কে অমর বন্ধনে একত্র হয়ে ভাস্‌ছে! কি শোচনীয়, কী বীভৎস পরিণাম ভেবে দেখুন ত?

মোক্তার সাহেব চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শুনিতেছিলেন। হতাশ্বাসের স্বরে বলিলেন—ঐ ক'লকাতারই মেয়ে ত এই লীলা! ওখান থেকেই শিক্ষিত হয়েছে। ম্যাট্রিক পাশ করেছে।

মুরলী চৌকীর উপর একটা চপেটাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন—সেই ত হয়েছে আরও খারাপ! আজকাল লেখাপড়া শিখিয়ে আধুনিক নাটক নভেল পড়তে দিন্—আর সিনেমা থিয়েটার দেখিয়ে আনুন—ব্যস, আর কিছু করতে হবে না!

যুক্তিটা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া রামজনম হতবুদ্ধির মত চাহিয়া রহিলেন।

মুরলী গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া কহিলেন—উদারনীতির এমন শিক্ষালাভ হবে তাহলে যে, স্বাধীন প্রেমের বিচিত্র গতির সম্ভব অসম্ভব পর্য্যায়ের তারে তারে মন প্রাণ একেবারে বাঁধা হয়ে থাক্‌বে! তারপর সুযোগ সুবিধার পথ ত আপনারা খুলেই দিয়েছেন!

এইবার রামজনম ব্যাপারটা কতক বুঝিতে পারিয়া দৃঢ়স্বরেই বলিলেন—আমি কিন্তু গোড়া থেকেই বাধা দিতে চেয়েছি, কতবার আপত্য করেছি, কিন্তু দেশের নেতাদের বিরুদ্ধে আমরা কতদূর কি করতে পারি বল?

মুরলী বলিয়া উঠিলেন—বেশ ত, উপস্থিত আশ্রম উঠে গেছে, সমিতি ভেঙ্গেছে। নেতাদের পৃষ্ঠও আর দৃষ্ট হয় না। এইবার ধীরে ধীরে রাস টেনে স্বস্থানে ফিরিয়ে আনুন! এ বিষয়ে আমি আপনাকে যথাশক্তি সাহায্য করবো কথা দিচ্ছি।

রামজনম যেন নিজ মনেই বলিতে লাগিলেন—তুমি আর কি করবে তা'ত জানি না, আমিই পেরে উঠছি না! গোড়াতেই গলদ হয়ে গেলে—

বাধা দিয়া মুরলী চাপাস্বরে বলিলেন—গলদ শোধরাতে কতক্ষণ? আপনি এক কাজ করুন। চলুন আজই ডাক্তার লাহিড়ীর বাড়ী, আমি না হয় সঙ্গে যাচ্ছি। তাঁকে গিয়ে পরিষ্কার করে বলুন যে, কালই সকালে যদি মিসেস্ লাল ফিরে না আসেন—ত' এর একটা যথাযথ ব্যবস্থা আপনি পরশুই করবেন।

এ পরামর্শ কিন্তু রামজনমের মনঃপূত বোধ হইল না, কেন না তিনি মাথা নাড়িয়া বলিলেন—তুমি জান না হে লীলার প্রকৃতি!

মুরলী তখন উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন—তবে যা ভাল বিবেচনা হয় করবেন। আপনার স্ত্রী, আপনি ভাল মন্দ বুঝবেন। কিন্তু আমার কথাটা মনে রাখবেন, আর আল্‌গা দিলে আয়ত্তের মধ্যে আন্‌তে পার্ব্বেন না। রামজনম সজোরে বলিলেন—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, সে আর কিছুতেই ভুল হবে না আমার!

আঠার

রাত্রে অত্যধিক গরম ও মস্তিষ্কের অস্বাভাবিক উত্তেজনার জন্য পরদিন সকালে রামজনমের নিদ্রা ভাঙ্গিতে দেরী হইয়া গেল। স্নানাদি সারিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইলেন আটটার পর।

পথিমধ্যে অনেক কিছুই ভাবিতে লাগিলেন কিন্তু কোন কল্পনা একটা স্থির পরিণতিতে উপনীত হইবার

পূর্ব্বেই বিভিন্ন প্রকার অসংলগ্ন চিন্তা মাথার মধ্যে আসিয়া তাহাকে পণ্ড করিয়া দিতে লাগিল।

একবার মনে হইল ষ্টেশন হইতে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া সোজা গিয়া লীলাকে যে কোন উপায়েই হউক লইয়া চলিয়া আসিবেন। কিন্তু সে খরচটা বাঁচিয়া যায় যদি ডাক্তার লাহিড়ীর সঙ্গে তাঁহার গাড়ীতে যাওয়া যায়। কিংবা যদি ডাক্তারকে ধরিয়া লীলার বিরুদ্ধে খুব কতকগুলা কড়া কথা শুনাইয়া দেওয়া যায়—ত সে কি রকম হয়? ইহাপেক্ষা বোধ হয় মিষ্ট কথায় যদি নিজের অসুবিধা ইত্যাদি কারণ দেখাইয়া ডাক্তারের মারফৎ ডাকিয়া পাঠান যায়—ত আর বিবাদের আশঙ্কা থাকে না এবং লীলাও হয়ত অবিলম্বে ফিরিয়া আসে।

এই সব চিন্তায় মগ্ন হইয়া রামজনম অন্যমনস্কভাবে পথ চলিতে চলিতে কানের নিকট হর্ণের শব্দে দুই লাফে রাস্তার অপর পাশে যাইতেই মোটরখানা তাঁহার গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল এবং ভিতর হইতে উচ্চহাস্যের পর শোনা গেল—উঠে আসুন মোক্তার সাহেব, আর একটু হ'লেই হাঁসপাতালে নিয়ে যেতে হো'ত আর কি!

সোফারের পাশেই ডাক্তার লাহিড়ী—পিছনের সিটের দিকে হাত দেখাইয়া বলিলেন—আসুন, আসুন, আমার অনেক কায, দেরী কর্ব্বেন না।

গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিতে ভিতরে এক পা তুলিয়াই রামজনম স্তম্ভিত হইয়া গেলেন! এমন সময় গাড়ীখানা সশব্দে দুলিয়া উঠিতে তিনি কোনক্রমে টাল সামলাইয়া বসিয়া পড়িলেন—এক ধাক্কা দিয়া লীলাকে!

গাড়ী চলিতে লাগিল, রামজনম গোঁজ হইয়া মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিলেন। লীলা তখন তাঁহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া সস্নেহে কহিলেন—কী চেহারা হয়েছে বলত' এই ক দিনে, চোখে দেখা যায় না! কেন ফাগুনি কি মরেছে?

রামজনমের মুখে আসিয়াছিল—আমিই যে মরিনি এই আশ্চর্য্য! অভিমানের ভারে কিন্তু কথাগুলি চাপা পড়িয়া গুমরাইতে লাগিল।

ডাক্তারবাবুর উদ্দেশে লীলা এবার বলিলেন—চলুন দাদামশাই, সোজা একেবারে আমাদের বাসায়—আর আমি কোথাও যা'ব না।

উত্তর আসিল—কিন্তু এও যে তোমাদেরই বাড়ী দিদি, আর বিশেষ করে আজ যে তোমরা আমার অতিথি।

ডাক্তার লাহিড়ীর বাটীর সম্মুখে গাড়ী দাঁড়াইল এবং তিনি দুইজনকেই হাত ধরিয়া অত্যন্ত আনন্দের সহিত লইয়া গিয়া বৈঠকখানায় পাশাপাশি বসাইলেন। তারপর হাসিয়া বলিলেন—দেখ, এমনটি না হলে মানায়?

লীলা লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া রহিলেন। রামজনম উঠিবার ভাণ করিয়া বলিলেন—আমার একটা জরুরী কন্‌সাল্‌টেশন আছে লালা হরেকিষণরামের সঙ্গে। এখনই তাঁর কাছে যেতে হবে।

প্রত্যুত্তরে ডাক্তার বলিলেন—লালাজি সস্ত্রীক সকালের একস্‌প্রেসে পাটনা চলে গেছেন, তাঁর ভাইএর অসুখের তার পেয়ে। ভোরে এসেছিলেন আমার কাছে।

রামজনম কথা খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না—লীলা বলিয়া উঠিলেন—আপনি কি আবার বেরোবেন নাকি দাদামশাই?

ডাক্তার বলিলেন—নিশ্চয়ই, এখনও আমায় তিন চার জায়গায় যেতে হবে। আগে দেখি তোমাদের কষ্ট দেবার ব্যবস্থা কতদূর কি হোল ভেতরে গিয়ে। ততক্ষণ—অনেকদিন পরে দেখা, তোমরা একটু বিশ্রম্ভালাপ কর না কেন!

ডাক্তার অন্দরে চলিয়া গেলে লীলাবতী রামজনমের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—তুমি অমন করে রয়েছো কেন, রাগ হয়েছে বুঝি?

উত্তরের অপেক্ষা একটু করিয়া, তাঁহার কাঁধের উপর একখানি হাত রাখিয়া লীলা মিষ্টস্বরে বলিলেন—খুব কষ্ট হয়েছে বুঝি এই ক'দিন ছেড়ে থাক্‌তে? কি কর্ব্ব বল, আমিও কি ছাই সুখে ছিলাম! গিয়ে এমন মুস্কিলে পড়ে গেলাম, না পারি থাক্‌তে, অথচ সাবিত্রী আর কিছুতেই আস্‌তে দিলেন না। একদিন দাদামশাইএর সঙ্গে চুপি চুপি চলে আসছিলাম, জানতে পেরে সাবিত্রী পায়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন—দিদি, তুমি চলে গেলে ওঁকে আর কেউ রক্ষা করতে পারবে না! অগত্যা নিতান্ত নিরুপায় হয়ে আমায় এতদিন থাকতে হয়েছিল। তাও যদি তুমি নিজে এক-আধবার যেতে, ত এত কষ্ট হত না। অন্ততঃ ফাগুনিকে দিয়ে আমায় আনতে পাঠালে না কেন? আমি আস্‌বার আভাষ জানাতে গেলেই

কিশোরীবাবুর মা তাই বলতেন—তোমার যাবার তাগাদা ত কই আসে নি লীলা, এদিকে আমার ছেলে যে এখন তখন হয়ে রয়েছে। বাস্তবিক কেউ আর মনে করেনি যে অমূল্য প্রাণটি ফিরে পাওয়া যাবে! একমাত্র ছেলে, বাপ মার সে কাতরতা, সাবিত্রীর বিহ্বলতা যদি দেখতে, তোমার চোখেও জল আসতো।

রামজনম অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—আমিও ত বাপের এক ছেলে, কিন্তু আমার প্রাণ অত অমূল্য নয় বোধ হয়?

লীলা তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—ও মা, শোন কথা একবার! তোমার প্রাণের তুলনায় আমার কাছে অন্য কোন প্রাণ? তুমি কি ক্ষেপে গেছ না কি?

রামজনম সেইভাবেই উত্তর দিলেন—কি জানি কে ক্ষেপেছে। এই এতদিনে একবারও খোঁজ নিয়েছ আমার?

লীলা বলিয়া উঠিলেন—রোজ, রোজ। দাদামশাই গেলেই দুটি বেলা তোমার কথা জিজ্ঞাসা করে তবে আমার অন্য কায। বিশ্বাস না হয়—

পর্দ্দা সরাইয়া ডাক্তার ভিতরে প্রবেশ না করিয়াই বলিলেন—সাক্ষী হাজির হ্যায়, তাকে জেরা করে, জবানবন্দী নিয়ে, দেখ্‌তে পারেন মোক্তার সাহেব।

লাহিড়ীর কথা ও দাঁড়াইবার ভঙ্গীতে রামজনমের মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি তাহা চাপিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

অগ্রসর হইয়া ডাক্তার তখন বলিলেন—কি? সাক্ষীর বহর দেখে মোক্তার সাহেব ঘাবড়ে গেলেন না কি?

লীলা উঠিয়া দাঁড়াইলেন—কি যে আপনার কথা দাদামশাই! উনি কি কখনও আমায় অবিশ্বাস করেন?

ডাক্তার লীলার নিকটে গিয়া বলিলেন—সেই ভাল। কিন্তু তোমার মানভঞ্জনের পালা শেষ হল লীলা?

অপ্রতিভভাবে লীলা রামজনমের মুখের দিকে চাহিলেন।

ডাক্তার বলিলেন—কি? জবাব নেই যে? ওদিকে আমার সব তৈরি।

রামজনম এবার বলিলেন—কিন্তু এতক্ষণ ফাগুনি বোধ হয় আমাদের রসুই সেরে ফেলেছে।

ডাক্তার উত্তর দিলেন—না, সে পথও বন্ধ। তাকে মানা করে পাঠিয়েছি—অনেকক্ষণ। এখন দশটা বাজলো। তাহার পর লীলার নিকট সরিয়া গিয়া চোখের ইঙ্গিত করিয়া চাপাস্বরে বলিলেন—এখনও বেশ গোল মেটেনি দেখ্‌ছি—একটু বেসুরো বাজ্‌ছে। তাহলে ওদিকে যাই, খাবার দিতে বলি, তুমি এদিকে ততক্ষণ—বুঝেছ কি না—সেই সুযোগে,—"দেহি পদপল্লবমুদারম্"—গেয়ে ফেল!

(ক্রমশঃ)

মহামহোপাধ্যায় ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

এ মাসে ভারতবর্ষের প্রচ্ছদপটে যে মহাপুরুষের চিত্র প্রকাশিত হইল, তিনি ১৩১৬ সালের মাঘ মাসে পবিত্র কাশীধামে শিবত্ব লাভ করিয়াছেন। দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত বেদান্তশাস্ত্র মন্থন করিয়া তিনি "শ্রীগোপালবসু মল্লিক বক্তৃতা" রূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহজ, সরল ও সুবোধ্য বাঙ্গালা ভাষায় বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া এবং তাহা বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তকাকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া বঙ্গবাসীমাত্রেরই অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার জন্যই আজ সংস্কৃত-অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও বেদান্তের রসাস্বাদন করিয়া ধন্য হইতেছেন। তিনি তাঁহার সময়ের একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন এবং সংস্কৃত ও বাঙ্গালা বহু সংখ্যক পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি অন্য কোন পুস্তক রচনা না করিলেও তাঁহার বেদান্ত বিষয়ক বাঙ্গালা পুস্তকই তাঁহাকে চিরদিন বঙ্গদেশে অমর করিয়া রাখিবে। ১৭৫৮ শকাব্দের ১৯শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার দিবা এক দণ্ড থাকিতে মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ৺রাধাকান্ত সিদ্ধান্ত-বাগীশ। তর্কালঙ্কার মহাশয় মাতা-পিতার প্রথম সন্তান। ইঁহার জন্ম হইলে রামনাথ বিদ্যাভূষণ নামক জনৈক পণ্ডিত ইঁহার মাতার মাতুলের নিকট নিম্নলিখিত কবিতাটি দ্বারা জন্ম সংবাদ জ্ঞাপন করেন—

আপনার অগ্রজাসুতা হয়েছেন পুত্রযুতা
উনিশে কার্ত্তিক গুরুবার
দণ্ডেক দিবস স্থিতে জয়ধ্বনি চতুর্ভিতে
লিখিলাম মঙ্গল সমাচার।

তর্কালঙ্কার মহাশয় রাঢ়ীয় শ্রেণী ব্রাহ্মণের আদি বংশজকুল-সম্ভূত। ইহাঁর দশ কি একাদশ পুরুষ পূর্ব্বে কোন ব্যক্তি রাঢ় দেশের অনির্দ্দিষ্ট কোন গ্রাম ত্যাগ করিয়া মৈমনসিংহ জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান সেরপুরে বাস করেন। ইহাঁর পিতা রাধাকান্ত সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় এ জেলার মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ছিলেন।

তর্কালঙ্কার মহাশয় বর্ণপরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া কলাপ ব্যাকরণ ও নব্য স্মৃতির কয়েকখানি গ্রন্থ পিতার নিকট অধ্যয়ন করেন। তাহার পর ইহাঁর পিতা পরলোক-গমন করিলে ইঁনি নবদ্বীপে যাইয়া ৺ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ও হরিদাস শিরোমণির নিকট স্মৃতি, শ্রীনন্দন তর্কবাগীশ ও প্রসন্নচন্দ্র তর্করত্নের নিকট ন্যায় এবং কাশীনাথ শাস্ত্রীর নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন করেন।

কিছুকাল পরে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুনরায় বিক্রমপুরের দীননাথ ন্যায়পঞ্চাননের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। আবার নবদ্বীপে যাইয়া পাঠ সমাপন করিলে তর্কালঙ্কার উপাধি প্রাপ্ত হন ও ১২৬৮ সালে সেরপুরে চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। তিনি স্বীয় চতুষ্পাঠীতে সমাগত বহু ছাত্রকে অন্ন ও বিদ্যাদান করিতেন।

ঐ সময়ে বারাণসী নিবাসী পণ্ডিত-স্বামীর ছাত্র হরচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কোন কারণে সেরপুরে যাইলে চন্দ্রকান্ত তাঁহাকে স্বগৃহে স্থান দেন ও তাঁহার নিকট বহুদিন বেদান্ত অধ্যয়ন করেন।

তিনি এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে সামবেদান্তর্গত গোভিল গৃহ্যসূত্রের পুঁথি সংগ্রহ করেন এবং তাহার কোন ভাষ্য না থাকায় নিজেই একটি ভাষ্য রচনা করেন। সোসাইটীর কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার ভাষ্য দর্শনে পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া উক্ত পুস্তক ও তাহার ভাষ্য প্রকাশের ব্যবস্থা করিলে চন্দ্রকান্তের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। ঐ কার্য্যসূত্রে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সহিত ডাক্তার (রাজা) রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, রায় বাহাদুর কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতির পরিচয় হইয়াছিল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার ও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহার অধ্যাপনায় সন্তুষ্ট হইয়া গভর্ণমেণ্ট ১৮৮৭ সালে তাঁহাকে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি প্রদান করেন। তিনি সেরপুরে বাসকালে ও সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনার সময়ে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রণয়ন করিয়াছিলেন—সংস্কৃত সাহিত্য—প্রবোধষটক, যুবরাজ-প্রশস্তি, সতী-পরিণয়, কৌমুদী-সুধাকর, আনন্দতরঙ্গিণী, ভাবপুষ্পাঞ্জলি। সংস্কৃত স্মৃতিশাস্ত্র—গোভিল গৃহ্যসূত্রের ভাষ্য, শ্রাদ্ধকল্পভাষ্য, গৃহ্যসংগ্রহভাষ্য।

ব্যাকরণ শাস্ত্র—শিক্ষা (বাঙ্গালা), সত্যবতীচম্পূ (বাঙ্গালা)। দর্শনশাস্ত্র—মহর্ষি কণাদ প্রণীত বৈশেষিক সূত্রের ভাষ্য, কুসুমাঞ্জলি-টীকা, তত্ত্বাবলী সটীক।

১৮৯৭ সালে তর্কালঙ্কার মহাশয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

এই সময়ে কলিকাতা পটলডাঙ্গার শ্রীগোপাল বসু মল্লিক মহাশয় বেদান্তশাস্ত্রের উন্নতিকল্পে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে ৫০ হাজার টাকা প্রদান করেন। তদনুসারে ঐ বিষয়ে প্রবন্ধ প্রণয়ন ও বক্তৃতা করার জন্য সর্ব্ব প্রথমেই তর্কালঙ্কার মহাশয় যোগ্যতম ব্যক্তি বলিয়া নির্ব্বাচিত হন। তিনি ৫ বৎসর কাল বেদান্তশাস্ত্র সংক্রান্ত ৫টি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ঐ সকল বক্তৃতা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলেই প্রদত্ত হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ সর্ব্বসাধারণকে ঐ বক্তৃতা শুনিবার জন্য আহ্বান করায় তর্কালঙ্কার মহাশয় প্রথমে বক্তৃতা দিতে অসম্মত হন। তিনি অহিন্দুর নিকট বেদান্ত ব্যাখ্যা করার পক্ষপাতী ছিলেন না; পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ শুধু হিন্দু শ্রোতাদিগের উপস্থিতির ব্যবস্থা করায় তর্কালঙ্কার মহাশয় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ৫ বৎসরের বক্তৃতাই বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ কার্য্যের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে ২৫ হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করেন। তাঁহার প্রদত্ত বেদান্ত বিষয়ক বক্তৃতাগুলি বাঙ্গালা ভাষার অমূল্য সম্পদ।

অধ্যাপনা উপলক্ষে তাঁহার সহিত ম্যাকস্‌মুলার, কাওয়েল, ডাউসন, মনিবার উইলিয়ম প্রভৃতি বহু সংস্কৃতজ্ঞ ইংরাজেরও পরিচয় হইয়াছিল।

এসিয়াটিক সোসাইটী তাঁহাকে অনারারী সদস্য মনোনীত করিয়া তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

মৃত্যুর পরে

শ্রীহেম চট্টোপাধ্যায়

আসামের কি একটা সহরে স্বনামধন্য ছয়গাঁও গ্রামের বাসিন্দা শ্রীমান্ রবি ওরফে ভানু চাটার্জ্জি টাইফয়েড রোগে শয্যাগত ছিল! ব্যারাম তত কঠিন না হোক্—মানসিক ভয়ে রোগী আধমরা হইয়া গিয়াছিল। ভানু চাটার্জ্জি সেবার মারা গিয়াছিল কিনা, এমন কোন নথি-পত্র আজ পর্য্যন্ত আমাদের হস্তগত হয় নাই, তবে লোক পরম্পরায় শুনিয়াছি তাহার মৃত্যু হইয়াছে; একথা উপরোক্ত গ্রামের দুইজন প্রতিবেশীর মুখে শুনিয়া তবে বিশ্বাস প্রত্যয় জন্মিয়াছে। এ সম্বন্ধে গল্প লিখিতে গিয়া বার বার ফিরিয়া আসিতেছিলাম!

কালীঘাট ট্রামে চাপিয়াছি। পাশে দুইজন ভদ্রলোক বলাবলি করিতেছিলেন, বোধকরি তাঁহারা 'বাঙ্গাল' দেশের লোক (বাংলা দেশের তো বটেই)—ছাখেন মাইজ্যা খুড়ো, শোনছেন নি, ছয়গাঁয়ের রমণী খুড়ার ছেইলাডা নাকি মারা গেছে।

—কে কইল তোমাকে? আমি যেমন তারে কাইল দেখলাম জগুবাবুর বাজারে।

—ভুল ছাখছেন! জ্বর বিকারে,···

—রমণীর কি ছেইলা আছে, গোটা কয়েক মাইয়া যেন দেখ্‌ছি।

—তার ভাইর তো ছেইলা-পেইলা আছে, আমি নিজেই দেইখ্যা আইছি!

—ভাইর থাক্‌লে কি নিজের অইল,···বলিয়াই ভদ্রলোক পাশ ফিরিয়া বসিলেন! পরে কহিলেন···আমি নিজের চোখে দেখ্‌ছি, আমার বিশ্বাস হয় না!

আর একজন বলিলেন—এই দেখি ভাওয়ালের সন্ন্যাসীর মত কথা কয়েন। আমাগো "বিশু" শ্মশানে যাইব কইরা আছিল না। হে না আসামে থাকে!

আসাম কি একটুখানি সহর নাকি? অতি বড়··· প্রকাণ্ড! লাটের সহর!

* * * *

ঘোর অন্ধকার রাত্রি। বাহিরে বরফ পড়িতেছে, শীত আজ একটু বেশী পড়িয়াছে। ভানুর সেদিন জ্বর বেশী ছিল না, তবে দুর্ব্বলতা ছিল! শেষ রাত্রিতে সে স্বপ্ন দেখিল, সে মরিতে চলিয়াছে, আশে পাশে ডাক্তারের আনাগোনা, হা' হুতাশ, ঔষধ, ইনজেক্‌শন। কিছুতেই কোন ফল হইতেছে না, ক্রমেই শরীর ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছে। ডাক্তারেরা জবাব দিয়া গেছেন। আর বড় জোর আধ ঘণ্টা! তার পরেই তাহাকে অন্য কোথাও চলিয়া যাইতে হইবে। তাহার মনে এক আনন্দের জোয়ার জাগিয়া উঠিল। নূতন দেশ, নূতন সহর, নূতন গাছপালা, নূতন লোক—এসব দেখিবার সখ কাহার না হয়। সে তো তরুণ যুবক মাত্র।

অর্দ্ধঘণ্টা আর উত্তীর্ণ হইল না। হঠাৎ সমবেত কণ্ঠের রোল উঠিল "হরিবোল"! মাগো, বাবাগো,···ও দাদা ভাই···প্রভৃতি বিকট চীৎকারে দিগ্‌মণ্ডল বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল! পাড়াপ্রতিবেশীরা ঘুমের ঘোরে কান পাতিয়া শুনিলেন। স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বাগ্রে ছুটিয়া আসিলেন, বৃদ্ধরা লেপের নীচে অর্দ্ধবৃত্তাকারে পড়িয়া থাকিয়া হা-হুতাশ করিতে লাগিলেন। যুবকেরা বিরক্তির সহিত শয্যা ত্যাগ করিয়া বিছানার ওপর উঠিয়া বসিলেন। আর শিশুরা প্রলয় ক্রন্দনে পাড়াখানি মুখরিত করিয়া তুলিল!

সকলের মুখেই সেই এক—হায়, হায়, রব! চোখে জল না থাকিলেও কোন মতে চোখ অশ্রুসিক্ত করিয়া পরস্পর পরস্পরের দিকে চোখ চাওয়া-চায়ি করিতে লাগিল! কৈলাস খুড়ো স্থানীয় পুরোহিত, তিনিও আসিয়াছিলেন—কহিলেন, মদন-বাবু, আর দেরী কেন, একদিন সবারই যেতে হবে। বৃথা মায়া, বৃথা কান্না,···বলিয়াই ডে-সাহেবের কাছে আগাইয়া আসিয়া কহিলেন—বিড়ি-সিগারেট আছে কিছু? দু'একটা দিতে পারো? এমন কন্‌কনে শীত কখনো দেখিনি বাবা—বলিয়াই কৈলাশ শর্ম্মা হিহি করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন!

তারপর সহরের ব্যাপার, রাতারাতি দশটা জিনিস

সংগ্রহ করিতে তেমন অসুবিধা বোধ হইল না। গরীমাসি ভাবে কাজ-কর্ম্ম এক রকম কাটিয়া গেল মন্দ না! শ্মশানে বসিয়াই দু'একজন সংসারী লোক চুপি চুপি বলাবলি করিতেছিল, লাইফ ইনসিওরেন্স আছে তো? প্রভিডেণ্ট ফণ্ড?

—নিশ্চয়ই আছে! সরকারের চাকুরে যখন! যা' হোক শ্রাদ্ধে কিছু ব্যয়-ব্যসন হবে দেখছি তা'হলে।

—কি বলো যে তুমি! কচি দুধের শিশুটা অকালে মারা গেল—তার আবার শ্রাদ্ধ-স্বস্ত্যয়ন। যাও, তুমি একেবারে ইডিয়টের মত কথা বলো!

আর একজন অফিসের লোক! মনে মনে হাসিয়া কহিল—হ্যালো ব্রাদার, কাল তো অফিসে গিয়েই ছুটী নিশ্চয়

—কি বলো?

ব্রাদার শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া কহিল—কাল কি আবার হাতে কলম উঠ্‌বে? কালকের দিনটাই মাটি!

—অত পেসিমিষ্ট হলে আর দিন চলেনা ব্রাদার! আজ রবি গেছে, কাল আমি, পরশু তুমি, নরশু হরিদাস, দু করেই তো সব শেষ হয়ে যাবে।

ভোরের সাথেসাথেই পাড়ায় পাড়ায় শুধু এক কথা—ভানু চাটার্জ্জি মারা গেছে। কেহ বা মুচ্‌কি হাসিয়া কহিলেন—আরে বলো কবি, নিশীথ রাতের পাপিয়া কবি!

দ্বিজেন্দ্র সায় দিয়া কহিল—রেখে দাও তোমার কবি-কবির কথা! রাবিস্ লিখে নাম কেনবার ফিকিরে ছিল! কলম চালিয়াতি। রমেশবাবু বিজ্ঞের মত হাসিয়া কহিলেন চালাকী দ্বারা কোন মহৎ কাজ সম্পন্ন হয় না।

দয়ানাথ সুমুখে দাঁড়াইয়াছিল, হঠাৎ বলিয়া উঠিল—লোকটা যখন মারা গেছে তখন তাকে নিয়ে আলোচনা না করাই ভালো! সে আজ ভালমন্দর অতীত!

বাজারের একটা দোকানে বসিয়া হৃষীকেশ বলিতেছিল শুনেছেন মুঘরাজবাবু—রবীন্দ্রবাবু মারা গেছেন!

মাড়োয়ারী মুঘরাজবাবু চক্ষু দুটি কপালে ঠেকাইয়া কহিলেন—মারা গেছেন। বড় আচ্ছা আদ্‌মীর লেড়কা ছিল। কুছু হিসাবও ছিল!

মঙ্গলচাঁদবাবু ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিলেন, কোন মর্‌গে?

মুঘরাজবাবু মুখ ব্যাদান করিয়া কহিলেন—ইনকামকো ভেগানা। (অর্থাৎ Nephew of the Incometax officer.)

দ্বীপচাঁদ মিশ্রী কহিল—বায়োস্কোপমে থা'না বাবু দু'চার রোজ।

দোকানে একটা পুলিশ কনষ্টেবল গিয়াছিল কিছু সওদা করিতে, সে-ও কথায় যোগদান করিয়া কহিল—এধি আনন্দীবাবুকি লেড়কা, বহুত আপশোষকা বাত হ্যায়!

সহরের আর এক প্রান্তে কয়েকজন রৌদ্র পোহাইতে-ছিল। রসিক কহিল—ছেলেটি অকালে মারা গেল! কমলা খেয়ে খেয়ে এল বিষম জ্বর···

কার্ত্তিকবাবু বিমর্ষভাবে কহিলেন, আপনাদের "পুঃ সঃ" নষ্ট হোয়ে গেল!

নরেশ হাসিয়া কহিল—আর সে কথা বলে লাভ কি দাদা! যাই বলেন না কেন, দোষেগুণে মানুষ। হয়তঃ তার অনেক দোষ থাক্‌তে পারে, সে জন্য তার শুধু দোষারোপ করে নিন্দে করাও ঠিক নয়। কখন কার কি মতি-গতি হয়, কেউ কি বল্‌তে পারে! কিছু টাকা পয়সা ছিল তাই কোন মতে উৎরে গেছে। না হ'লে আমাদের মতই বাসায় বসে বসে ভেরেণ্ডা ভাজ্‌তে হোত!

জিতেশবাবু নামে এক ভদ্রলোক সে পথে যাইতেছিলেন, তারিণী খুড়োকে সেখানে দেখিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী। কহিলেন—কি হচ্ছে এখানে বসে? কাল কি হয়েছিল শুনেছেন তো? মায়ার সাহেব fileটা পাঠিয়ে দিতেই U. O. লিখে দিয়ে এসেছি। Draftটা দিতে হবে আজই! কেস্‌টা কিন্তু সিরিয়াস্।

নরেশবাবু ফটোগ্রাফি করিয়া খান, চাকুরীর তোয়াক্কা রাখেন না, বিষম চটিয়া কহিলেন—আপনাদের কি মশায় অফিসের কথাবার্ত্তা ছাড়া আর কোন আলাপ-আলোচনা নেই? ঘরে-বাইরে পথে ঘাটে খাওয়া শোওয়া সব সময়ই ঐ এক কথা! অফিস, সাহেব, আর সাহেব, অফিস! সেদিন বিন্দুদের বাসায় গিয়েছিলাম, শুনি হলধর দাদা বৌদিকে বল্‌ছেন লুচি খেতে খেতে,···ওগো জানো, সাহেব বড়বাবু আমাকে আজ thanks দিয়েছেন, বাজেট পাশ হোয়ে গেল কিনা। বৌদি কি রকম চোখে চেয়ে জিজ্ঞাসা কোর্‌লে···বাজেট কি? এমন সময় আমি সেখানে গিয়ে

উপস্থিত। হাসির চেয়ে দুঃখই হ'ল বেশী। বল্‌লাম—দাদা, বৌদিকে আর বাজেট শিখিয়ো না। অল্প বয়সে মারা যাবে! কথাটাকে চাপা দেবার জন্য বল্‌লাম, আজ আর মনটাও ভালো নেই, যতীন দাশ মারা গেছে!

হলধরদাদা হাসিতে গিয়ে হঠাৎ গম্ভীরভাবে বল্‌লেন—কালও বাজারে দেখিছি! আমি চুপ করে থেকে বল্‌লাম, খবরের কাগজে পড়েন নি বুঝি? অনশনে যতীন দাশ—

খবরের কাগজ পড়বার সময় কোথায় ভাই? আগে অফিসই সাম্‌লাই! মনে মনে খুব হাসি পাইল, আর দুঃখও হইল।

জিতেশবাবু হাসিলেন—যতীন দাশ বল্‌তে সহরের যতীন বাবুকে মনে পড়ে, তা' হলে তো মন্দ নয় দেখ্‌ছি। গান্ধী বল্‌লে শেষে আমাদের অনাথবাবুকে টানাটানি করবে না তো! কারণ নতুন বাজারের সবাই ওকে গান্ধী বলে ডাকে।

সকলেই এবার হাসিয়া উঠিল। তারিণী একটুখানি ভাবিয়া কহিল—আজ আর অফিসে যেতে পা সরছে না,···

জিতেশবাবু উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন—কেন, কেন?

—ভানু চাটার্জ্জি মারা গেছে!

—Who is he? বলিয়াই জিতেশবাবু চুপ হইলেন! তারিণীর চোখে জল আসিল, কহিল—আমাদেরই অফিসের এক ভদ্রলোকের ছেলে! জ্বর হোয়ে···

জিতেশবাবু নরম সুরে কহিলেন—Alas, may he rest in peace···কৃপা হি কেবলম্‌! বলিয়াই হন্ হন্ করিয়া পথ ধরিলেন।

দুপুরবেলা অফিস বসিতেই ছুটীর হুকুম হইল। শুধু ছুটী হইলে তো চলিবে না, শোকসভাও আহুত হইল। বড় সাহেব শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বক্তৃতা প্রসঙ্গে কহিলেন—"আমি তাহাকে ভাল চিনি না, অফিসে শুধু দেখিয়াছি। তাহার মৃত আত্মার উদ্দেশে আজ আমরা এখানে শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছি বটে, কিন্তু তিনি শোক দুঃখের পরপারে। করুণাময়ের চরণতলে বসে তিনি সনাতন ধর্ম্মের মহিমা প্রচার করুন, ইহাই আমাদের আজিকার প্রার্থনা। তাঁহার আত্মার সদ্‌গতি হোক্! ওঁ তৎসৎ ওঁম্!

অফিসের ভানুর সহকর্ম্মী গোপাল ঠাকুর, "কিং কঙ্" (এক ভদ্রলোকের nick name) প্রভৃতি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না, শোকের উচ্ছ্বাসে সভার আসরে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া সভ্যগণকে উত্যক্ত করিয়া তুলিলেন।

মেয়েমহলেও আলাপ-আলোচনা কম হয় নাই। জনৈকা প্রৌঢ়া সভা জাঁকজমক করিয়া বসিয়াছিলেন। মিত্তির সাহেবের পাশের বাড়ীতে আলোচনা হইতেছিল। সৌদামিনী কহিলেন—শীতে লোক মারা যায় এই প্রথম দেখলুম! সুশীলা দুঃখ করিয়া কহিল—তা' তো যাবেই! শীতের সময় কাপড়-চোপড় না থাকে তো জ্বর হবেই, আর জ্বর হলেই নিমোনিয়া! ডাক্তারবাবুরা কি ছাই চিকিৎসা করেন, সামান্য ব্যায়রামটা পর্য্যন্ত ধরতে জানেন না! হাঁ ছিল বটে সুশীল ডাক্তার, নাড়ী টিপেই ওষুধের ব্যবস্থা কোরত। কেউ কখনো মরেছে তার হাতে, এমনি হাতযশ ছিল তাঁর।

ঘোষাল গিন্নী সায় দিয়া কহিলেন—আমার কানুর অসুখের সময় বিপিন ডাক্তার কি ভুলই না করে ফেল্লে! ছেলে আমার যায় আর কি! শেষে তো সুশীলবাবুর শালাকে দেখিয়ে তবে রক্ষা!

রায়সাহেবের স্ত্রী অবজ্ঞার সহিত জবাব দিলেন—রেখে দে তোদের ডাক্তার-ফাক্তার। ঐ করেই তো দেশ উচ্ছন্ন গেল। কেন, মদন কবিরাজের কয়টা জ্বরকেশরী, আর মহা-নারদীয় লক্ষ্মীবিলাস বড়ী খাওয়ালে রোগী আপনি উঠে বসে কথা বল্‌ত না?

পলাশমণি ঘোমটার ফাঁকে ঠাকুরঝির দিকে চাহিয়া কহিল—কেন আমাদের পাড়ার মনোমোহন ডাক্তার তো খুব ভাল শুনেছি। হোমোপ্যাথিতে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী তিনি!

রায়সাহেবের স্ত্রী হাসিয়া, গলিয়া, লুটাইয়া পড়িবার মত ভাবে কহিলেন—হোমোপ্যাথি আবার ওষুধ নাকি, কলের জল, কলের জল! আর মনোমোহন আবার ডাক্তার! ছোটলোকের জন্য তার ওষুধ! খাসিয়ারা তার ওষুধ খায়!

ঠাকুরঝি স্ত্রীলোকটি একটু ঠোঁটকাটা—ফোড়ন দিয়া কহিলেন—বিনি পয়সায় ওষুধ দেয় কিনা, তাই তার নাম নেই। কেন, বৌঠান তোমার মনে নেই, রায়সাহেবের যখন ব্যারামের সময় ঐ মনোমোহন ডাক্তারই তো ভালো করলে! কোথায় ছিল তখন মদন কবিরাজ—আর সিভিল সার্জ্জন!

রায়সাহেবের স্ত্রী গর্জ্জিয়া কহিলেন—মদন কবিরাজ ছিল না বটে, কিন্তু ব্যারামটা যে মৃগী তা'তো তিনি বারম্বার বলে গেলেন! তারপরে তো মনোমোহন ডাক্তার ওষুধপত্র দিয়ে সারিয়ে তোলে। আমার বিশ্বাস, মদন কবিরাজের চ্যবনপ্রাশের গুণেই ওর অসুখ অর্দ্ধেক সেরে যায়!

পলাশমণি কথাটা ঘুরাইয়া কহিল—কেন, ভানুর তো চিকিৎসার ত্রুটি হয় নি। সরকারী সব ডাক্তার, বড় বড় খেতাবধারী,···গায়ে ফুঁড়ে ইনজেক্‌সন, রক্ত পরীক্ষা, এর ওপর আরো কত কি! আয়ু না থাক্‌লে বাঁচাতে পারে কেহ, বল দিকিন?

রায়সাহেবের স্ত্রী সুর নামাইয়া কহিলেন—তা' না হ'লে রাজ-রাজড়ারা অমর হয়ে থাক্‌তেন! সপ্তম এডওয়ার্ড মারা যেতেন না। তাদের কি ডাক্তারকবিরাজ, চিকিৎসকের অভাব ছিল?

তাহার কথার ভঙ্গীতে অনেকেই মুখ টিপিয়া হাসিলেন। তিনি তাহা লক্ষ্য করিয়া পুনরায় কহিলেন—হেসো না, সত্যই বলছি! বড় লোকের তো আর চিকিৎসার অভাব হয় না···

—চিকিৎসা বিভ্রাট হয়—বলিয়াই ঠাকুরঝি কহিলেন, কেন বড় ডাক্তারদের হাতে ঢের ঢের লোক মারা যায়।

সৌদামিনী একটি ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—কাঁচা বউ রেখে মারা গেছে! চিকিৎসার কোন ত্রুটি হয়নি! ঐ একমাত্র রোজগারী ছেলে। ভগবানের সূক্ষ্ম বিচার আমরা সহজে বুঝতে পারি না···কি সর্ব্বনাশ হয়ে গেল বল দেখি!

পলাশমণির চোখ দুটি সহসা ছল ছল করিয়া উঠিল, কহিল—সর্ব্বনাশ আবার নয়। এর চেয়ে আর সর্ব্বনাশ কি হ'তে পারে মানুষের! আমার এখনো মনে পড়ে, ছোট্ট দুটি ভাই পলোগ্রাউণ্ডের আশে পাশে পাহাড়ে রোদে রোদে ঘুরে বেড়াত। সাথী ছিল হরলালবাবুর অমিয়, আর আমাদের সতু। আমি ভুলি নাই ঠাকুরঝি। কি সুন্দর চেহারা ছিল ছোটটির। সেইটি মায়ের বুক খালি করে কবেই চলে গিয়েছে! আর বড়টিও আজ চলে গেল। ওদের অদেষ্টই মন্দ, দিদি!

দিদি ওরফে ঘোষালগিন্নী চোখের কোনের অশ্রু মুছিয়া কহিল—মন্দ, আবার মন্দ নয়! সে কথা তুলে আর লাভ কি!

রায়সাহেবের স্ত্রী একটু কি ভাবিয়া কহিলেন—ছোঁড়াটার চরিত্র নাকি বড় ভাল ছিল না, শুনেছি বড় মেয়েলোক ঘেঁষা ছিল। সহরেও বড় দুর্ণাম শুনেছি। কি সব মেয়েদের নাচ গান নিয়ে উন্মত্ত হয়েছিল কয়েকদিন!

ঘোষালগিন্নী মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিলেন—কই, আমরা তো এ-সব কথা শুনিনি?

—তোমরা শুনবে কি করে? ঘরের খবর নিয়েই ব্যস্ত তোমরা। বাইরের খবর তোমরা কি জান?,

ঠাকুরঝি মৃদু হাসিয়া কহিলেন—জানি বই কি দিদি, সবই জানি! আপনার মেয়েরা তো সেদিন গানবাজনা করছিল, আর সব মেয়েরা···

আকাশ হইতে পড়িবার মত ভাবে রায়সাহেবের স্ত্রী মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া কহিলেন—কই আমার তো মনে পড়ে না। একবার শুধু ওরা কি এক সম্মিলনীতে গান গেয়েছিল!

—সে তো ভানুই করেছিল। আপনি নিজে গিয়ে না ভানুকে কি বলেছিলেন!

—হাঁ, হাঁ, তখন তো ভালই ছিল। মন্দের কথা শুনেছি তো পরে!

—খারাপ লোকে কত কি কথা বলে! কই আমাদের বেণু তো সেদিন নেচেছিল, সে তো কিছু বলে নি। বরং রবির প্রশংসাই করেছে।

—ওই রাঙামুখ দেখেই তোমরা সব ভুলে যাও! কথায় ও আছে—কিছুই তো বটে, নইলে কি আর রটে!

পরদিন সন্ধ্যাবেলা ছয়গাঁও গ্রামে এক টেলিগ্রাম পিওন আসিয়া হাজির। সন্দেশবাহী কোন সুসংবাদ কি দুঃসংবাদ লইয়া আসিয়াছিল সে নিজেই তাহা ভাল জানে না। পল্লীগ্রামে টেলিগ্রাম পিওন দেখিলে গ্রামবাসীদের অন্তরাত্মা সহসা কাঁপিয়া ওঠে এবং ভয়ে হাত-পা ভিতরে ঢুকিয়া যায়! পিওন দেখিয়াই হরিহর মুখুটি খড়ম পায়ে দিয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া আগাইয়া আসিলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া পিওন সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল—আজ্ঞে চাটুয্যে বাড়ী কোনটা বল্‌তে পারেন!

—এই যে পাশের বাড়ী বলিয়াই হরিহর বড় তাড়াতাড়ি

টেলিগ্রামখানি হাতে লইয়া দুর্গানাম,গণেশ সিদ্ধিদাতা প্রভৃতি বহু বাক্য বিড় বিড় করিয়া বকিয়া টেলিগ্রামখানি খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন! খুলিয়া পড়িতেই তাহার মুখ হইতে একটা প্রচণ্ড অস্ফুটধ্বনি শ্রুত হইল···ও! বলিয়াই তিনি বসিয়া পড়িলেন। পিওন তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ধরিতে গিয়া একেবারে হরিহরকে লইয়া পা ভাঙ্গিয়া বসিয়া পড়িল!

হরিহরের এই অবস্থা দেখিয়া অটল চৌধুরী, বিশ্বম্ভর মল্লিক, হারাণ দাদা, নিতাই পাঠক প্রভৃতি ছুটিয়া আসিলেন!

পিওন অবস্থা বেগতিক দেখিয়া পুরস্কার ইত্যাদির লোভ একেবারে ভুলিয়া গিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পথ দেখিল! এদিকে গ্রামে গ্রামে সান্ধ্য-আইন জারী হইয়াছে। সূর্য্য অস্তমিত হইতেই হারাণ-দাদা চম্পট দিলেন, বিশ্বম্ভর ভার-ভার্ত্তিক লোক—দুঃখে শোকে একেবারে বসিয়া পড়িলেন। আজকালের কত ছেলে-ছোক্‌রা তো তাহারই সুমুখে ইহধাম ত্যাগ করিতেছে। ভানুর বাবা সেদিন মারা গেছে, এ-কথা তাহার স্পষ্ট মনে পড়ে! অটল চৌধুরী সান্ত্বনা-সূচক বাক্যে সমাগত লোকজনদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। আর পুরমহিলাদের গগনভেদী আর্ত্তনাদে পাড়ার লোকজন প্রজাবর্গ ছুটিয়া আসিল। তাহারা শোকে বিহ্বল হইয়া আইন-কানুন সমস্ত ভুলিয়া গেল!

কুকথা বাতাসের আগে ধায়। গ্রামময় সে সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া যাইতেই ধনী, নির্ধন, শিশু, যুবা—অশ্রুমোচন করে নাই, এমন লোক গ্রামে খুব কমই ছিল। তাহারা সকলেই যে ভানু চাটার্জ্জিকে স্নেহ করিত এমন নয়, কিন্তু ইহাদের ঊর্দ্ধতন পুরুষেরা এক সময়ে গ্রামে গণ্য-মান্য বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ঘোষালদের বাঁধা ঘাটে বসিয়া ভগবান-দাদা অশ্রুমোচন করিয়া কহিলেন, বড় ফেঁপে উঠেছিল না নারায়ণ, পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়। তা' না হলে আর চন্দ্র সূর্য্য উঠ্‌ছে কেন? ঘোর কলি হলেও ধর্ম্ম এখনও যায় নি—কি বলো গোপাল খুড়ো?

গোপাল খুড়ো হাই তুলিয়া হাতে তুড়ি দিয়া কহিল, ধর্ম্মের জয় চিরকাল। কি একাল, আর সেকাল। সব সময়েই একরকম। তোমার মনে নেই নারায়ণ, রামধনের ছেলেটি যেবার মারা গেল পাড়ার লোকে বল্‌লে (আমি বলিনি, ও পাপ কথা যেন শত্তুরের মুখেও না আসে) গোপাল খুড়োর অমন প্রকাণ্ড আম গাছটা রাতারাতি কেটে নিয়ে গেলো, আর তার এঁদো পুকুরের বড় বড়—দেখো এত বড়—কই মাছগুলি জাল পেতে দিনের পর দিন সাবাড় করলে! ধর্ম্ম সাক্ষী ছিলেন বলে তার সাজা হাতে হাতে রামধনকে পেয়ে যেতে হল! তাই বলি,···

বৃন্দাবন এমন সময় একখানি মাল্‌সী গানের সুর ভাঁজিয়া সে পথে আসিতেছিলেন! বৃন্দাবনকে আসিতে দেখিয়াই গোপাল খুড়ো সাত তাড়াতাড়ি চাদরের খুঁটে অশ্রু মুছিতে মুছিতে বলিয়া উঠিল—বিন্দু দাদা, ভানু আমাদের আর নেই। কি সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে আমাদের পাড়ায়। সোনার পাড়া শ্মশান হয়ে গেছে!

বৃন্দাবন সমস্তই জানিত, শুনিত। ক্ষুদ্র একটি দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল—যা' হবার তা' হবেই, এ'নিয়ে দুঃখ করে লাভ কি বলো তো, গোপাল! আমি জানি, অনেকে ছেলেটার অকালমৃত্যুতে সুখী হয়েছে। কারও পৌষ মাস, কারও সর্ব্বনাশ।

গোপাল একথা শুনিয়া কানে আঙ্গুল দিয়া জিভ কাটিয়া কহিল—এমন লোকও পৃথিবীতে আছে নাকি! তাদের পোড়া যম চোখে দেখে না কেন!

বৃন্দাবন অতি দুঃখের মাঝেও হাসিয়া কহিল—আমি সব জানি গোপাল। আমি চোখ দেখে লোকের মনের কথা জান্‌তে পারি। সব আমি টের পাই, কিছু মুখে বলি না শুধু! সেবার মোকদ্দমার কথা আমার মনে নেই, গোপাল। ঘোষালদের সাথে চাটুয্যেদের যখন পুকুর নিয়ে দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়, তুমি দণ্ডী চাটুয্যের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দাও নি? তোমার মেয়ে সুরমার সাথে ভানুর বিয়ে দেবার জন্য তুমি যে কাণ্ড করেছিলে? বিধির নির্ব্বন্ধ, তাই বিয়ে হল না। তুমি সেই থেকে ওদের ওপর বিষম খাপ্পা! আজ চাটুয্যেদের সব লোপ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এমন একদিন তো সকলেরই আস্‌তে পারে—সে কথা একবারও ভেবে দেখো নি, না গোপাল? তোমরা কেউ এ বিপদের সময় একবার গিয়েছ? না পোলাও কালিয়া খাবার বেলা··

গোপাল লজ্জায় অধোবদন হইয়া কহিল—কই, আমি

কখনো ত কু-ভাব মনেও আনিনি দাদু। কালও গিয়েছি সেখানে!

—সেখানে গিয়েছ তামাসা দেখতে!

—ভগবান জানেন!

—ভগবানের নাম আর মুখে এনো না গোপাল। ভগবান নেই। ভগবান আছেন বলে আমার বিশ্বাস হয় না···বলিয়াই বৃন্দাবন হন্ হন্ করিয়া পথ চলিয়া গেল!

বৃন্দাবন চলিয়া যাইতেই গোপাল গোটা কয়েক লম্ফ-ঝম্প দিয়া চেঁচাইয়া কহিল—দেমাকের কথা শুন্‌লে নারায়ণ? বি-এ পাশ ছেলে থাক্‌লে এমন অহঙ্কার হয়? বছর আর ঘুরে আস্‌বে না, তোমরা দেখে নিয়ো···বলিয়াই বৃন্দাবনের উদ্দেশে অসংখ্য গালিগালাজ করিয়া সে ক্ষান্ত হইল না, রাগে গজ গজ করিতে করিতে বাঁধা ঘাট ছাড়িয়া গেল।

ঈশান ঘোষাল উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—রাগ করলে নাকি খুড়ো, বলি একটা কথা শুনে যাও!

গোপালের বিষম আস্ফালনে কাছা খুলিয়া গিয়াছিল। ডান হাতে কাছা দিতে গিয়া গোপাল অদূরে দাঁড়াইয়া বলিল—ভগবান আছেন, তিনিই এর বিচার করবেন। এখন আর শোনবার সময় নেই!

পাড়ার হরিধন মণ্ডল, পরাণ ধুপী, নেপাল কৈবর্ত্ত সে পথে যাইতেছিল। পিছনে আসিতেছিল নবাই সেখ, আকালী পালান, টোকানী সিকদার। টোকানী গলা কাসিয়া কহিল—কর্ত্তা, ধর্ম্ম নাই সংসারে। কলিতে শাস্ত্র সব মিথ্যা, নইলে পঁচিশ বছরের ছেলেটি সাতদিনের জ্বরে মারা যায়, কি বলেন?

ঈশান গীতার একটা শ্লোকের চরণ আওড়াইয়া কহিল,—বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় ··

অর্থাৎ পুরাণো বাঁশে ঘুণ ধরিলে যেমন তোমরা নূতন বাঁশ কাটিয়া আনো, তেমনি পুরাণো লোক মারা গেলে নূতন লোকের আমদানী হয়—কিন্তু কলিতে সবই উল্টা দেখ্‌ছি টোকানী!

পরাণ গালে হাত দিয়া কর্ত্তার কথাগুলি গিলিতেছিল, কহিল—ঠিকই কইছেন, নইলে আর শাস্ত্র কারে কয়? কর্ত্তা, গীতা কে লিখছিলেন?

—শ্রীকৃষ্ণ লিখেছিলেন!

—তাই তো এত ভাল কথা। সত্যযুগে বুঝি দেবতারা বই লিখতেন?

হরিধন চোখ ঘুরাইয়া আকাশের দিকে একবার চাহিয়া কহিল—কেন, শোন নি সেকালে দেবতারা পৃথিবীতে আস্‌তেন! মানুষের সাথে খেলা-ধূলা করতেন—কেন, আমাদের গোঁসাইজী বলেন নি?

নেপাল প্রায় একরকম কাঁদিয়াই কহিল—কর্ত্তা, বড় আশা ভরসা ছিল। বাবুর নাতি বড় হইব, চাক্‌রী করব, আমরা দশজনে দেশে দেশে সেই কথা বলে বেড়াইব, এ কি কম সুখের কথা! আমাদের মনোবাঞ্ছা পরমেশ্বর পূর্ণ করলেন না!

পরাণ সায় দিয়া কহিল—আর ছোটবাবুর চেহারাটা কি সুন্দর ছিল, যেন আমাগো দুর্গাপূজার কার্ত্তিক ঠাকুরের মত! দিদিমা কি এই শোক পাইয়া আর বাঁচবেন!

ঈশান ঘোষাল সান্ত্বনা দিয়া কহিল—যার যখন সময় হবে সে তখন চলে যাবেই! এতে আর বৃথা শোক করে ফল কি!

সন্ধ্যা হয়-হয় প্রায়। পরাণ হাই তুলিয়া, কাসিয়া পথ ধরিল এবং পথের বাঁকে বাগানের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে তাহার গা কেমন ছম্ ছম্ করিয়া উঠিল। মনের ভয়ে সে অনুচ্চকণ্ঠে গান ধরিল, "রবে না সুদিন—কুদিন, একদিন দিনের সন্ধ্যা হবে!"

খালের ওপার থেকে সনাতন হাঁকিয়া কহিল—আরে কেও, পরাণ নাকি? তামাক খেয়ে যাও!

পরাণ সায় দিয়া কহিল—আর তামাক খেতে পারি না সনু, গ্রামের খবর শুনেছ তো? চাটুয্যেদের···

সনাতন সহানুভূতিসূচক কণ্ঠে কহিল—সবই ভগবানের ইচ্ছা, সে কথা বলে আর ফল কি!

পরাণ আর কোন জবাব দিল না। পথের মোড়ে দূরে শুধু শোনা গেল—একদিন দিনের সন্ধ্যা হবে।

রাত্রি বেশী হয় নাই! সুচারু দিদির বারান্দায় বসিয়া কয়েকজন গ্রাম্য স্ত্রীলোক বৌ-ঝিরা ভানুর কথাই বলাবলি করিতেছিল। ছকির পিসী গলা ঝাড়িয়া কহিলেন—ভানুর মৃত্যু একটা অস্বাভাবিক ঘটনা, কি বলেন তরঙ্গিণী ঠাকুরঝি!

ঠাকুরঝি একগালে পান ও আর একগালে দোক্তা

চিবাইতে চিবাইতে জবাব দিল—এবার ভেবেছিলাম রাধুর গলায় পৈতেটা ঝুলিয়ে দেব, কিন্তু তা' কি আর হল বৌঠান। তোমরা পাঁচজনে জানো—ভানুর মা আর আমি এক গোত্রের জ্ঞাতি, তেরাত্রির ওষুধ। লোকে ত তবু বলে—জ্ঞাতি জন ভাগ্‌নে, তিন নয় আপ্‌নে!

পানুর মাসী হি হি করিয়া হাসিয়া কহিল—দুত্তোর তোদের জ্ঞাতি ওষুধ। আজকাল আবার এসব কেউ মানে নাকি! ছেলেরা ঘরের বাহিরে গিয়ে অখাদ্য কুখাদ্য খায়! শুনেছি আমাদের কেদারের মুখে "ফিরপির" সাহেবের হোটেলে গিয়ে কি সব সুখাদ্য জিনিষ খেয়েছিল বলে ঠাণ্ডা-পিসীর ডাণ্ডা খেয়েছিল না! এগুলো পিসীর বাড়াবাড়ি না?

ঠাকুরঝি একেবারে হাসিয়া গলিয়া পড়িয়া কহিল—শুধু তাই নাকি? মেয়েরা একা রাস্তায় বেরোয়, দোকান করে, স্কুলে যায়, কলেজে পড়ে, ছেলেদের সাথে ইয়ারকী দেয়, আর সব কত কি গল্প শুনি! শোনেন নি মাসী, ভানুর মৃত্যু একটা অস্বাভাবিক মৃত্যু। তিন দিনের জ্বরে কেউ কখনো মরে! আমি তো ছ'মাস ম্যালেরিয়ায় ভুগে আজও রামকাকার ঘরে নারায়ণের প্রসাদ খেয়ে এলাম!

পানুর মাসী কহিল—শোনেন নি, জ্বরের ভিতর কমলা খেয়েই তো ভানুর বিকার হয়েছিল! কিন্তু তারা তো সহুরে সরকারী ডাক্তার!

ঠাকুরঝি চোখ কপালে ঠেকাইয়া কহিল—কমলা খেতে কোন পণ্ডিতে দিয়েছিল? সকল জ্বরে কমলা পথ্য চলে না। দেখো—আসামে বুঝি ডাক্তার নেই, তাই এত লোক কালাজ্বরে মরে! আহা ছেলেটাকে যদি দেশে নিয়ে আস্‌ত! দেশের জল-হাওয়া পেটে গেলে, গায়ে লাগলে অসুখ কখনো থাক্‌তে পারে। কেন মুখুয্যেদের জিতুর কি হয়েছিল? কলিকাতার সব ডাক্তার ফেল হয়ে যেতেই সোনাখুড়া নিয়ে এলেন দেশে! যেমন পদ্মার পাড়ে পা দেওয়া, ছেলে আঙুল ফুলে হ'ল কলাগাছ!

পানুর মাসী রাগ করিয়া উচ্চকণ্ঠে কহিল—গ্রাম-দেশে বুঝি আবার চিকিৎসা-পত্র চলে! ইনজেক্‌সান নেই, রক্ত-পরীক্ষা—

ঠাকুরঝি এবার বিষম ক্ষেপিয়া কহিল—শরীরে বিষ ঢুকিয়ে দিলে কখনো লোক বাঁচে! আর দেশের খোলা-মেলা ঘর বাড়ী কোথায় পাবে বলো ত। তাজা মাছ, দুধ, তরকারী, এসব কি আর সহরে তেমন জোটে?

—কেন জুটবে না ঠাকুরঝি! আজকাল সহরের চেয়ে গ্রামের জিনিষপত্রই দাম বেশী। যা' কিছু দেশে জন্মায়, সবই তো বিদেশে চালান হয়! দেশে থেকে কচুশাক আর চুণোপুঁটি খেয়ে লোক বেঁচে থাকে।

আদুরীর পিসী অন্য কথা পাড়িলেন। কহিলেন—আমাদের গ্রামেরই দুর্ভাগ্য, নইলে এমন সব দেশের রত্ন চলে যাচ্ছে কেন? তুমি আমি যেতে পারি না! পোড়ার যম তো আমাদের চোখেও দেখে না!

ঠাকুরঝি এবার সুর বদলাইয়া কহিলেন—কথায় আছে, যেজন যাবে গো চলে, কে তারে ধরে। সত্যই তাই! আমার অনু যেবার আমাদের বিপদ সাগরে ভাসিয়ে গেল, আমরা তো স্বপ্নেও ভাবি নি। এ যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত!

ঈশান কোণে সত্য সত্যই একখানি কালো মেঘ দেখা দিয়াছিল। গ্রাম্যবধূরা যে যাহার দিকে পথ পাইল, ছুটিয়া পলাইল! ক্রমে ক্রমে মেঘখানি দিগন্ত ছড়াইয়া পড়িল, ঘনঘটা করিয়া বৃষ্টি নামিল, গাছ ভাঙিল, প্রলয়ের কলরোলে সংসার যেন গভীর উন্মাদনায় নাচিয়া উঠিল!

দিনের পর দিন গড়াইয়া যাইতে লাগিল। মাসও আসিয়া পূরিল। স্বদেশে বিদেশে যেখানে ভানুর যত আত্মীয়-স্বজন, শত্রু-মিত্র, বন্ধু-বান্ধব ছিলেন, ধীরে ধীরে অনেকের কানেই একথা গিয়া পৌঁছিল। কেহ মনে মনে দুঃখিত হইলেন, কেহ সুখী হইলেন, কেহ বা ভানু চাটার্জ্জির মৃত্যুতে পুরাণো শত্রুতার কথা মনে করিয়া মনের ঝাল মিটাইয়া লইলেন!

ঢাকায় একটি মেয়ের কথা বলি। এই মেয়েটির সাথে ভানুর এক সময়ে খুব ভাব ছিল। শৈল ভানুকে মনে-প্রাণে ভালবাসিত, কিন্তু কি একটা সামান্য বিষয় নিয়ে উভয়ের সাথে মনোমালিন্য হয়ে যায়। সেই থেকে চোখের চাওয়া-চায়ি পর্য্যন্ত ছিল না, কথা বলা তো দূরের কথা! কেহ কারও নাম শুনিলে পর্য্যন্ত বিষম ক্ষেপিয়া যাইত। কিন্তু মনে-মনে উভয়ে উভয়কে নাকি কি একরকম শ্রদ্ধার চোখে দেখিত! ভানুর মৃত্যু-সংবাদ শৈল একদিন লোক পরম্পরায় শুনিয়াছিল, এবং তাহার জনৈক আত্মীয়ের

নিকট হইতে শুনিয়া শৈল মনে মনে খুব খুশী হইল এবং ভানুর মৃত্যুতে সে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল! কিন্তু শৈল বোধ হয় তখন ভুলিয়া গিয়াছিল যে, এমন একদিন তাহারো আসিতে পারে এবং তাহাকেও শস্যশ্যামলা চিরাভিরামা পৃথিবী ছাড়িয়া অন্য এক অজানা দেশের উদ্দেশে যাত্রা করিতে হইবে!

বিকালবেলা বুলু আসিয়াছিল। শৈলকে দেখিয়াই কহিল—তোমাকে আজ এত অস্বাভাবিক দেখ্‌ছি কেন! মুখে যেন হাসি আর ধরে না। বিয়ের খবর আছে নাকি কিছু!

—হ্যাঁ, বুলু। তোমার কাছে প্রায়ই যে একটি দুষ্টু ছেলের কথা বলতাম, না? সেই ছেলেটি নাকি মারা গিয়েছে!

—ওমা, সেজন্য এত ফূর্ত্তি! তুমি ভাই, কি রকম! তোমার সে জন্য আনন্দের সীমা নেই!

—কেন করবো না! নিশ্চয়ই করবো! পৃথিবীতে তার চেয়ে আর বড় শত্রু আমার ছিল না! সে আমার সর্ব্বনাশ করতে উদ্যত হয়েছিল, তাই তাকে অভিশাপ দিয়েছিলাম!

—অভিশাপ,···! কি বলো শৈল? মানুষকে এমন অভিশাপও দিতে পারো তুমি, প্রাণে বাধে না? কি করেছিল সে? ছেলেটির নাম জানি কি···

—তার নামও মুখে আনা পাপ!

—এত অভিমান তোমার শৈল। কি, বল না, নামটি ভুলে গেছি ভাই!

—জানি না···

—না ভাই—বলো না!

শৈল হাসিয়া কহিল—নাম তো আর মুখে আন্‌ব না। আকারে ইঙ্গিতে বল্‌ব, বুঝে নিয়ো কিন্তু! পূব গগনে উঠ্‌ল রবি···

—অ বুঝেছি,···রবি!

—ছাই বুঝেছ, রবি মানে যতগুলো জানো বলে যাও··!

—তপন, কিরণ, ভানু, সূর্য্য,·····

—এরি ভিতর একটি বেছে নাও।

—আমি ভাই অত হেঁয়ালী কথা বুঝি না, রেখে দাও তোমার ছ্যাবলামি। কিন্তু আমি জানি, আজ তুমি এত কথা বল্‌ছ, সেদিন পরস্পরের প্রতি দরদ দেখিয়ে এত কথা বলা, আর সেই গানটি আমি কিছুই ভুলিনি শৈল,···

শৈলরাণী, শৈলরাণী
তোমার বুকে স্বপন সুখে
ঘুমিয়েছিলাম একটুখানি···

সেই শিলঙের পাহাড়িয়া দেশের বর্ণনা আর কত শুন্‌ব ভাই। সব বুঝি, সব জানি আমি, কিছুই ভুলিনি!

শৈল একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—তবু আমি সুখী হয়েছি। আর কোন কথা বলো না!

বুলু বাসায় ফিরিয়া আসিল অভিমানভরে। সে জীবনে কোন দিন ভানু চাটার্জ্জিকে চোখে দেখে নাই, শুধু নাম শুনিয়া অশান্ত আত্মার উদ্দেশে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলিল!

পরদিন স্কুলে ক্লাশে কোন একটি মেয়ে 'বাঁশরী' কাগজের পৃষ্ঠায় একখানি ছবি দেখাইয়া কহিতেছিল—উদীয়মান কবি ভানু চট্টোপাধ্যায় শিলং-শৈলে অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। দু' চারিটি মেয়ে ছবিখানির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিল—এই নাকি ভানু চাটার্জ্জি, কোন কলেজে পড়ত রে রিণা?

রিণা বিভার চোখে চাহিয়া কহিল—আমি কি করে জান্‌ব।

ধীরা হাসিয়া কহিল—যা চেহারা, কলেজে পড়ত কি রে? বুড়ো ধাড়ী ছেলে! হয়ত বাপ-মা তাড়ানো ছেলে।

সংযুক্তা সায় দিয়া কহিল—না হয় পিকেটিং করে জেল খেটে এসেছে!

বিটপী-ছায়া ও অসীম-মায়া দুই বোনে ঘাড় নাড়িয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিল—এ কিছুতেই হ'তে পারে না। সবুজ প্রাণ না হলে কি আর কবিতা ফোটে!

সংযুক্তা ঠাট্টা করিয়া কহিল—গেঁয়ো কবি, তার আবার সবুজ প্রাণ, না ছাই! এমন কবির অকাল-মৃত্যু ঢের ভাল!

অসীম-মায়া কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—তা' বলে ছেলেটি মারা যাবে এত অল্প বয়সে, এমন কথায় আমি কিছুতেই সায় দিতে পারছিনে! দেখো সংযুক্তা, তোমার অত দেমাক ভাল নয়। না হয় তুমি গুণীই হ'লে, তা বলে

তুমি যা-তা কথা মুখে আসবে, তাই বল্‌বে। ধরো এখানে যদি ভানুর কোন আত্মীয় থাক্‌ত···

—কেন, তুমিই তো স্বশরীরে বর্ত্তমান আছ ?

—বেশ, আছি তো—বলিয়াই অসীম-মায়া মুখ ফিরাইল।

বিভার ছোট বোন ইভা কৌতুক করিয়া কহিল—ছি, রাগ করতে নেই মায়া। বুঝলুম না হয় ভানু চাটার্জ্জির জন্য অতটুকু দরদ আছে, কিন্তু ভানু চাটার্জ্জিকে দেখলে, তার সাথে আলাপ করলে সংযুক্তারও একটু দরদ হোত বৈকি !

মায়া এবার হাসিয়া উঠিল, ঔৎসুক্যের সহিত কহিল—ভানু চাটার্জ্জি যদি ভাওয়ালের সন্ন্যাসীর মত আবার ফিরে আসে, তা' হলে কি মজা হয় রে ইভা ! তুই কি তাকে দেখেছিস্ ?

—একদিন নদীতীরে দেখেছিনু তারে ··

—এই বুড়ীগঙ্গার পাড়ে, সত্য সত্য ঢাকার সহরে ?

ইভা মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল—সেদিনও যেন দেখেছি মনে পড়ে ! যেন চেহারাটি চোখে ভাস্‌ছে !

—কি বলিস্ রে, তা' হলে জানাশোনা ছিল !

—অতটা ঠিক নয়। হারীনদার কাছে শুনেছি এবং তিনিই দূর থেকে দেখিয়েছিলেন।

—কেমন চেহারা রে·····

—আমি জানি না ভাই—বলিয়াই সে ঘরের ভিতর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল !

কলিকাতার একটা অপরিসর গলির মেসে বসিয়া জন কয়েক ফাজিল ছোক্‌রা "কুড়মুড়" চিবাইতে চিবাইতে বিষম হেস্তনেস্ত করিতেছিল ! কে একজন নাকিসুরে গান ধরিয়াছিল—"ওরে ভাই—রতনপুরের নাইয়া, পঞ্জসারের গেরাম চেন নি—"

এমন সময় হীরালাল অফিস হইতে আসিয়া হাজির, তাহাকে আজ একটু বিষণ্ণ দেখাইতেছিল ! অফিসে কে একজনের কাছে ভানুর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া আসিয়াছে। তাহাকে অমন ম্লানমুখে ঘরের ভিতর আসিতে দেখিয়া রতনপুরের নাইয়া কোথায় গিয়া যে লুকাইয়াছিল, তাহা কে জানে ! হীরালালকে আর কেহ অমন গুম্‌রো মুখে ঘরে ফিরিতে দেখে নাই। তাই কেহ তাহাকে সাহসী হইয়া কোন কথা বলিতে পারে নাই ! হীরালাল সে রাত্রি ঘরে ফিরিয়া সেই যে দরোজা বন্ধ করিল, আর পরদিন দুপুরবেলা দরোজা খুলিয়াছিল।

* * * *

এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে রামনিধি তর্কভূষণ এবং নীলকণ্ঠ বিদ্যাবাগীশ অর্দ্ধোদয় যোগে বারাণসী ধামে অবগাহন মানসে গিয়াছিলেন। মণিকর্ণিকার ঘাটে তাঁহারা দশম-বর্ষীয় একটি বালকের কণ্ঠস্বরে মুগ্ধ হইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। নীলকণ্ঠ সম্মুখে আগাইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি এখানে কোথায় থাক ?

বালক ফ্যাল-ফ্যাল দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল—কোথায় থাকি জানি না, মা জানেন !

রামনিধি টিকি নাড়িয়া কহিলেন—যা বলেছি নীলকণ্ঠ, তাই না হয়ে আর যায় না ! এ নিশ্চয়ই আমাদের গাঁয়ের সেই যে ছোঁড়াটা ছিল, কি না হে নাম,···আরে সেই যে,··· আঃ মলো, ভুলে গেলাম বুঝি ··এ যে তারই ছেলে !

নীলকণ্ঠ চক্ষু দুটি বিস্ফারিত করিয়া কহিল—হতে পারে কিন্তু দাদা, ভানু। যেমন নাম বলা রামনিধি তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া কহিল—ঠিক বলেছ, ভানু, এ যে ভানুরই ছেলে ! তোমার মনে নেই বুঝি, ছেলেটা তিন দিনের জ্বরে যে মারা গেল ! এবং পরক্ষণেই ছেলেটির প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন—বাবা, তোমাদের বাসা এখান থেকে কতদূর ?

ছেলেটি মৃদু হাসিয়া ভাসা-ভাসা চোখে চাহিয়া কহিল—বাসা ত আমাদের নেই, স্নানে এসে মাকে হারিয়ে ফেলেছি, এখন মন্দিরের বারান্দায়ই থাকি ! মা বলে গেছেন, এই বারান্দার আশে-পাশে আমাকে বসে থাক্‌তে, তিনি নিশ্চয়ই ফিরে আস্‌বেন। আজ, না হয় কাল, না হয় দু'দিন বাদে, কিন্তু ফিরে তাঁকে আসতেই হবে ! বালকের সুধাবর্ষী বাক্য শ্রবণ করিয়া রামনিধি একেবারে জল হইয়া গেলেন, তাঁহার দু'চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম হইল, ধীরে ধীরে কহিলেন—বাবা, ক'দিন হারিয়েছ !

—আজ এক বছর হল, মাকে হাঁসপাতালে নিয়ে গেছে আশ্রমের বাবুরা, মা ভাল হ'লে আবার ফিরে আস্‌বে। বোধ করি এখনও অসুখ সারে নি !

নীলকণ্ঠ মনে মনে বলিয়া উঠিল—আর কবে সারবে !

এবং পরক্ষণেই রামনিধির মুখের দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া রহিল। সেখানেও মেঘ জমিয়াছে বহুক্ষণ পূর্ব্বেই, এখন দম্‌কা হাওয়ায় জল নামিলেই হয় ! কোন মতে আত্ম-সংবরণ করিয়া কহিল—বাবা, তুমি দেশে যাবে, তোমাদের বাড়ী, ঘর, সবই আছে ; এখানে আর ক'দিন এভাবে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে। বালক সরলভাবে বলিয়া উঠিল—আমাদের দেশে ত কেউ নেই, বাবা বহুদিন গত হয়েছেন, তাই আমরা এখানে ভিক্ষা-সিক্ষা করে কোন মতে দিনগুজরাণ করছিলুম, এর ভিতর মার হ'ল অসুখ ! আশ্রমের বাবুরা নিয়ে গেলেন চিকিৎসার জন্য, আমিও যেতে চেয়েছিলুম—কিন্তু কিছুতেই নিতে চাইলেন না ! মা-ই শেষে আমাকে এখানে থাক্‌তে বলে গেছেন ! মার কথার অবাধ্য হ'ব, সে যে হ'তে পারে না !

নীলকণ্ঠ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—হায় ! দণ্ডী চাটুয্যে, তুমি স্বর্গ থেকেও এ দৃশ্য দেখতে পাচ্ছ, তোমার আশ্রয়ে থেকে কত শত জীব মানুষ হয়ে গেছে, কত লোক অনাহারে দুপুরবেলা এসে পাত পেতেছে, আর তোমারই বংশধরেরা আজ কাশীর পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং হা-অন্ন, হা-অন্ন করে দিন কাটায়। কোথায় তোমাদের সেই অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার !···বালক মাঝখানে বলিয়া উঠিল—মা অন্নপূর্ণা ত ওই মন্দিরের ভিতর থাকেন, আমি তাঁর কাছেই এখন থাকি—বলিয়াই সে ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল ! পরক্ষণেই দেশের কথার উল্লেখে অশ্রু-বিজড়িত কণ্ঠে শত-সহস্র প্রশ্ন করিয়া উঠিল—আমাদের দেশের সেই তালগাছটা আছে তো ? ময়না পিসী—মনোরমা মাসী—ভণ্ডুল মামার বৈঠকখানা—ঘোষালদের সেই বাঁধা ঘাট—কাজ্‌লাদীঘি ?

বসনাঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া রামনিধি জবাব দিল—সবই আছে, শুধু তোমরা নেই, বাবা !

নীলকণ্ঠ বালকের চোখে মুখে সস্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন—বাবার কথা মনে পড়ে, দিদিমা, ঠাকুরমা, মনে আছে সব কথা। তোমার নামটা কি বাবা, আমিত ভুলে গেছি,···হাঁ, হাঁ, শৈলেন·· না ?···ডাক নামটা কি দাদু ?

রামনিধি নীলকণ্ঠের মুখের পানে ক্ষণকাল চাহিয়া কহিলেন—এরি মাঝে ভুলে গেলে,·· "রাণ্টু" !

নীলকণ্ঠ শোকের আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিলেন—মনে নেই, গেল বছর বর্ষাকালে বৃষ্টি বাদল মাথায় করে ওরা দেশ ছেড়ে চলে এল ! সেই অকাল কুষ্মাণ্ড পাঁচুলালের ব্যাভারটা মনে নেই তোমার ! সতীর গায়ে হাত তুল্‌তে না তুল্‌তেই ছ'মাসের ভিতরই সব শেষ হ'য়ে গেল !

রামনিধি সায় দিয়া কহিলেন—কে বলে কলিযুগে ঈশ্বর নেই ! যে বিশ্বাস করে তার কাছে চিরদিনই আছে ! এবং পরক্ষণেই আকাশের দিকে তীব্র দৃষ্টি হানিয়া কহিলেন —এখনও চন্দ্র সূর্য্য উঠ্‌ছে, এখনও দিন রাত্রি সবই আছে, তবু পাপীর জয় দেখে বড় দুঃখ হয় নীলকান্ত !

নীলকান্ত ঘাড় নাড়িয়া কহিল—কোথায় হয়, পাপীর শাস্তি এ যুগেই ভগবান দেবেন, সেজন্য ভাবনা মিছামিছি করে ফল কি দাদা ?

বালক পুনরায় প্রশ্ন করিল—আমাদের তমস-মামার গাছে কাঞ্চন ফুল ফোটে, হরে মুদী এসে রোজ ফুল কুড়িয়ে নিয়ে যায় ?

—না বাবা নিয়ে যায় না, তোমার জন্য অনেক ফুল ঘাট্‌লার ওপর রেখে যায়, মালতী এসে রোজ সেই ফুলে গালা গেঁথে রাখে—বলিয়াই রামনিধি কহিলেন, দেশে যাবে বাবা ?

বালক প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল—দেশে কি করে যাব ? মাকে ফেলে আমার যাওয়া কোন মতেই হতে পারে না ! আমি যাব না !

রামনিধি, নীলকণ্ঠ অনেক পীড়াপীড়ি করিয়া দেখিল কিন্তু কোন সুফল হইল না। বালক কোন মতেই দেশে ফিরিয়া যাইতে চাহিল না !

দেশে ফিরিয়া রামনিধি গ্রামবাসীর কাছে এ কথা কর্ণ-গোচর করিতেই কেহ কেহ মুখ টিপিয়া হাসিল, কেহ বা মলিনমুখে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া গেলেন, কেহ বড় একটা সে কথায় কান দিলেন না !

জাতীয় মহাসমিতি

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

কংগ্রেসের বয়স অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ণ হইল। এই ৫০ বৎসরে কংগ্রেসের কার্য্যফল লক্ষ্য করিলে নবীনচন্দ্র সেনের উক্তি মনে পড়ে—

"ফলিয়াছে বহু আশা, ফলে নাই বহু আর।"

যে সব আশা ফলে নাই, সে সকল, বোধ হয়, আরও সাধনা-সাপেক্ষ; আর যে সব পূর্ণ হইয়াছে, সে সকলও অবজ্ঞা করিবার মত নহে।

ভারতবর্ষে যখন খণ্ড ভারতকে মহা-ভারতে পরিণত করিবার—সকল প্রদেশের অধিবাসিগণকে মিলনসূত্রে বদ্ধ করিয়া জাতি গঠনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা আত্মরক্ষার জন্য আধারের সন্ধান করিতেছিল, সেই সময় কংগ্রেসের উদ্ভব। এই আধার যে সে আকাঙ্ক্ষার উপযুক্ত—তাহা কংগ্রেসের অর্দ্ধ শতাব্দীকাল স্থিতিতেই বুঝিতে পারা যায়। কংগ্রেসের কার্য্য পদ্ধতিতে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে—কংগ্রেস নানা বিপদের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে—যখন রাজনীতিক গগনে ঘনঘটা আসন্ন প্রলয় সূচনা করিয়াছে, তখন রাজরোষ বজ্রের আকারে কংগ্রেসের উপর পতিতও হইয়াছে; কিন্তু কংগ্রেসের বিলোপ সাধিত হয় নাই। আত্মকলহ হইতেও যে কংগ্রেস অব্যাহতি লাভ করিয়াছে, তাহা নহে। মতভেদহেতু আত্মকলহে এক বার কংগ্রেসের অধিবেশন বন্ধ হইয়াছিল। কিন্তু তাহার অন্তর্নিহিত প্রবল শক্তি তাহাকে রক্ষা করিয়াছিল—নষ্ট হইতে দেয় নাই। সে শক্তি জাতীয়তার প্রাণ—ইংরাজীতে যাহাকে nationalism বলে তাহাই; 'বসুমতী' পত্রে সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাহার অনুবাদ করিয়াছিলেন—দেশাত্মবোধ।

ইহার প্রস্ফুরণের জন্য আমরা ইংরাজের নিকট কৃতজ্ঞ। মুসলমান শাসনের শেষ দশায় দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলার সময় বাঙ্গালার কতিপয় ক্ষমতাশালী লোক ইংরাজকে যে প্রাধান্য প্রদান করেন, তাহার মধ্যে ষড়যন্ত্রও যে ছিল না, এমন নহে। সেই প্রাধান্য ক্রমে রাজশক্তিতে পরিণতি লাভ করে এবং দেশে শৃঙ্খলা ও শান্তি স্থাপিত হয়। তদবধি দেশের শিল্প-বাণিজ্যের সর্ব্বনাশে দেশের যত ক্ষতিই কেন হইয়া থাকুক না, আর একদিকে দেশ লাভবান হইয়াছিল—সে লাভ ভাবের রাজ্যে—জ্ঞানের রাজ্যে এবং তাহার ফলেই দেশাত্ম-বোধবিকাশ। এ দেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের প্রথম যুগেই কোন কোন ইংরাজ ইহার বিকাশ অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়া শাসক-সম্প্রদায়কে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন—বলিয়াছিলেন, ভবিষ্যৎ শাসন-কার্য্যে ভারতবাসীর সহযোগ লইতে হইবে—নহিলে দেখা যাইবে, বাহুবল কখন জাতির জাগ্রত দৃঢ় কামনাকে দলিত করিতে পারে না। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে—অর্থাৎ শত বৎসরেরও অধিককাল পূর্ব্বে রিকার্ডস নামক এক জন ইংরাজ লিখিয়াছিলেন:—

"The knowledge now diffused and diffusing, throughout India, will shortly constitute a power, which three hundred thousand British bayonets will be unable to control. * * * The ground-work of the future fabric should be co-operation with the natives in the government of themselves * * * Fleshly arms and the instruments of war, are but a fragile tenure, and 'soon to nothing brought' when opposed to the interests, and the will of an enlightened people."

কিন্তু স্বাধিকারপ্রমত্ত ব্যক্তিদিগের দ্বারা এই রাজ-নীতিকোচিত-সুপরামর্শ গৃহীত হয় নাই। আমেরিকা, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতির দৃষ্টান্ত সম্মুখে থাকিতেও এ দেশে স্বৈরশাসন ত্যক্ত হয় নাই। ইহার ফলে দেশের লোকের আত্মসম্মান আহত হইয়া অসন্তোষের উদ্ভব করিয়াছে এবং তাহাতে দেশাত্মবোধ আরও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সে সুদীর্ঘ কথা—দেশাত্মবোধের ক্রমবিকাশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিবার স্থান এ নহে। কংগ্রেস স্থাপনের অব্যবহিত পূর্ব্বের ঘটনার উল্লেখ করিয়াই আমরা নিরস্ত হইব। লর্ড রিপণের শাসনকালে এক আইন প্রণয়ন করিয়া ভারতবাসীর অপমানজনক বিচার-বৈষম্য বিলোপের চেষ্টা হয়। ভারতবাসী সিভিল সার্ভিসে চাকরীয়া হইলেও সর্ব্বত্র—সব বিষয়ে—য়ুরোপীয় অভিযুক্তের বিচারের অধিকার

তাহার ছিল না—কেন না, বিচারক বিজিত জাতির লোক, আর অভিযুক্ত ব্যক্তি বিজেতার জাতি। এই ব্যবস্থায় কেবল যে নানা অসুবিধা অনিবার্য্য, তাহাই নহে; পরন্তু বিচার-বিভ্রাট বা বিচার-ব্যাভিচারও ঘটিত। সে কথা ইংরাজ-পরিচালিত পত্র 'পাইওনীয়ার' হইতে আরম্ভ করিয়া ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী লর্ড রেডিং পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি এই অব্যবস্থার বিলোপসাধনচেষ্টায় এ দেশে য়ুরোপীয় সমাজ এত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে যে, তাহারা বড়লাটকেও অপমান করে এবং তাহাদিগের অযথা অধিকার লোপ করাও সম্ভব হয় নাই। এই ব্যাপারে য়ুরোপীয় ও ভারতীয় উভয়পক্ষে শক্তি-পরীক্ষা হয় এবং তাহাতে ভারতবাসীর মনে হয়—সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কায না করিলে ভারতবাসীর পক্ষে সঙ্গত অধিকার লাভের পথও বিঘ্নশূন্য হইবে না। সে কথা হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন:—

"শেখ্ রে এখন, ভারত-সন্তান,
শ্বেতাঙ্গ নিকটে তৃণের সমান
সমগ্র ভারত জাতি কুল মান—
রাজস্তুতি গান সব(ই) বিফল।"

সুতরাং

"যে মন্ত্র সাধনে সুপটু উহারা
সেই বীর-ব্রত—একতার ধারা
সে সাহস উৎস—সে উৎসাহ-ধারা
হৃদয়-কন্দরে গাঁথিয়া রাখো।"

ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় যে আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনী হয়, তাহার সুযোগ লইয়া নিখিল ভারত জাতীয় কন্‌ফারেন্স করা হয় এবং ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে যখন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন তখনও কলিকাতায় ঐ কন্‌ফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন হইতেছিল। সুতরাং বলা যাইতে পারে, যে অভাব দূর করিবার জন্য কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা, সে অভাব তখন, তীব্রভাবেই অনুভূত হইতেছিল। তখন রেলপথ, ডাক, তার—দেশে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে এবং ইংরাজী শিক্ষা সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছে। বাঙ্গালায় যদি সর্ব্বপ্রথম দেশাত্মবোধের উদ্বোধন হইয়া থাকে, তবে তাহার কারণ এই যে, বাঙ্গালাই সর্ব্বাগ্রে ইংরাজী শিক্ষা লাভ করে। বাঙ্গালীই সর্ব্বপ্রথম সিভিল সার্ভিসে চাকরী পাইবার জন্য বিলাতে গমন করেন এবং

কংগ্রেস স্থাপনের বহুপূর্ব্বে যখন বাঙ্গালায় হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন এই বাঙ্গালী সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরই গান রচনা করেন—

"মিলে সব ভারত-সন্তান
একতান মনঃপ্রাণ;
গাও ভারতের যশোগান।
ভারত-ভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান?
কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান?
ফলবতী বসুমতী স্রোতস্বতী পুণ্যবতী
শত খনি রত্নের নিদান।
হোক ভারতের জয়;
জয় ভারতের জয়।
গাও ভারতের জয়
কি ভয়, কি ভয়?
গাও ভারতের জয়।"

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই নগরে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন—বাঙ্গালী উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার সভাপতি।

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
বোম্বাই—১৮৮৫ (প্রথম কংগ্রেস)
এলাহাবাদ—১৮৯২

এই সভাপতি নির্ব্বাচনেই রাজনীতিক আন্দোলনে বাঙ্গালার নেতৃত্ব স্বীকৃত হয়। সে অধিবেশনে কংগ্রেসের প্রকৃত রাজনীতিক রূপ যেমন সপ্রকাশ হয় নাই, তেমনই তাহাকে

প্রকৃত প্রতিনিধি-প্রতিষ্ঠান বলিয়া অভিহিত করিবারও কারণ ছিল না। সে রূপ ফুটিয়া উঠে এবং সে কারণ দেখা যায়—কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে। সে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের কথা। সে অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন—"আমার বিক্ষিপ্ত স্বজাতীয়গণ একত্র হইবেন—আমরা স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত জীবন যাপন না করিয়া একটি জাতিতে পরিণত হইব, ইহা আমার জীবনের অন্যতম স্বপ্ন। এই কংগ্রেসে আমি সেই জাতীয় ঐক্যের আরম্ভ দেখিতেছি।"

এই রাজেন্দ্রলাল অতি অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। ইনি কেরাণীরূপে এসিয়াটিক সোসাইটীতে প্রবেশ করিয়া এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হইয়াছিলেন। ইনি প্রত্নতত্ত্বের গবেষণা করিয়া ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেন এবং পণ্ডিত ইংরাজদিগের বিরুদ্ধ মত যুক্তির দ্বারা চূর্ণ করেন। আর ইনি যেমন জগতে ভারতবাসীর উচ্চস্থানলাভে সচেষ্ট ছিলেন, তেমনই ভারতবর্ষে বাঙ্গালীর নেতৃত্ব-প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী ছিলেন।

এই অধিবেশনে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। আর বাঙ্গালী কবি হেমচন্দ্র সেই অধিবেশনে দেখিয়াছিলেন —ভারত মাতার যোগ নিদ্রা ভঙ্গ হইল—

"পূরব বাঙ্গালা মগধ বিহার
দেরা ইস্‌মাইল হিমাদ্রির ধার
করাচি মান্দ্রাজ সহর বোম্বাই
সুরাটী গুজ্‌রাটী মহারাঠী ভাই
চৌদিকে মায়েরে ঘেরিল।"

আর দেখিয়া মনে করিয়াছিলেন :—

"জীবন সার্থক আজি রে আমার
এ রাখি-বন্ধন ভারত মাঝার
দেখিনু নয়নে—দেখিনু রে আজ
অভেদ ভারত চির-মনোরথ
পূরাবার তরে চলিল।"

এই অধিবেশনের পর হইতেই কংগ্রেস রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান-রূপে পরিচালিত হয় এবং সমগ্র ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ইহাতে সমবেত হইতে আরম্ভ করেন।

এই অধিবেশনে যাঁহারা প্রতিনিধি ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে জীবিত বাঙ্গালী প্রিন্সিপাল হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, 'সঞ্জীবনী'-সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র, 'ভারতবর্ষ'-সম্পাদক রায় জলধর সেন বাহাদুর, সত্যপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, রায় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর ও কামিনীকুমার চন্দ এই কয় জনের নাম এখানে উল্লেখ করিতেছি।

কেবল মুসলমানরা প্রথমাবধি কংগ্রেসের প্রতি যেন কিছু বিরূপ ছিলেন। তাহার কারণ, তাঁহারা বহু বিলম্বে ইংরাজী শিক্ষায় আকৃষ্ট হওয়ার ফলে নানা ক্ষেত্রে হিন্দুদিগের তুলনায় পশ্চাতে ছিলেন এবং মনে করিয়াছিলেন, যে প্রতিষ্ঠানে সরকারের কার্য্যের সমালোচনা হয়, তাহাতে যোগ না দিলে তাঁহারা সরকারের প্রীতিভাজন হইবেন। লোকের রাজনীতিক অধিকার বৃদ্ধিতে হিন্দুরাই অধিক প্রভাবসম্পন্ন হইবেন—এ সন্দেহও হয় ত তাঁহাদিগের কাহারও কাহারও মনে স্থান পাইয়াছিল। ইহা বিলাতের 'টাইমস' পত্র তৎকালেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং কংগ্রেসের গুরুত্ব-হীনতা প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে ইহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, ইহার সম্বন্ধে বলা যায়—"adding another to many proofs that we must look to our Mahomedan subjects for the most sensible and moderate estimate of our policy." এত দিন পরেও আমরা মুসলমানদিগকে তুষ্ট করিয়া ভারতবর্ষের আকাঙ্ক্ষা পূরণের পথ বিঘ্নাস্তৃত করিবার এই চেষ্টা বিলাতের কতকগুলি সংবাদপত্রে দেখিতে পাইতেছি। আবার তখনও যেমন, এখনও তেমনই মুসলমানদিগের মধ্যে সকলেই যে জাতীয়তার বিরোধী তাহা বলা যায় না। বিশেষ তখন সাম্প্রদায়িক ভাব মুসলমানদিগের মধ্যে বর্ত্তমান সময়ের মত উগ্র হইয়া উঠে নাই।

লর্ড ডাফরিণ কংগ্রেসকে রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহা প্রতিষ্ঠিত হইবার পর তিনি ইহাকে "আণুবীক্ষণিক" অর্থাৎ অতি অল্প-সংখ্যক লোকের অনুষ্ঠান ও "অজ্ঞাত রাজ্যে লম্ফ" বলিয়া বিদ্রূপ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। হয়ত তিনি পরে—ইহার পরিণতি ভাবিয়া শঙ্কিত হইয়াছিলেন।

লর্ড ডাফরিণের অপেক্ষাও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ছোট-লাট সার অকল্যাণ্ড কলভিন কংগ্রেসের বিরোধিতা করেন। ভিঙ্গার রাজা উদয়প্রতাপ সিংহের নামে কংগ্রেসকে আক্রমণ করিয়া যে পুস্তিকা প্রচারিত হয় ('গণতন্ত্র ভারতের

উপযোগী নহে') তাহা সার অকল্যাণ্ডের রচনা বলিয়া জানা গিয়াছে। এই সময় এই বিষয়ে তাঁহার সহিত মিষ্টার হিউমের যে পত্রব্যবহার হয়, তাহাতে মিষ্টার হিউম স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, কংগ্রেস এ দেশে ইংরাজ শাসনের safety-valve হইবে। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজের অধিবেশনের পর যখন প্রয়াগে অধিবেশন হয়, তখন সরকার প্রথমে খসরুবাগ ব্যবহার করিতে অনুমতি দিয়া সে অনুমতি প্রত্যাহার করেন এবং তাহার পর যে জমীর জন্য অগ্রিম ভাড়া পর্য্যন্ত গৃহীত হইয়াছিল ৪ মাস পরে সে জমী দিতেও অস্বীকার করেন। কিন্তু অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি পণ্ডিত অযোধ্যানাথ "লাউদার কাসল" সংগ্রহ করিয়া তথায় অধিবেশনের ব্যবস্থা করেন।

ইহার পরবর্ত্তী অধিবেশন চতুষ্টয় যথাক্রমে—বোম্বাইয়ে, কলিকাতায়, নাগপুরে ও এলাহাবাদে। পূর্ব্ববার অধিবেশনের স্থান লইয়া বিশেষ অসুবিধা ঘটায় এ বার মহারাজা সার লক্ষ্মীশ্বর সিংহ (দ্বারবঙ্গ) "লাউদার কাসল" ক্রয় করিয়া তাহা কংগ্রেসের অধিবেশন জন্য প্রদান করেন। যাঁহারা মহারাজার উপর উমেশচন্দ্রের প্রভাবের বিষয় অবগত ছিলেন, তাঁহারা ইহার কারণ অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন।

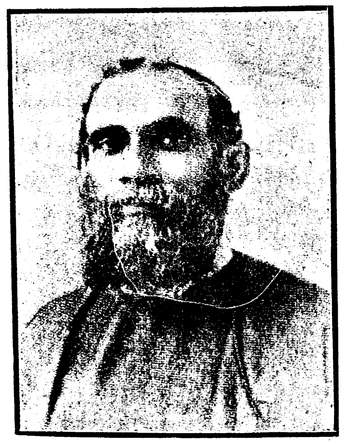

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পুনা—১৮৯৫

আমেদাবাদ—১৯০২

পর বৎসর কংগ্রেসের অধিবেশন লাহোরে। তাহার পর অধিবেশনক্ষেত্র যথাক্রমে—মাদ্রাজ, পুণা, কলিকাতা, অমরাবতী, মাদ্রাজ, লক্ষ্ণৌ, লাহোর, কলিকাতা, আমেদাবাদ, মাদ্রাজ, বোম্বাই। এই ২০ বৎসরে বাঙ্গালী সভাপতি—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৫ ও ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ), সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৫ ও ১৯০২ খৃষ্টাব্দ), আনন্দমোহন বসু (১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ), রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ), লালমোহন ঘোষ (১৯০৩ খৃষ্টাব্দ)।

আনন্দমোহন বসু, মাদ্রাজ—১৮৯৮

ইহার পর কংগ্রেসে মতের সঙ্ঘর্ষ হয়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ করিয়া যে আন্দোলন হয়, তাহার প্রভাব কংগ্রেসে পতিত হওয়া যে অনিবার্য্য, তাহা বলা বাহুল্য। বাঙ্গালা বৃটিশ পণ্য বর্জ্জন ঘোষণা করিয়া ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসে তাহার সমর্থন চাহিলে প্রথম সে সঙ্ঘর্ষ আত্ম-প্রকাশ করে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বারাণসীর অধিবেশনের পরবৎসর অধিবেশন কলিকাতায়। ইহাতে মতভেদ প্রবল হয়। জাতীয় দল তখনই স্বায়ত্ত-শাসন ভারতবাসীর কাম্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন—মডারেটরা কংগ্রেস পূর্ব্বপথেই রাখিতে চাহিতেছেন। জাতীয় দলের ইচ্ছা ছিল—বালগঙ্গাধর তিলককে সভাপতি করা হয়। মডারেটরা চেষ্টা করিয়া দাদাভাই নৌরজীকে সভাপতি করেন। সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে—কংগ্রেসের দাবী প্রকাশ করেন—স্বরাজ বা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন।

ইহার পরবর্ত্তী অধিবেশন নাগপুরে হইবার কথা ছিল; কিন্তু মডারেট নেতা সার ফিরোজশা মেটা সুরাটে মডারেট-প্রাধান্য বলিয়া অধিবেশন-স্থান তথায় পরিবর্ত্তন করেন। সে বার নির্ব্বাচিত সভাপতি—রাসবিহারী ঘোষ।

তিনি যে তাঁহার লিখিত অভিভাষণে জাতীয় দলকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, সে কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং

রমেশচন্দ্র দত্ত, লক্ষ্ণৌ—১৮৯৯

শুনা যায় মডারেটরা কলিকাতার অধিবেশনে গৃহীত স্বরাজ, বিলাতী পণ্য বর্জ্জন ও জাতীয় শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবগুলি বর্জ্জন করিবেন। জাতীয় দল এই সংবাদে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠেন এবং শেষে উভয় দলের সঙ্ঘর্ষে কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া যায়।

লালমোহন ঘোষ, মাদ্রাজ—১৯০৩

ইহার পর জাতীয় দলের অনেক নেতা রাজরোষে পতিত হয়েন এবং মডারেটরা নূতন নিয়ম করিয়া কংগ্রেস পরিচালন করিতে থাকেন।

এই সময় হইতে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত—মাদ্রাজ, লাহোর, এলাহাবাদ, কলিকাতা, বাঁকিপুর, করাচী, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও লক্ষ্ণৌ সহরে যে সব অধিবেশন হয়, সে সবই মডারেটদিগের অধীনে। এই কয় বৎসরে বাঙ্গালী সভাপতি—রাসবিহারী ঘোষ (১৯০৮ খৃষ্টাব্দ), ভূপেন্দ্রনাথ বসু (১৯১৪ খৃষ্টাব্দ), সার (পরে লর্ড) সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (১৯১৫ খৃষ্টাব্দ), অম্বিকাচরণ মজুমদার (১৯১৬ খৃষ্টাব্দ)। পর পর ৩ বৎসর যে বাঙ্গালী সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েন, তাহাতেই কংগ্রেসে বাঙ্গালীর প্রভাব বুঝা যায়। সেই প্রভাবের ফলে লক্ষ্ণৌ সহরের অধিবেশনে আবার উভয় দলে মিলন হয়।

রাসবিহারী ঘোষ, সুরাট—১৯০৭
মাদ্রাজ—১৯০৮

এই অধিবেশনের আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার—প্রধানতঃ মামুদাবাদের জমীদার রাজাসাহেবের চেষ্টায় মুসলমানদিগকে কংগ্রেসের সহিত একযোগে রাজনীতিক অধিকার লাভ চেষ্টা করাইবার আশায় চুক্তি হয়, কংগ্রেস যে শাসন-সংস্কার চাহিবেন তাহাতে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদিগের চারি-পঞ্চমাংশ নির্ব্বাচিত ও এক-পঞ্চমাংশ মনোনীত হইবেন এবং নির্ব্বাচিত ভারতীয় সভ্যের অনুপাতে মুসলমানের সংখ্যা এইরূপ হইবে :—

পঞ্জাব	শতকরা ৫০
যুক্তপ্রদেশ	„ ৩০
বাঙ্গালা	„ ৪০

বিহার	শতকরা ২৫
মধ্যপ্রদেশ	„ ১৫
মাদ্রাজ	„ ১৫
বোম্বাই	এক-তৃতীয়াংশ

মুসলমানগণ তাঁহাদিগের সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন-কেন্দ্র হইতেই নির্ব্বাচিত হইবেন।

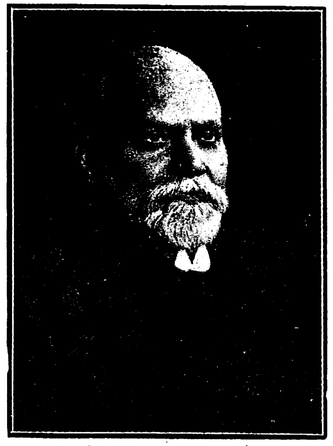

ভূপেন্দ্রনাথ বসু, মাদ্রাজ—১৯১৪

এই ব্যবস্থা মসলেম লীগ কর্ত্তৃক গৃহীত হয় এবং মুসলমানাতিরিক্ত প্রতিনিধিরা মনে করেন, মুসলমানরা এ বার কংগ্রেসে সাগ্রহে যোগ দিবেন। তখন তাঁহারা মনে করিতে পারেন নাই, জাতীয়তার স্থানে সাম্প্রদায়িকতার প্রতিষ্ঠায় বিশেষ কুফল ফলিবে এবং রক্তের আস্বাদ পাইলে শার্দ্দূল যেমন ভীষণ হইয়া উঠে—হিন্দুরা তাঁহাদিগের অযথা অধিকার লাভে সম্মত হওয়ায় মুসলমানরা তেমনই উগ্র হইয়া অযথা অধিকার-বৃদ্ধির চেষ্টাই করিবেন। যে সব ইংরাজ এ দেশে ভেদনীতির পক্ষপাতী ছিলেন, ইহাতে তাঁহাদিগেরও উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সুযোগ ঘটে। পরে—শাসন-সংস্কারে, এই সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা দৃঢ় করা হইয়াছে এবং তাহাতে দেশের কিরূপ অপকার হইয়াছে, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। বিস্ময়ের বিষয় কংগ্রেসও পরে এই ব্যবস্থা বর্জ্জন করিবার সাহস দেখাইতে পারেন নাই।

ইহার পরবর্ত্তী অধিবেশন (১৯১৭ খৃষ্টাব্দ) কলিকাতায়। ইহাতে জাতীয় দলের চেষ্টায় বিনা বিচারে বন্দিদশা হইতে মুক্ত মিসেস বেসাণ্ট সভানেত্রী হয়েন।

৮ই জুলাই (১৯১৮ খৃষ্টাব্দ) মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কার বিবরণ প্রকাশিত হইলে তাহা বিচার জন্য বোম্বাইয়ে এক অতিরিক্ত অধিবেশন হয় এবং তাহাতে সংস্কার-

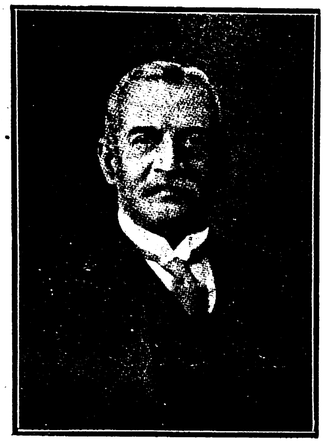

সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, বোম্বাই—১৯১৫

প্রস্তাবগুলি দেশের লোকের আকাঙ্ক্ষার উপযোগী নহে—এই মত প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা অনুমান করিয়া মডারেটরা কংগ্রেস ত্যাগ করেন।

ইহার পর দিল্লীতে ও পরবৎসর অমৃতসরে অধিবেশন হয়। অমৃতসরের অধিবেশনের পূর্ব্বেই রৌলট আইন উপলক্ষ করিয়া আন্দোলন ও জালিয়ানওয়ালাবাগে নৃশংস কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। সে অধিবেশনেও মডারেটরা যোগ দেন নাই।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় লালা লজপত রায়ের সভাপতিত্বে যে অধিবেশন হয়, তাহাকে কংগ্রেসের তৃতীয় পর্ব্বারম্ভ বলা যায়। তাহাতে অসহযোগনীতি গৃহীত হয় এবং গান্ধীজী সে প্রস্তাব উপস্থিত করেন। এই সময় হইতে কংগ্রেস গান্ধীজীর প্রভাবে পরিচালিত হইতে আরম্ভ হয়। কেবল গয়ার অধিবেশনে সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাশ ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জন প্রস্তাব প্রত্যাহার করাইবার চেষ্টায় বিফলকাম হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া স্বরাজ্য দল গঠন করেন এবং তাহার ফলে দিল্লীতে এক অতিরিক্ত অধিবেশনে স্থির হয়—ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশে যাঁহাদিগের বিবেকগত কোন আপত্তি নাই, তাঁহারা সে সভায় প্রবেশ করিতে পারেন। তখন গান্ধীজী কারাগারে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে নাগপুরের

অধিবেশনের পর আমেদাবাদে চিত্তরঞ্জনের সভাপতি হইবার কথা ছিল ; কিন্তু তাঁহার কারাদণ্ড হওয়ায় তিনি পরবর্ত্তী অধিবেশনে (গয়ায়) সভাপতিত্ব করেন।

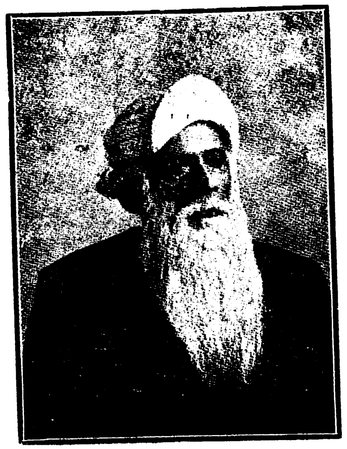

অম্বিকাচরণ মজুমদার, লক্ষ্ণৌ—১৯১৬

গয়ার পরবর্ত্তী অধিবেশনসমূহের স্থান—কোকনদ (১৯২৩ খৃষ্টাব্দ), বেলগাঁও (১৯২৪ খৃষ্টাব্দ), কাণপুর (১৯২৫ খৃষ্টাব্দ), গৌহাটী (১৯২৬ খৃষ্টাব্দ), মাদ্রাজ ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ), কলিকাতা (১৯২৮ খৃষ্টাব্দ), লাহোর (১৯২৯ খৃষ্টাব্দ), করাচী (১৯৩১ খৃষ্টাব্দ)। লাহোরের

চিত্তরঞ্জন দাশ, গয়া—১৯২২

অধিবেশনে সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কংগ্রেসের পূর্ব্বাদর্শ ত্যাগ করিয়া নূতন আদর্শ গ্রহণ করার কথা বলেন। এতদিন কংগ্রেস "স্বরাজ" চাহিয়া আসিয়াছিলেন এবং স্বরাজ বলিলে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন বুঝাইত। এই আদর্শে ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্য ত্যাগের কোন কথা উঠে নাই। পণ্ডিত জওহরলাল কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে স্বাধীনতা শব্দ ব্যবহার করেন। তিনি ইহার ব্যাখ্যা করেন—বৃটিশপ্রাধান্য ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি।

ইহার পর কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হয় এবং পরবর্ত্তী দুই বৎসর যথাক্রমে দিল্লীতে ও কলিকাতায় যে অধিবেশনের চেষ্টা হয়, তাহা অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়—অর্থাৎ সরকার অধিবেশন হইতে দেন নাই।

আইন-অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহারের সঙ্গে সঙ্গে সরকারের নিষেধাজ্ঞাও প্রত্যাহৃত হয় এবং ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই নগরে শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের সভাপতিত্বে পুনরায় কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছে।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে এক শতেরও অল্প সংখ্যক প্রতিনিধি লইয়া স্বল্প আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি-চেষ্টায় যে প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—আজ তাহা অর্দ্ধ-শতাব্দীর হইল। তাহার প্রভাব ও প্রতাপ কত বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনকালে ভারতসচিব অমৃতসরে কংগ্রেসের অধিবেশনের নির্দ্ধারণের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাহার পূর্ব্বে ভারত-সচিব লর্ড মর্লি কংগ্রেসের মডারেটদিগকে স্বপক্ষে আনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। দেশব্যাপী বিক্ষোভের সময় বড়লাট লর্ড আরউইন কংগ্রেসের প্রতিনিধির সহিত পরামর্শ করিয়া মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছিলেন। নূতন প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কার যেমনই কেন হউক না, ইহাতে কংগ্রেসের প্রভাব সুস্পষ্ট।

আশা ও নিরাশা, জয় ও পরাজয়, ত্যাগ ও সাধনা—এই সকলের মধ্য দিয়া কংগ্রেস অর্দ্ধ-শতাব্দী কাল দেশের প্রকৃত ও একমাত্র রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্যতা ও গুরুত্ব অর্জ্জন করিয়াছে। আজ সেই অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ব্বে মূর্ত্তিগ্রহণকারী ভাবের প্রতীক কংগ্রেসের জন্য উৎসব—ভারতে সর্ব্বত্র অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

কংগ্রেস কখন সন্দেহে বিচলিত, কখন জয়ে উৎফুল্ল,

কখন বা বিভাগে দুর্ব্বল হইয়াছে। কিন্তু তাহার লক্ষ্য সে কখন ত্যাগ করে নাই। তাহার সেই লক্ষ্যে যে ভারতবাসীর জন্মগত অধিকার—সে কথা বালগঙ্গাধর তিলক বলিয়াছিলেন। তাহার পর সে লক্ষ্য যে সঙ্গত ও স্বাভাবিক সে কথা সম্রাটের বাণীতে উক্ত হইয়াছে। দেশবৎসল ভারতবাসীরা যে বহুদিন হইতে স্বরাজলাভের স্বপ্ন দেখিয়া আসিতেছেন, তাহা স্বীকার করিয়া সম্রাট তাহার সার্থকতা সাধন হইবে মনে করিয়া শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তন করিলেন—বলিয়াছিলেন।

কংগ্রেস যত সবল হইবে সে স্বপ্ন ততই সাফল্য সম্ভাবনার নিকটবর্ত্তী হইবে। আজ তাহা স্মরণ করিয়া কংগ্রেসকে নূতন প্রযত্নে বরণ করিয়া দেশবাৎসল্যের গঙ্গোদকে ধৌত ত্যাগের রত্নবেদীর উপর স্থাপন করিতে হইবে—সাধনার নূতন পর্য্যায় আরম্ভ করিতে হইবে। যে বাঙ্গালী সর্ব্বপ্রথম এই প্রতিষ্ঠানের কল্পনা করিয়াছিল—যে বাঙ্গালী সর্ব্বাগ্রে মা'র রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি ধ্যান করিয়াছিল, সেই বাঙ্গালী কি আবার এই সাধনায় অগ্রণী হইয়া সিদ্ধিলাভ করিবে না? তাহার কণ্ঠে কি আবার বাঙ্গালীর রচিত মাতৃমন্ত্র সর্ব্বোচ্চ স্বরে ধ্বনিত—প্রতিধ্বনিত হইবে না—"বন্দেমাতরম্।"

চক্ষুরোগ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

ডাঃ শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এম, বি,

এ কথা আপনারা সকলেই জানেন যে আমাদের চক্ষু অত্যন্ত কোমল এবং যদিও শরীরের অন্যান্য স্থানের আঘাত অত্যন্ত সাংঘাতিক না হইলে তাহাদের কার্য্যকরী শক্তি একেবারে নষ্ট হয় না, কিন্তু চক্ষুর পীড়া কিংবা আঘাত সামান্য হইলেও তাহাতে ভবিষ্যতে রোগীর দৃষ্টিশক্তির অত্যন্ত ক্ষতি হইতে পারে। সুতরাং আমাদের চক্ষুর কোনও প্রকার পীড়া কিংবা আঘাত হইলে অত্যন্ত সাবধান হওয়া আবশ্যক।

ইহা ভিন্ন বহির্জগতের সহিত ভাবের আদানপ্রদানের জন্য চক্ষু সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়ও বটে। দৃষ্টিহীন ব্যক্তির পক্ষে জীবনধারণ বহুলাংশে বিড়ম্বনা মাত্র। জীবনের মাধুর্য্য উপভোগ দৃষ্টিশক্তি ভিন্ন সম্ভবপর নহে।

(ক) আমি প্রথম সাধারণ চক্ষুরোগ সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। কোনও কোনও ক্ষেত্রে চক্ষুরোগের চিহ্নগুলি এতই সামান্য, যে রোগী কিংবা তাহার আত্মীয় স্বজনেরা হয়ত সে সকল গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন না। খুব সাধারণ উদাহরণ হচ্ছে, যাকে ডাক্তারীতে বলা হয় Eye strain। চক্ষুকে যে কার্য্য করিতে হয়, তাহা চক্ষুর পক্ষে পীড়াদায়ক হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং কতকগুলি চিহ্ন দ্বারা চক্ষু তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহিতেছে। সাধারণতঃ এই সকল চিহ্ন উপস্থিত হইলেই আমাদের চক্ষুর দিকে নজর দেওয়া দরকার। যেমন কিয়ৎক্ষণ পড়িতে পড়িতে বা সেলাই করিতে করিতে দৃষ্টিশক্তি ঝাপ্‌সা হইয়া যাওয়া, মাথা ধরা, চোখ দিয়া জল পড়া, প্রায়ই চোখ লাল হওয়া ইত্যাদি। অবশ্য এই সকল পীড়া গুরুতর হইলে, তাহার দিকে আপনিই মনোযোগ দিতে হয় ; কিন্তু যখন এগুলি অতি সাধারণভাবে নিজেদের উপস্থিতি জানায়, তখনই যত গোলমাল বাধে। একথাটা বিশেষ করে মাথাধরা সম্বন্ধেই খাটে। মাথা ধরাটা যে সব সময়ে চোখের অসুখের জন্যই হয়, তাহা জোর করিয়া বলাও যায় না। তাহা ছাড়া মাথাধরা, রোগী ভিন্ন অন্য লোকের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। সেইজন্য অনেক সময়ে (বিশেষতঃ ছাত্রদের বেলায়) রোগীর আত্মীয় স্বজনরা মনে করেন যে, ওটা পড়াশুনা বন্ধের একটা অজুহাত মাত্র।

ছেলেদের বাপ ঠাকুর্দ্দারাও সম্ভবতঃ ছেলেবেলায়—চশমা ব্যবহার করেন নাই ; সুতরাং ছেলেদের চশমা নেওয়ায় তাঁহাদের আপত্তি স্বাভাবিক।

সুতরাং এ ব্যাপারের কোনও প্রতীকার হয় না—এইরূপেই চলিতে থাকে। ছেলেটি ক্রমশঃ পড়ায় অমনোযোগী হইয়া পড়ে—কেননা কিছুক্ষণ পড়িলেই মাথার যন্ত্রণা আরম্ভ হয়। তাহার ফলে সে বাড়ীতে এবং স্কুলে দুই জায়গাতেই বকুনি খায়, পরীক্ষার ফলও খারাপ হয়। কিন্তু প্রথমেই চক্ষু পরীক্ষা হইলে তাহার এ সকল দুর্ভোগ সহ্য করিতে হইত না।

চক্ষুরোগে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারেরা বলেন যে, যদি কোনও বিজ্ঞ ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া মত প্রকাশ করেন যে ছেলেটির চশমা লওয়া উচিত, তাহা হইলে ছেলেটির অল্প বয়স ইত্যাদি বাজে ওজর না করিয়া চশমা দেওয়া উচিত। কেন না, রোগের প্রথম অবস্থায় চশমা ব্যবহার করিলে খুব শীঘ্রই উপকার পাওয়া যায় এবং দেরীতে কোনও কোনও ক্ষেত্রে এক চোখের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া গিয়া 'ট্যারা' হইয়া যাইতে পারে।

ছেলেটিকে বরাবর চশমা ব্যবহার করিতে হইবে কি না, সেটা মধ্যে

মধ্যে চক্ষু পরীক্ষা করিলেই জানা যাইবে। বৃদ্ধেরা হয়ত বলিবেন যে, "বাপু, এককালে আমরাও ছোট ছিলাম, কিন্তু কই, আমাদের ত চশমা দরকার হয় নি। চশমা নেওয়াটা আজকালের একটা ফ্যাশান মাত্র।" তাঁরা ছেলেবেলায় চশমা ব্যবহার করেন নি, এটা সত্য। আবার আজকাল অল্পবয়সে ছেলেমেয়েরা যে বেশী চশমা ব্যবহার করছে (এবং ব্যবহার করা দরকার হয়ে পড়েছে) এটাও সত্য। কাজেই শুধু ফ্যাশানের দোহাই দিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকাটা ত ঠিক নয়। আমার মনে হয়, প্রধানতঃ এই কয়েকটি কারণে বিশেষ করে দৃষ্টিশক্তির অল্পতা হচ্ছে। যথা :

(১) অস্বাস্থ্যকর বাড়ীতে থাকা, মুক্ত আকাশ, আলো ও বাতাসের অভাব, পুষ্টিহীন আহার্য্য ইত্যাদি নানা কারণে সাধারণ স্বাস্থ্যের অবনতি। এখন বেশীর ভাগ লোকই নানা কারণে বাধ্য হইয়া সহরে থাকেন। এখানে পুষ্টিকর আহার্য্য কিংবা মুক্ত আকাশ, এ সবেরই অভাব। বাড়ীগুলি পরস্পর সংলগ্ন, আকাশ এবং বাতাস ধুলা ও ধোঁয়ায় ভরা। সাধারণ গৃহস্থের এই অবস্থা। বড়লোকেরা খোলা জায়গায় থাকিতে পারেন তবে গরীবের সে সুবিধা নাই।

(২) সাধারণ স্বাস্থ্যের নিয়ম অবহেলা করা—

(৩) অনুপযুক্ত আলোকে চক্ষুর ব্যবহার—যেমন অল্প আলোয় পাঠ, সেলাই ইত্যাদি। বায়োস্কোপের তীব্র আলোও চক্ষুর পক্ষে অপকারী।

(৪) অন্য রোগের ফল অথবা জন্মাবধি চক্ষু পীড়া—সবগুলির বিশদ বর্ণনা এখানে সম্ভব নহে। সেইজন্য সংক্ষেপে কেবল বর্ণনা করিলাম।

(খ) এইবারে আমি আরও একটু বেশী রকমের অসুখের কথা আলোচনা করিব। এখানে কেবল মাথাধরা বা চোখ দিয়া জলপড়া নয়, আরও বেশী রকমের চিহ্ন উপস্থিত। এস্থলে আর চক্ষুরোগ সম্ভব একথা বলিতে হয় না, কারণ রোগী এবং তাহার আত্মীয় স্বজন সকলের কাছেই অসুখ খুব স্পষ্ট হইয়া উঠে।

কোনওরূপ আঘাতের জন্য অথবা সাধারণ পীড়া কিংবা চক্ষুপীড়ার জন্য চক্ষুরোগের উৎপত্তি।

(১) চোখে কোনও কিছু বাহিরের জিনিস—যেমন ধুলা, বালি, ছোট পাথরের টুক্‌রা, ছোট পোকা ইত্যাদি পড়া। জিনিসটী চোখের পাতার ভিতরে আছে, কিন্তু চোখের আর কোনও ক্ষতি হয় নাই। এগুলি সাধারণতঃ পথে বেড়াইবার সময়েই ঘটে। চক্ষু লাল হইয়া উঠে এবং জল পড়িতে থাকে—যাহাতে ধুলা বালি ইত্যাদি জলে ধুইয়া বাহির হইয়া যায়। সুতরাং আমাদেরও উচিত চক্ষুকে তাহার কাজে সাহায্য করা। যাহা কিছুই পড়িয়া থাকুক না কেন, প্রথম কর্ত্তব্য, জলে চোখ ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলা। সাধারণে কিন্তু ভুল করিয়া এসব ক্ষেত্রে প্রায়ই চোখ রগড়াইতে থাকে। তাহার ফলে সেই বালি বা অন্য কিছুর টুক্‌রা চোখের মধ্যে বসিয়া যাইতে পারে এবং পরে চোখ নষ্ট হইয়া যায়। যদি জলে ধুইয়া বাহির না হয়, ত সাবধানে চোখের পাতা উল্‌টাইয়া পরিষ্কার কাপড়ের সাহায্যে বাহির করা যাইতে পারে। কিন্তু, হাত পরিষ্কার থাকা চাই এবং চোখে যেন নখের আঁচড় না লাগে, তাহা না হইলে আরও বিপদের সম্ভাবনা আছে।

বাহির করার পর, চোখে দু চার ফোঁটা পরিষ্কার লিকুইড, প্যারাফিন (Liquid Paraffin) দিলে বিশেষ আরাম হয়। যদি চোখের মধ্যে কোনও আঘাত লাগিয়া থাকে অথবা সহজে বাহির করা না যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের কাছে যাওয়া দরকার। যদি সেই ধূলা বালির টুকরা চোখের মধ্যে কোথাও বিঁধিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে প্রথম হইতেই ডাক্তারের পরামর্শ লওয়া দরকার। কেন না, তিনি সেটা উঠাইয়া ফেলিবার অথবা অন্য কোনও প্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে পারেন; কিন্তু অজ্ঞ লোকে হয়ত চোখের আরও ক্ষতি করিয়া দিতে পারে।

ইহার পরে, যে সকল চক্ষুরোগে চিকিৎসকের উপদেশ আবশ্যক সেই সকল চক্ষুরোগের কিছু আলোচনা করিব।

(২) দুর্ঘটনা, আকস্মিক বিপদের জন্য চক্ষুরোগ।

এই সকল ক্ষেত্রে সাবধানতাই প্রকৃষ্ট পন্থা। অবশ্য সকল ক্ষেত্রেই হয়ত সাবধান হওয়া সম্ভব হইয়া উঠে না।

যেমন কেহ বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। পথে মজুরেরা কাজ করিতেছে। হঠাৎ এক টুক্‌রা পাথর আসিয়া চোখে বিঁধিয়া গেল। বাজি পোড়ানোর সময়ের দুর্ঘটনার কথা সকলেই জানেন। যাহারা বাজি পোড়ায়, তাহাদের বিপদের আশঙ্কা ত আছেই, পথচারী পথিকের বিপদের ভয়ও কম নহে। কয়েক বৎসর আগেকার কথা। ৺কালীপূজার পরের দিন সকালে মেডিকেল কলেজ চক্ষু বিভাগে (Eye Infirmary) প্রায় বছর কুড়ি বাইশ বৎসরের একটি বাঙ্গালী যুবককে আনা হয়। তার আগের রাত্রে পথ দিয়া যাবার সময়ে কি রকম করে একটা বাজি ফেটে তাঁর চোখে টুক্‌রা বিঁধে যায়। অবশ্য অন্য আঘাতও ছিল; কিন্তু চোখের কথাটাই বল্‌ছি। প্রথমে আমি চেষ্টা করিলাম, কিন্তু চোখ থেকে টুকরা বাহির হইল না। রেসিডেণ্ট সার্জ্জন আসিয়া দেখিলেন, তিনিও কিছু করিতে পারিলেন না—টুক্‌রা গভীর ভাবে বিঁধিয়া রহিয়াছে। রোগীকে হাসপাতালে 'ইন্‌ডোরে' (Indoor) ভর্ত্তি করা হইল। ২।৩ দিন পরে সেই চোখটী উঠাইয়া ফেলিয়া দিতে হইল। তাই বলিতেছি, পথে চলিবার সময়েও সাবধানে চলিতে হয়।

অবশ্য ছোট ছেলেদের পক্ষেই এই রকম আঘাত পাওয়াটা বেশী সম্ভব। বড়রা অনেকটা সাবধানে চলিতে পারেন। তবে তাঁরা যখন ছেলেদের হাতে লাট্টু দেন কিংবা তাদের বাজি পোড়াতে অনুমতি দেন, তখন তাঁদের জেনে রাখা উচিত, তাতে কতটা বিপদ হতে পারে। আমি আবার মনে করিয়ে দিতে চাই, এ সমস্ত ক্ষেত্রে প্রথম হইতেই চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া উচিত।

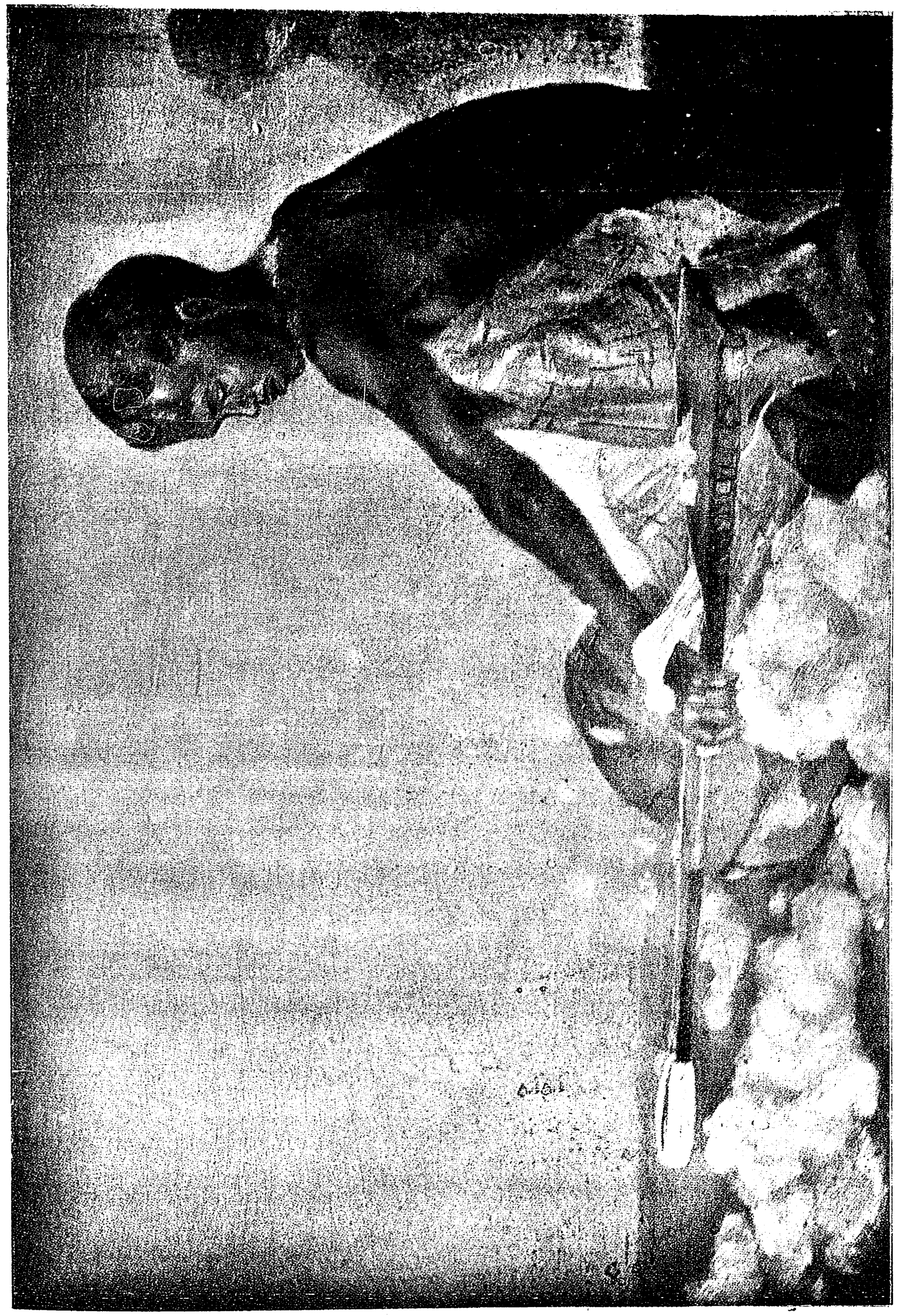

(৩) সাধারণ অসুখের জন্য চক্ষুরোগ। চোখের বিশেষ কোনও অসুখ হয় নাই—কেবল চোখ লাল হওয়া, সকালে চোখ বন্ধ হয়ে

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

COLOURED ILLUSTRATION

যাওয়া ইত্যাদি উপসর্গ আছে। হাম, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতিতে কিংবা ঠাণ্ডা লাগিয়া এ সকল হইতে পারে। এ সকল ক্ষেত্রে চোখের জন্য বিশেষ কিছু দরকার হয় না। সামান্য গরম করিয়া বোরিক লোসনে ২।৩ বার চোখ ধুইলে উপকার হয়।

(৪) চোখের বেশী রকমের অসুখ।

(অ) সাধারণ স্বাস্থ্য খারাপ হইলে অথবা বেশী রকমের অসুখে—যেমন কলেরা, টাইফয়েড ইত্যাদিতে চোখে ঘা ইত্যাদি হওয়া। এক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ লওয়া বিশেষ আবশ্যক।

(আ) সাধারণ স্বাস্থ্য বিশেষ খারাপ না হইলেও চোখের অসুখ। চোখে কোনও আঘাত লাগিবার পরে চোখে ঘা হওয়া, অথবা চোখ ওঠা (Conjunctivitis), ছানি পড়া (Cataract), চোখের ভিতরের চাপ বৃদ্ধি হওয়া (increased intra ocular pressure glaucoma) ইত্যাদি এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত। চোখের বেশী অসুখ করিলে সব ক্ষেত্রেই চোখ লাল হইয়া উঠে এবং চোখ দিয়া জল পড়া, রৌদ্রে তাকাইতে অক্ষমতা, চোখে ব্যথা—এ সমস্তই অল্প বিস্তর সব চোখের অসুখে পাওয়া যায়। সাধারণে সে জন্য এ সব অসুখই এক পর্য্যায়ে ফেলেন এবং চিকিৎসাও এক রকমই করেন। অনেক ক্ষেত্রে ভুল চিকিৎসায় সময় নষ্ট হয়।

অনেক ক্ষেত্রে দেখিয়াছি, চোখে ঘা হইয়া চোখ সাদা হইয়াছে। রোগীর আত্মীয় স্বজন জানে 'ছানি' পড়িতেছে। ছানি 'পাকিবার' জন্য অপেক্ষা করিয়া যখন রোগীকে হাসপাতালে লইয়া আসিয়াছে, তখন রোগী দৃষ্টিশক্তিহীন, অন্ধ,—মানুষের চিকিৎসার বাহিরে। এই রকম প্রত্যহই হইতেছে। তাই বলিতেছি, সময় থাকিতে সাবধান হউন। চোখের অনেক অসুখ আছে, অনেক চিকিৎসাও আছে। আমি কেবল এই কয়েকটি সামান্য কথা বলিলাম।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, যে কারণেই হউক্ না কেন, আজকাল অনেকেই চোখের অসুখে ভুগিতেছেন। চোখের অসুখ সামান্য হইলে সামান্য চিকিৎসাতেই ভাল হইয়া যাইবে, আবার হয়ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শও প্রয়োজন হইতে পারে। কাজেই চোখের অসুখ হইলে বিচক্ষণ চিকিৎসকের পরামর্শ যত শীঘ্র সম্ভব লওয়া উচিত। ঠিক সময়ে চিকিৎসা করিলে অসুখ বাড়িতে পারে না। চোখের ব্যাপারে অবহেলা করা অমার্জ্জনীয় অপরাধ।

সাধারণ স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিবেন। শরীর ভাল থাকিলে চোখও সম্ভবতঃ ভাল থাকিবে। চোখকে যথোপযুক্ত বিশ্রাম দিবেন। অল্প আলোয় কিংবা অত্যধিক আলোয় পড়াশুনা ইত্যাদি করিবেন না। চশমা দরকার হয়, ব্যবহার করুন। ভাবিবেন না, যে এতগুলি লোকে কেবল 'ফ্যাশানের' জন্যই চশমা ব্যবহার করিতেছে। যদি সম্ভব হয়, মধ্যে মধ্যে বিচক্ষণ চিকিৎসকের দ্বারা চক্ষু পরীক্ষা করাইবেন। তাহা হইলে, কোনও নূতন উপসর্গের সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা করা যাইবে।

সবশেষে এই কথাটি মনে রাখিবেন, আমাদের চোখ বড় কোমল এবং অল্পতেই নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

কবি জয়দেবের "বৈষ্ণবামৃত"

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

কটকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একটি শাখা আছে। শাখার অবস্থাও মূল পরিষদেরই মত। তবে ভরসার কথা কটকের কয়েকজন কৃতবিদ্য উদ্যমশীল বাঙ্গালী যুবক দুই-একজন খ্যাতনামা প্রবীণের সহায়তায় পরিষদের উন্নতির জন্য আ-প্রাণ পরিশ্রম করিতেছেন। পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কটকে সুপরিচিত। তিনি সম্প্রতি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। আমরা তাঁহাকে স-শ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাইয়া অনুরোধ করিতেছি, তিনি যেন জনসাধারণ এবং গভর্ণমেণ্ট উভয় পক্ষের সহযোগিতায় পরিষদের একটি স্থায়ী আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন। পরিষদের নিজস্ব কোন গৃহ নাই ইহা বাস্তবিকই অত্যন্ত দুঃখের কথা। পরিষদের কর্ম্মিগণ কটক টাউনহলে বৈষ্ণব-সাহিত্য সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিতে আমাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। বক্তৃতার পূর্ব্বদিন ইহাঁদেরই অনুগ্রহে কয়েকজন উড়িয়া সাহিত্য-সেবীর সঙ্গে কবি জয়দেব সম্বন্ধে আলোচনা হয়। উড়িষ্যার নবজাতীয়তা-বোধের আবেগের মুখে কোন কোন সাহিত্যিক কিছুদিন হইতে একটা প্রশ্ন তুলিয়াছেন "কবি জয়দেব কি উড়িয়া ছিলেন"? বৈঠকে এই বিষয়েরই আলোচনা হইয়াছিল। অপর পক্ষের একটা প্রধান যুক্তি ছিল—কবি-প্রণীত শ্রীগীতগোবিন্দ ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থ বাঙ্গালায় পাওয়া যায় না, পক্ষান্তরে উড়িষ্যায় জয়দেব প্রণীত

"বৈষ্ণবামৃত" নামক একখানি একাঙ্ক নাটিকা পাওয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য যে এরূপ যুক্তির কোন সারবত্তা নাই। যেহেতু গৌড়-কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর "রামচরিতের" কোন পুঁথি বাঙ্গালায় পাওয়া যায় নাই, পুঁথি পাওয়া-গিয়াছে নেপালে; অতএব বলিব কি কবি নেপালী ছিলেন? গৌড়-কবি চতুর্ভুজের "হরিচরিত" কাব্যখানি বাঙ্গালায় খুঁজিয়া পাই না। পুঁথি রহিয়াছে নেপালের রাজকীয় গ্রন্থশালায়। অথচ এই কবি নিজেই বলিতেছেন যে "আমার পূর্ব্বপুরুষ স্বর্ণরেখ বাঙ্গালার পাল-নরপতি ধর্ম্মপালের নিকট করঞ্জ গ্রাম দানপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" কবি চতুর্ভুজ গৌড়েশ্বর হুসেনশাহের সময় বর্ত্তমান ছিলেন। মাত্র সাড়ে চারিশত বৎসরের লেখা পুঁথিও বাঙ্গালায় পাওয়া যাইতেছে না, তা অন্যে পরে কা কথা! কিন্তু বাঙ্গালায় পাওয়া না পাওয়ার প্রশ্ন নয়, "বৈষ্ণবামৃত" সম্বন্ধে একটু বিশেষ কথা আছে। বৈষ্ণবামৃত যদি শ্রীগীতগোবিন্দ প্রণেতা কবি জয়দেবের প্রণীত হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, বাঙ্গালার প্রবাদের মূলে অনেকখানি সত্য রহিয়াছে। বৈষ্ণবামৃতের মধ্যে কোন উৎকলাধিপের নাম না থাকিলেও শ্রীজগন্নাথদেবের নাম আছে। নাটিকাখানি যে শ্রীজগন্নাথের সম্মুখে অভিনীত হইয়াছিল, গ্রন্থ মধ্যে তাহারও উল্লেখ পাইতেছি। সুতরাং ইহা জয়দেব প্রণীত হইলে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করিতে হয়, কবি জয়দেব শ্রীধাম পুরুষোত্তমে গিয়াছিলেন এবং তথায় কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে বাঙ্গালায় বিশেষ বীরভূমে এই প্রবাদই প্রচলিত আছে।

পুরী সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত করুণাকর কর, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ এম, এ, মহাশয়ের নিকট এই গ্রন্থের একটি প্রতিলিপি আছে। অধ্যক্ষ মহাশয় অপর কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাটিকার সঙ্গে এই একাঙ্ক নাটিকখানি প্রাপ্ত হন। মূল প্রতিলিপি কত দিনের পুরাতন এবং সেখানি কোথায় আছে, অধ্যক্ষ মহাশয় তাহা অবগত নহেন। আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক নাটিকাখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া শুনাইলেন এবং কয়েকটি শ্লোক লিখিয়া লইতে ও প্রকাশ করিতে অনুমতি দিলেন। এই অনুগ্রহের জন্য আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। গ্রন্থখানি প্রকৃতই শ্রীগীতগোবিন্দ রচয়িতার রচিত কিনা, সুধীজনেরা তাহার বিচার করুন।

বৈষ্ণবামৃতের সূচনা হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণের চিত্রপট দর্শনে শ্রীমতী রাধার পূর্ব্বরাগে; রাধা-কৃষ্ণের মিলনে ইহার পরিসমাপ্তি। নাটিকা-কথিত রাধাসখীগণের নাম—বকুলমালিকা, নবমালিকা, প্রেমকলা প্রভৃতি। একজন কৃষ্ণভক্তের নাম রসালক। রায় রামানন্দের জগন্নাথবল্লভ নাটকেও ললিতা, বিশাখাদি সখীগণের নাম নাই। আবার সম-সাময়িক শ্রীরূপগোস্বামীপাদের নাটকে আমরা ললিতাদির নাম প্রাপ্ত হই। আমরা এদিকে নবীন গবেষকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। অনেকে ইদানীং এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে অমুক নাটকে কি কাব্যে যখন এই নামগুলি নাই, তখন তৎসমস্তই পরের যোজনা। কিন্তু এইরূপ দুই একখানি গ্রন্থ হইতে প্রতিপন্ন হয় না যে, জয়দেব অথবা রায় রামানন্দের সময় এই নামগুলি প্রচলিত ছিল না, পরবর্ত্তীকালে পুরাণে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। নাট্যকার সখাসখীগণের নাম নির্ব্বাচনে স্বাধীন-কল্পনার সদ্ব্যবহার করিয়াছেন, এইরূপ অনুমানই সঙ্গত। নাটিকার মঙ্গলাচরণ শ্লোক এইরূপ—

কিঞ্জল্কদ্যুতিপুঞ্জ পিঞ্জর দলৎ পঙ্কেরুহ শ্রীহরং
সম্পা সম্পতিতাংশু মানস শরৎ কাদম্বিনী ভাস্বরং।
লাস্যোল্লাসিত চণ্ড তাণ্ডব কলাং লীলায়িত সন্ততম্
চক্র প্রক্রম বৃত্ত নৃত্য হরয়ো নির্ব্যাজ মব্যাজগৎ॥

অপিচ—

কম্পমান নবচম্পকাবলী চুম্বিতোৎপলসহোদরোদয়ম্
লাস্য লালস নবীন বল্লবী পল্লবীকৃত উপাস্মরে মহ॥

প্রথম শ্লোকটি শিবপক্ষ এবং কৃষ্ণপক্ষ দুইরূপেই ব্যাখ্যাত হইতে পারে। দুইটি শ্লোকই শ্রীগীতগোবিন্দের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। দ্বিতীয় শ্লোকটির শেষাংশের সঙ্গে কৃষ্ণ-কর্ণামৃতের শ্লোকাংশের সাদৃশ্য রহিয়াছে।

নান্দ্যন্তে সূত্রধারের পর নিম্নোক্ত শ্লোকটি আমাদের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মরুৎপম্পাকম্পাকুল লহরী সম্পাত শিশিরঃ
স্ফূরৎমল্লীবল্লী কুসুমপট হল্লিষক নটঃ।
স্ফূরন্নালীকালী মধুর মধুপালী কবলয়ন্
অয়ং মন্দংমন্দং তরল তরুবৃন্দং প্রসরতি॥

গ্রন্থের সামাজিক সম্বোধন এইরূপ—

অহো ভগবতো ভাগবতজন শীতময়ূখস্য নীলাচলমণি
মণ্ডনমণেঃ গরুড়ধ্বজস্য প্রাসাদে প্রমোদললিতাঃ সামাজিকা

চিত্রম্ চঞ্চলং চঞ্চলেব চতুরাচেতশ্চমৎকারিণী
পিযূষদ্যুতিমণ্ডলীব মধুরঃ স্বচ্ছ প্রবাহচ্ছটা।
দৃগ্ভঙ্গীব কুরঙ্গ ভঙ্গুর দৃশাং আনন্দ সন্দায়িনী
গোষ্ঠী শ্রীজয়দেব পণ্ডিত মণেঃ সাবর্ত্ততে নর্ত্তিতুম্॥

শ্রীগীতগোবিন্দে কবি নিজেকে পণ্ডিত কবি বলিয়াছেন—

যদ্গন্ধর্ব্বকলাসুকৌশলমনুধ্যানঞ্চ যদ্বৈষ্ণবং
যচ্ছৃঙ্গার বিবেক তত্ত্বমপি যৎকাব্যেষু লীলায়িতং।
তৎসর্ব্বং জয়দেব পণ্ডিত কবেঃ কৃষ্ণৈকতানাত্মনঃ
সানন্দাঃ পরিশোধয়ন্তু সুধিয়ঃ শ্রীগীতগোবিন্দতঃ॥
(১২ শঃ ২৭ শ্লোক)

কবি বলিতেছেন—

অশ্ম দ্রবীকর্ত্তু মিমৌ সমর্থৌ
চতুর্দ্দশানাং অপি পিষ্টপানাং।
অহং বচোভি র্জয়দেব নামা
করচ্ছটাভিশ্চ তুষারধামা॥

যে কবি বলিতে পারেন "চতুর্দ্দশ-ভুবনের মধ্যে পাষাণ গলাইতে পারি মাত্র আমরা দুইজন। এক—আমি জয়দেব পারি বাক্যচ্ছটায়, আর দ্বিতীয়—চন্দ্রদেব পারেন কিরণচ্ছটায়"! তিনি যদি শ্রীগীতগোবিন্দে "সন্দর্ভ শুদ্ধিং গিরাং জানীতে জয়দেব এব" বলিয়া থাকেন, তাঁহাকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। গোবর্দ্ধনাচার্য্য "আর্য্যাসপ্তশতী" গ্রন্থেও এইরূপ পূর্ণিমার সন্ধ্যার সঙ্গে সেন-নরপতির তুলনা করিয়াছেন। "সকলকলাঃ কল্পয়িতুং প্রভোঃ প্রবন্ধস্য কুমুদবন্ধোশ্চ। সেনকুলতিলকভূপতিরেকোরাকা প্রদোষশ্চ"। অর্থাৎ প্রবন্ধের (নৃত্য গীতাদি চতুঃষষ্টি কলা) এবং কুমুদবন্ধুর (ষোল কলা) সকল কলার সম্পূর্ণতা-সাধনে একমাত্র সেনকুলতিলক-ভূপতি বা পূর্ণিমার সন্ধ্যাই সমর্থ।

বৈষ্ণবামৃতের কৃষ্ণ-ভক্ত রসালক বলিতেছেন—

পরমব্রহ্ম নিরাকারং অবাঙ্মনসগোচরং।
বল্লবী তরলাপাঙ্গ পল্লবীকৃতমাশ্রয়॥

নিরাকার কথাটি সন্দেহজনক। কথাটি মূলে "নরাকার" ছিল কিনা অনুসন্ধানের বিষয়। কৃষ্ণকর্ণামৃতে একটি শ্লোক পাইতেছি—

শৃঙ্গাররসসর্ব্বস্বং শিখিপিচ্ছ বিভূষণম্।
অঙ্গীকৃত নরাকারমাশ্রয়ে ভুবনাশ্রয়ম্॥ (৯৩ শ্লোক)

কৃষ্ণকর্ণামৃতে ব্রহ্মেরও উল্লেখ আছে—

ধেনুপালদয়িতাস্তনস্থলীধন্যকুম্কুম সনাথ কান্তয়ে।
বেণুগীত গতি মূল বেধসে ব্রহ্মরাশি মহসে নমো নমঃ॥
(৭৭ শ্লোক)

বৈষ্ণবামৃতে মুরলীর তপস্যার প্রশংসা এইরূপ—

"জানে তবেব বয়্যা মুরলী তপস্যা পরং রচিতা।
একাকিনী মুরারে চুম্বসি বিম্বাধরং যেন॥"

শ্রীমদ্ভাগবতের একটি প্রসিদ্ধ শ্লোক তুলনীয়—

গোপ্যঃ কিমচরদয়ং কুশলম্ম বেণু
র্দ্দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাং।
ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্ট রসং হ্রদিন্যো
হৃষ্যত্বচোগ্রে মুমুচুস্তবতো যথার্য্যাঃ॥ (১০ম,২১।৯)

"গোপিগণ! এই বেণু কি পুণ্য করিয়াছিল, যাহার ফলে গোপীভোগ্য শ্রীকৃষ্ণের অধর সুধা পান করিতেছে? আর্য্যগণ যেমন আপন পুণ্য-কর্ম্মা তনয়ের সৌভাগ্যে আনন্দ প্রকাশ করেন, সেইরূপ এই বেণু যে নীরে পুষ্ট এবং যে বংশে সৃষ্ট, সেই হ্রদিনী ও তরুগণ ইহার সৌভাগ্য দর্শনে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেছে।"

শ্রীপাদ রূপগোস্বামী প্রণীত দানকেলী-কৌমুদীর একটি শ্লোক এইরূপ—

তপস্যামঃ ক্ষামোদরি বরয়িতুং বেণুষু জনু
র্বরেণ্যং মন্যেথাঃ সখি তদখিলানাং সুজন্তুষাং।
তপস্তোমে নোচ্চৈর্যদিয় মুররীকৃত্য মুরলী
মুরারাতের্বিম্বাধর মধুরিমানং রসয়তি॥

শ্রীরাধা ললিতাকে বলিতেছেন—"কৃশোদরি, জগতের ক্ষণজন্মাগণেরও বরণীয় বেণু-জাতিতে জন্ম-লাভের জন্য আমি তপস্যা করিব। দেখ, উৎকৃষ্ট তপস্যার ফলেই এই মুরলী মুরারীর বিম্বাধর-সুধা-মাধুর্য্যের আস্বাদ লাভ করিতেছে।

বৈষ্ণবামৃতের সমাপ্তি শ্লোক—

শুভমস্তু সর্ব্বজগতাং নিরন্তরং ন রিপোরপিস্ফূরতুবৈপদং পদং।
জগদীশ্বর কপটদারুবিগ্রহ করুণাকটাক্ষলহরী বিমুঞ্চতে॥

ইতি বৈষ্ণবামৃতং গোষ্ঠীরূপকং

বাঙ্গালায় অথবা উড়িষ্যায় কেহ উদ্যোগী হইয়া এই ক্ষুদ্র-পুস্তিকাখানি প্রকাশ করিলে সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি হইবে। পুরী সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় জয়দেব-রচিত আরও একখানি গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছেন। আশাকরি এবার তিনি গ্রন্থের প্রাপ্তিস্থান, লিপিকাল ইত্যাদি বিষয়ে অবহিত হইবেন। কটকে গিয়া শুনিলাম, লোকে এখনও পুরাণো কবিদের নাম দিয়া পদ রচনা করিতেছে। বৈষ্ণবামৃতপ্রণেতার প্রকৃত পরিচয় এবং সময় নির্ণয়ের জন্য কটক শাখাপরিষদের কর্ম্মী—উৎসাহী যুবক-বৃন্দকে অনুরোধ জানাইতেছি।

ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ বসুর স্মৃতিকথা

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু বি-এ

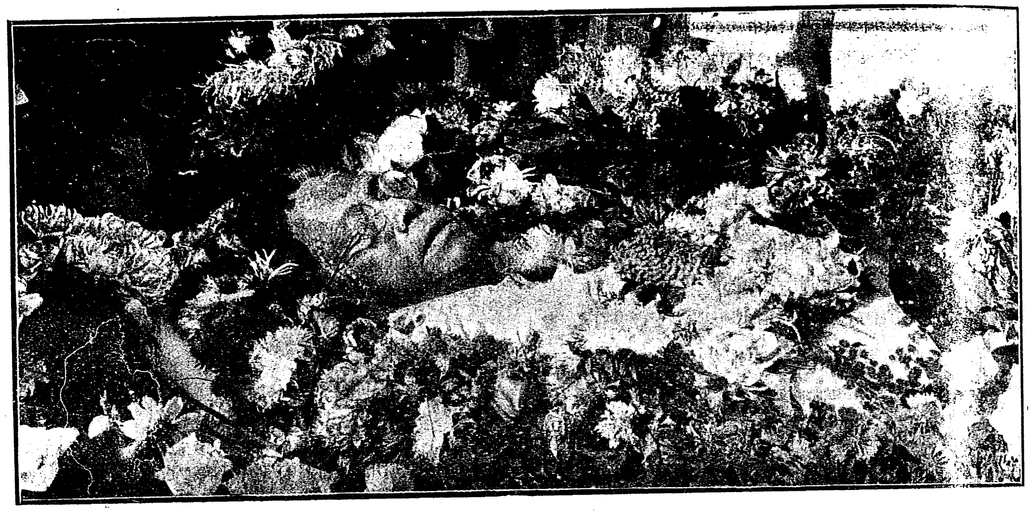

শেষ নিদ্রায় ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ

কলিকাতার বিখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ বসু সহসা পরলোক গমন করিয়াছেন, এ দুঃসংবাদে দেশ-বিদেশের বহু পাঠক পাঠিকা মর্ম্মাহত হইবেন, কারণ তাঁহার কাছে কোন-না-কোন-সময়ে উপকৃত এমন লোক অসংখ্য।

সেই সৌম্য শান্ত মূর্ত্তির সংস্পর্শে একবার যিনি আসিয়াছেন, একবার যিনি তাঁর উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠধ্বনি শুনিয়াছেন, তিনি সে ছবি জীবনে ভুলিতে পারিবেন না।

চিকিৎসা করিলেন—স্যর নীলরতন—ডক্টরস্ বিধান রায়, নলিনী সেনগুপ্ত, ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়; পরামর্শ দিতে আসিলেন—স্যর উপেন্দ্র ব্রহ্মচারী, বামনদাস মুখোপাধ্যায় হইতে কলিকাতার প্রখ্যাত চিকিৎসকমণ্ডলী। কিন্তু কোন ফলই হইল না, ব্লাড্‌প্রেসার ও ইউরিমিয়ায় তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। বাষট্টি বৎসর আগে একদিন বেলা ১০॥০টায় তিনি মেদিনীপুরের এক বাঙ্‌লোয় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ২৯শে ডিসেম্বর বেলা ১০॥০টায় শেষ নিঃশ্বাস তিনি কলিকাতার অট্টালিকায় পরিত্যাগ করিলেন।

স্যর নীলরতন চোখে রুমাল দিলেন, স্যর ব্রহ্মচারীকে থামানো গেল না, ডক্টরস্ সুশীল মুখোপাধ্যায়, বটকৃষ্ণ রায়, মদনমোহন দত্ত ছেলেমানুষের মত অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। কারমাইকেল কলেজের এমার্জেন্সি বিভাগ বন্ধ হইয়া গেল, দলে দলে ছেলেরা ছুটিয়া আসিল। কলিকাতায় এমন বড়লোক কেহ নাই যিনি তাঁর সংস্পর্শে না আসিয়াছেন। এমন দরিদ্রও কম আছেন যিনি তাঁর স্নেহস্পর্শ পান নাই। শুধু চিকিৎসা বিভাগে নয়—সাহিত্য, শিল্প, ষ্টেজ্, সিনেমা, ফুটবল, স্পোর্টিং, সুইমিং, পুলিশ ও বিচারবিভাগ—এমন কোনো বিষয়ই নাই যেখানে তাঁহার বন্ধুসংখ্যা ছিল না, নিজের শরীরপাত করিয়া যাঁহাদের উপকার না তিনি করিয়াছিলেন। তাই ফুলের মালায় মূল্যবান শয্যা আচ্ছন্ন হইয়া গেল, তাই রোদনরত জনসঙ্ঘ তাঁহার শেষ কাজের ভার নিজেরাই হাতে তুলিয়া লইল।

পথে চলিতে চলিতে লোকে জিজ্ঞাসা করে—কে গেল, উত্তর শুনিয়া মর্ম্মাহত হয়। বাইক, মোটর, ট্রাম হইতে কৃতজ্ঞ লোকেরা নামিয়া পড়িয়া সঙ্গ লয়। বারান্দা হইতে

একটি মেয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া ওঠে—অ—মাসীমা, ডাক্তার নরেন বোস যে!

কারমাইকেল কলেজ—যা তাঁর হাতে-গড়া, প্রাণের চেয়েও প্রিয়, রোগশয্যায় প্রলাপের মধ্যে যার আউট-ডোরের কথা তিনি বারবার বলিয়াছেন, তার প্রবেশ-পথে দাঁড়াইয়া মিছিল স্তব্ধ হইয়া গেল; সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর এই পথে তিনি মোটর করিয়া ঢুকিয়াছেন—অক্লান্ত এবং নিয়মিত। মেয়েদের বিভাগ, যা সম্পূর্ণ তাঁরই অধীন ছিল, পরিপূর্ণ ছিল উৎসুক নারীতে—যাঁরা আশা করিতেছিলেন তিনি সুস্থ হইয়া আসিয়া তাঁহাদের চিকিৎসা করিয়া নীরোগ করিয়া দিবেন! তাঁহারা একযোগে চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

চিত্রার্পিতবৎ কলেজ ষ্টাফ্ দাঁড়াইয়া রহিল। দুঃসহ নীরবতা। প্রিন্সিপাল ও বিভিন্ন বিভাগ একে একে মালা দিয়া গেলেন। কিন্তু যখন নার্সরা আসিতে লাগিল, তখন অবস্থা হইল করুণতম। কন্যার মত যারা কাছে ছিল, সৌম্য প্রশান্ত নিদ্রিতের মত মুখচ্ছবির দিকে চাহিয়া স্থির তারা থাকিতে পারিল না। দ্বারবানেরা কাঁদিয়া উঠিল।

মাণিকতলা প্রসূতি-আগার—যা তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি, সেখানেও সেই এক অবস্থা। নিমতলার ঘাটের সাব্-রেজিষ্ট্রারও উপকৃত, অশ্রুসজল সেও।

সহ্য করিলেন জননী, নব্বই বৎসরের বৃদ্ধা। তিনি দাঁড়াইয়া দেখিলেন—গুণবান পুত্রের শেষ সাজসজ্জা, গরদের কাপড়, চাদর, পাঞ্জাবি, চন্দন-চর্চ্চিত মুখে সোনার চশমা···হাসি তখনো লাগিয়া আছে। তিনি সুপুত্রের জননী, দিক্‌পাল পুত্র তৈয়ারী করিয়াছিলেন, বড় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু—চীফ্ এটর্ণী স্যাণ্ডার্সন এণ্ড মর্গ্যান্‌স্, মেজ ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ, সেজ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ—চীফ্ ইণ্টার-প্রীটার কলিকাতা হাইকোর্ট, ছোট ৺জ্ঞানেন্দ্রনাথ—আলিপুরের বিখ্যাত উকীল ছিলেন। তিনি সহিতে পারিবেন না ত' পারিবে কে। পিতা ৺মহেশচন্দ্র ধনামধন্য ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন, কোলাঘাটে রূপনারায়ণ ব্রীজ তাঁরই হাতের। ত্রিবেণীর কাছে এক গণ্ডগ্রাম—সুলতানগাছা ছাড়িয়া তিনিই প্রথম কলিকাতায় আসেন, পাঁচ মেয়ে ও চারি পুত্রের বিধিব্যবস্থা করিয়া কলিকাতা ও মধুপুরে বাড়ী করিয়া দিয়া তিনি পরলোকগমন করেন। জ্ঞান হারাইবার পূর্ব্বক্ষণে নরেন্দ্রনাথ ডাকিলেন 'বাবা', (এর আগে একদিনও বলেন নাই) হয়ত পিতা পুত্রকে কোলে তুলিয়া লইলেন।

প্রচুর উপায় করিয়াছেন—কারণ ধাত্রীবিদ্যায় ছিলেন অপরাজেয়; তাঁহার স্থান পূরণ হওয়া কঠিন, দানও করিয়াছেন এত যে বলিয়া শেষ করা যায় না। ফী ছাড়িয়া দেওয়া যেন তাঁহার অভ্যাসের মত দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। দরিদ্র লোক ফী দিতে আসিলে বলিতেন—"সে হবে'খন। এখন অসুখে টাকার কত দরকার পড়বে, এখন থাক্ না!" "সে হবে'খন" বলিয়া তিনি ত চলিয়া আসিতেন, কিন্তু সে টাকা কখনো পাওয়া যাইত না। তাঁর সঙ্গে যে সমস্ত চিকিৎসক থাকিত—তাহারাও কিছু পাইত না তাঁহারই জন্য। তবু কেহ একদিনের জন্যও তাঁহাকে দোষ দেয় নাই, বরঞ্চ অননুকরণীয় উদারতা দেখিয়া বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়াছে।

সামান্য পতিতার যন্ত্রণাকাতর আহ্বানে তিনি ছুটিয়া যাইতেন এমন স্থানে, যেখানে যে কোন ভদ্রলোক প্রবেশ করিতে ইতস্ততঃ করিত। কেহ বলিলে বলিতেন—"মেডিকেল প্রোফেশন মিশনারি প্রোফেশন, জাতিধর্ম্মপেশা বিচারের স্থান এখানে চলে না।" এক কপর্দ্দক তিনি লন নাই, অথচ ঐ সব সমাজপরিত্যক্তা হতভাগিনীদের জন্য অনেক বড় "কল" নষ্ট করিয়াছেন।

আশ্চর্য্য সংযম ছিল তাঁর। ভোগের মাঝখানে থাকিয়াও কি করিয়া নিঃস্পৃহ থাকা যায়, প্রকৃত কর্ম্মীর মত তিনি তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। এইজন্য এই বালকের মত সরল লোকটির কাছে রোগ সম্বন্ধে গোপনীয়তম বিষয় প্রকাশ করিতে মেয়েদের কখনো লজ্জা হয় নাই। তিনি মায়ের মত এম্‌নি আপন করিয়া লইতে জানিতেন।

আচারে বিচারে একসময় তিনি পুরাদস্তর সাহেব ছিলেন, তাঁহার ছাত্ররা বিলাত হইতে ঘুরিয়া আসিয়াও পোষাকে, ব্যবহারে ও ইংরেজী চালচলনে তাঁহার কোন ত্রুটি ধরিতে পারে নাই। তিনি বিলাত যান নাই শুধু এইজন্য যে, বিলাত না গিয়াও এখানে বসিয়াই লোকে স্ব স্ব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইতে পারে, এই কথা প্রমাণ করিবার জন্য। বিলাতের মোহ তাঁহার ছিল না। সে সত্য তিনি প্রমাণ করিয়াছিলেন স্পেশালিষ্ট্ হইয়া। ছাত্রহিসাবে তিনি তীক্ষ্ণধী ছিলেন, ব্যবসায়েও ছিলেন কৃতী। খ্যাতির

উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়া তিনি বলিলেন—"আমার ডাক এসেছে।"

অথচ এই সাহেবটির অন্তরালে যে একটি খাঁটি হিন্দু আত্মগোপন করিয়া ছিল সে সংবাদ অনেকে রাখেন না। ৺বিশ্বনাথের মন্দিরে গলায় ফুলের মালা ও ললাটে চন্দন তিলক লাগাইয়া নগ্নপদে তাঁহাকে দেখিয়া অনেকেই চিনিতে পারেন নাই। গোয়াবাগানের বিখ্যাত ৺চণ্ডীবাড়ীতে ৺চণ্ডীপাঠ ও পূজা করানো তাঁহার নিত্যকর্ম্মের মত হইয়া উঠিয়াছিল। মাদুলী, হিপ্‌নটিজ্‌ম্‌, দেবদেবী—সমস্তই তিনি অন্তর দিয়া বিশ্বাস করিতেন খাঁটি হিন্দুর মত।

বিলাস ছিল রাজোচিত। ঘরের আস্‌বাবপত্র ছিল বিচিত্র ও অতিরিক্ত মূল্যবান্‌। মোটর ছাড়া এক পা চলিতে পারিতেন না। দার্জ্জিলিং, সিম্‌লা, নৈনিতাল, গোপালপুর অন্‌সি—ছাড়া বেড়াইতে যাইতেন না। ট্রেনে সেকেণ্ড ক্লাসে যাইতেও তাঁর কষ্ট হইত, ফার্ষ্ট ক্লাসেই চড়িতেন। কিন্তু হঠাৎ একসময়ে যখন শতচ্ছিন্ন একটি গেঞ্জী ও ছিন্নপাদুকা পরিয়া বাহিরে আসিয়া বসিতেন, যেখানে নিত্য ধনী লোকের মেলা—কিম্বা বিবাহ বাড়ীতে নিমন্ত্রণে যাইতেন ছেঁড়া একটি গরম কোট গায়ে ও চটি পায়ে—তখন লোকে অবাক্‌ হইত।

অত বড় ডাক্তার, কিন্তু মনে কোন অভিমান ছিল না। যে সব বন্ধুর শয়নের স্থান অবধি জুটিত না, তাহাদের বাহিরের ঘরে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। পরন্ত পর আসিয়া টেলিফোন এবং চা ও সিগারেটে—মাঝে মাঝে খাওয়া দাওয়ায়—তাঁহার বহু পয়সা নষ্ট করিয়াছে, নানা দিক হইতে তাঁহাকে ঠকাইয়াছে—কোনদিন তিনি রাগ করেন নাই, কাহারও নামে নিন্দা অবধি করেন নাই। নির্দ্দোষ আমোদপ্রমোদ—যথা, পাশাখেলা, মাছধরা, ম্যাচ্‌ দেখা ইত্যাদি লইয়া দিন রাত এমনি যুবজনোচিত উৎসাহ ও স্ফূর্ত্তি লইয়া থাকিতেন, যে আমরা তা পারিতাম না। তাঁহারই জন্ত অনেক গুণী জ্ঞানী মহাজনের চরণস্পর্শে আমাদের বাড়ী পবিত্র হইয়াছে এবং প্রসিদ্ধও হইয়াছে। তাঁহারই কল্যাণে সামাজিক জীবন কাহাকে বলে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। একান্নবর্ত্তী পরিবারে ভ্রাতাদের সহিত যৌথ সংসারে থাকিতে তিনি আনন্দ বোধ করিতেন।

অনেক ছোট ছোট ঘটনা চারিধারে ছড়ানো রহিয়াছে তাঁহার অগণিত বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে, সেইগুলি হইতেই মানুষ হিসাবে তিনি যে কত বড় ছিলেন তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। তাঁহার একমাত্র কন্যার মনের অভিপ্রায়, সেই সব কাহিনী সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিবে—যশস্বী পিতার পুণ্যস্মৃতি চিরস্থায়ী করিয়া রাখিবার জন্য।

দেশের নারীদের অবর্ণনীয় রোগযন্ত্রণার কথা অবিরত তাঁহাকে বিচলিত করিত। তিনি বলিতেন, দশ বারো বৎসর রোগ ভোগ করিয়া তবে তারা আমাদের কাছে আসে। বিশেষ করিয়া বাংলার কুললক্ষ্মীরা স্বামীদের কাছেও গোপন বেদনার কথা প্রকাশ করিতে চায় না। রুগ্ন শরীরে সন্তানসম্ভাবনা হইলে তিনি পতিদেবতাদের ডাকিয়া ভৎর্সনা করিতেন। পীড়িতা নারীর কাছে তিনি ছিলেন ধন্বন্তরির মত, তিনি নিরাময় করিতে পারেন নাই এমন রোগিণী কমই আছে। তাঁহার চিকিৎসাকুশলতার খ্যাতি দিগন্তবিশ্রুত, কিন্তু হৃদয়ের তাঁহার তুলনা নাই। আমি জানি, শোকমুখর এ কাহিনীর করুণ কোমলতায় দিকে দিকে অগণিত জনগণ অশ্রুমার্জ্জন করিবেন এবং আমাদের উত্তরপুরুষরা এই কুলপ্রদীপের দীপশিখার উজ্জ্বল রশ্মি সাশ্রুনেত্রে স্মরণ করিবে।

কাল ভ্রষ্ট

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

কদম্ব ফুল ফুট্‌ত যদি পৌষে মাঘে,
কবিরা তার গাইত না গান অনুরাগে।
গন্ধ তাহার পড়্‌ত চাপা হিমের চাপে,
অকাল বোধন পায় যে নিধন কালের শাপে।

সাময়িকী

বসন্তকুমার বসু—

গত ৬ই পৌষ প্রাতে তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে হাইকোর্টের প্রবীণতম উকীল বসন্তকুমার বসুর মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৬ বৎসর হইয়াছিল। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ঢাকার মালখানগর গ্রামে বসন্ত বাবুর জন্ম হয়। তাঁহার পিতা রামকুমার বসু সেকালের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং পূর্ব্ববঙ্গে যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার প্রসারসাধনে অগ্রণী হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদিগের অন্যতম। ঢাকার পর বসন্তবাবু কলিকাতায় আসিয়া বিদ্যার্জ্জন করিতে থাকেন এবং ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে—একই বৎসরে—বি, এ, ও এম্‌, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। তদবধি তিনি হাইকোর্টে ওকালতী করিতে থাকেন। তাঁহার সহপাঠীদিগের মধ্যে সারদাচরণ মিত্র, সার বিপিনকৃষ্ণ বসু ও হাইকোর্টের জজ লালমোহন দাসের নাম উল্লেখযোগ্য। আইনে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল এবং ব্যবহারাজীবরূপে তিনি বিশেষ যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনিই হাইকোর্টে বার এসোসিয়েশনের প্রথম নির্ব্বাচিত সম্পাদক এবং ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি উহার সভাপতি ছিলেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ওকালতীকাল ৫০ বৎসর পূর্ণ হয় এবং উহার দুই বৎসর পরে তিনি ব্যবসা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সাহিত্য-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ইংরাজীতে যে সব পুস্তক রচনা করিয়াছেন, সে সকলের মধ্যে (১) বাঙ্গালা বিজয়, (২) বাঙ্গালায় হিন্দুদিগের আচার, (৩) মুসলমান ধর্ম্ম, (৪) খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁহার শেষ চারিখানি পুস্তক যখন রচিত হয়, তখন তাঁহার বয়স ৮০ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে। এই সকল পুস্তকেই তাঁহার গভীর জ্ঞানের ও অধ্যয়নের চিহ্ন সুপ্রকাশ। বাস্তবিক মৃত্যুর বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার মানসিক শক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল এবং তাঁহার সঙ্কল্পদৃঢ়তা কখন নষ্ট হয় নাই।

বসন্ত বাবুর ওকালতীতে সাফল্য কখনও তাঁহাকে দেশের কল্যাণকর কার্য্যে মনোযোগ হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই। তিনি কংগ্রেসের প্রথমাবধি এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত ছিলেন। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে তিনি উপস্থিত ছিলেন না বটে, কিন্তু দ্বিতীয় অধিবেশনে যোগ দিয়াছিলেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বসন্ত বাবু বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি ছিলেন এবং তাঁহার পর চিত্তরঞ্জন দাশ ঐ পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে যে বিরাট আন্দোলনে ভারতে নবজীবনের প্রকাশ তিনি তাহাতে ও স্বদেশী আন্দোলনে সোৎসাহে যোগ দিয়া-

বসন্তকুমার বসু

ছিলেন। এই সময় যে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার সহিত বসন্ত বাবুর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। উহাই এক্ষণে যাদবপুর কলেজে পরিণত হইয়াছে। বসন্ত বাবু উহার ট্রাষ্টী, সহকারী সভাপতি ও রেক্টার ছিলেন। তিনি কিছুদিন কায়স্থ সভার সভাপতিও ছিলেন।

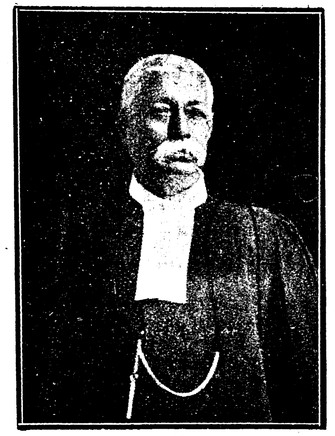

শিক্ষা সম্বন্ধীয় ও রাজনীতিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে তাঁহার আগ্রহ সর্ব্বদাই লক্ষিত হইত। যখন 'বন্দে মাতরম্‌' পত্র প্রচারিত হয়, তখন তিনি তাহার পরিচালকদিগকে বিশেষ উৎসাহ দিতেন। তিনি সে সময়ের জাতীয় দলের

সহিতই অধিক সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। ভারত সভার সহিতও তাঁহার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠই ছিল।

বসন্ত বাবু যেমন সরল, তেমনই নিরহঙ্কার ছিলেন। তিনি বিলাসবর্জ্জিত জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারাই তাঁহার সহিত পরিচিত ছিলেন, তাঁহারাই তাঁহার আন্তরিকতা, অতিথিসৎকারে আগ্রহ, দেশবাৎসল্য ও উদারতায় তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া পারেন নাই।

পরিণত বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

আমরা তাঁহার স্বজনগণকে তাঁহার মৃত্যুতে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

দীননাথ সান্যাল—

গত ৪ঠা পৌষ শুক্রবার প্রাতঃকালে তাঁহার কৃষ্ণনগরস্থ ভবনে প্রবীণ সাহিত্যিক দীননাথ সান্যাল মহাশয় প্রায় ৭৮ বৎসর বয়সে পরলোকগত হইয়াছেন। বঙ্কিমমণ্ডলের অবসানের পর যে সাহিত্যিকসঙ্ঘ 'বঙ্গবাসী'পত্রকে কেন্দ্র করিয়া গঠিত হইয়াছিল, দীননাথ তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকারের ও ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্ররোচনায় ও প্রভাবে—দেবেন্দ্রবিজয় বসুরই মত—সাহিত্য-সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যাঁহাদিগের প্ররোচনায় ও প্রভাবে তাঁহার সাহিত্যসেবার আরম্ভ ও পুষ্টি, তাঁহাদিগের দুই জনেরই মত তিনি জীবনের অপরাহ্নে মফঃস্বলে বাসস্থানে যাইয়া তথায় তরুণ সাহিত্যানুরাগীদিগকে লইয়া সাহিত্যিক সঙ্ঘ গঠিত করিয়াছিলেন। দীননাথের পিতৃগৃহ কৃষ্ণনগরে। তিনি শ্রীরামপুরে (হুগলী) মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা বা মাতামহ কেহই সঙ্গতিপন্ন ছিলেন না। মাতুলালয় হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বালক দীননাথ পিতৃগৃহে আগমন করেন। সেই সময় তিনি তথায় কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ ডাক্তার কালীচরণ লাহিড়ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কালীবাবু প্রসিদ্ধ শিক্ষক রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের অনুজ। তাঁহার সম্বন্ধে দীনবন্ধু মিত্র 'সুরধুনি কাব্যে' লিখিয়াছেন :—

"ছেলেদের কালীবাবু ছেলেরা কালীর ;
উভয়েতে মিশে যায়—যেন নীর ক্ষীর।"

এই "ছেলেদের কালীবাবু"র যত্নে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দীননাথ পাটনায় অধ্যয়ন করিতে যায়েন এবং পরে কলিকাতায় আসিয়া বি, এ ও এম, বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরকারের অধীনে ডাক্তারী চাকরী গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন হইয়া পরে সিভিল সার্জ্জনের পদ লাভ করিয়াছিলেন। কালীবাবু দীননাথের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দেন।

দীননাথ রসজ্ঞ ও সাহিত্যপ্রিয় ছিলেন। সে রসবৈশিষ্ট্য বাঙ্গালার পুরাতন সাহিত্যকে তাহার রূপ দিয়াছিল, তিনি সেই রসবৈশিষ্ট্যবোধের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। সে বৈশিষ্ট্য অনুভব করিতে হয়, তাহার স্বরূপ বর্ণনা করা যায় না। তাই বঙ্কিমচন্দ্র তাহা বর্ণনা করিবার চেষ্টা না করিয়া লিখিয়াছিলেন :—

"এক দিন বর্ষাকালে গঙ্গাতীরস্থ কোন ভবনে বসিয়া ছিলাম, প্রদোষকাল প্রস্ফুটিত চন্দ্রালোকে বিশাল বিস্তীর্ণ ভাগীরথী লক্ষবীচিবিক্ষেপশালিনী—মৃদুপবনহিল্লোলে তরঙ্গ-ভঙ্গ-চঞ্চল চন্দ্রকরমালা লক্ষ তারকার মত ফুটিতেছিল ও নিবিতেছিল। যে বারেণ্ডায় বসিয়াছিলাম, তাহার নীচে দিয়া বর্ষার তীব্রগামী বারিরাশি মৃদুরব করিয়া ছুটিতেছিল। আকাশে নক্ষত্র, নদীবক্ষে নৌকায় আলো, তরঙ্গে চন্দ্ররশ্মি! কাব্যের রাজ্য উপস্থিত হইল। মনে করিলাম, কবিতা পড়িয়া মনের তৃপ্তি-সাধন করি। ইংরেজি কবিতায় তাহা হইল না—ইংরেজির সঙ্গে এ ভাগীরথীর ত কিছুই মিলে না। কালিদাস ভবভূতিও অনেক দূরে। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র—কাহাতেও তৃপ্তি হইল না। চুপ করিয়া রহিলাম। এমন সময়ে গঙ্গাবক্ষ হইতে মধুর সঙ্গীতধ্বনি শুনা গেল। জেলে জাল বাহিতে বাহিতে গাহিতেছে :—

'সাধ আছে মা মনে
দুর্গা ব'লে প্রাণ ত্যজিব জাহ্নবী-জীবনে।'

তখন প্রাণ জুড়াইল—মনের সুর মিলিল—বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালীর মনের আশা শুনিতে পাইলাম—এ জাহ্নবী-জীবনে দুর্গা বলিয়া প্রাণ ত্যজিবারই বটে, তাহা বুঝিলাম। তখন সেই শোভাময়ী জাহ্নবী, সেই সৌন্দর্য্যময় জগৎ, সকলই আপনার বলিয়া বোধ হইল, এতক্ষণ পরের বলিয়া বোধ হইতেছিল।"

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় এই রসবৈশিষ্ট্য দীননাথকে আকৃষ্ট করিয়াছিল এবং "ইন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী" সম্পাদনে তিনি এত সাহায্য করিয়াছিলেন যে, প্রকাশক

বলিয়াছেন, "তাঁহার সহায়তা না পাইলে এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করাই দুরূহ হইত।" দীননাথ 'বঙ্গবাসীতে' স্বনামে ও নাম না দিয়া অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অমরকীর্ত্তি—বাঙ্গালা সাহিত্যে মূল্যবান দান—মধুসূদনের গ্রন্থের সমালোচনা ও ব্যাখ্যা। তিনি যখন ডাক্তারী করেন সেই সময় ইহার আরম্ভ—তখনই তিনি 'মেঘনাদবধের' ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন। তাহার পর তাহার যে পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তাহার তুলনা নাই। এই পুস্তকে তাঁহার সাহিত্য রসিকতার ও অধ্যয়নের পরিচয় পত্রে পত্রে সপ্রকাশ। ডাউডেন ও হাডশন যেমন সেক্সপীয়রের সমালোচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, দীননাথ তেমনই মধুসূদনের সমালোচনায় যশস্বী হইয়াছেন। 'মেঘনাদবধ' কাব্যের প্রথম ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছিলেন—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তাহাতে কিন্তু সমালোচনা ছিল না। এই রচনা শেষ করিয়া দীননাথ 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের' ও 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর', 'ব্রজাঙ্গনার' ও 'বীরাঙ্গনার' সংস্করণ প্রকাশ করেন। আমরা 'মেঘনাদবধ কাব্যের' যে প্রথম ব্যাখ্যা-সংস্করণের কথা বলিয়াছি, তাহা ১৩১৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় এবং তাহাতে তিনি "নিবেদনে" লিখিয়াছিলেন :—

"সুকবির সুকাব্যমাত্রেরই ব্যাখ্যার প্রয়োজন। 'মেঘনাদবধ কাব্যের' যে টীকা আছে, তাহা কেবল গোটাকতক দুরূহ শব্দের আভিধানিক অর্থ মাত্র ; ব্যাখ্যাংশ উহাতে স্বল্প ও অকিঞ্চিৎকর এবং এই জন্যই বহুতর পাঠকই 'মেঘনাদবধ কাব্যের' রসাস্বাদনে ইচ্ছুক হইয়াও বঞ্চিত। প্রধানতঃ এইরূপ পাঠকগণের জন্যই আমি বঙ্গের এই সুকাব্যখানির (কেবল 'বঙ্গের'ই বা বলি কেন ?)—পৃথিবীর উৎকৃষ্ট কাব্য সকলের মধ্যে যাহার স্থান, সুতরাং বঙ্গের অদ্বিতীয় গৌরবস্থানীয় এই সুন্দর কাব্যখানির ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। সাধ্যমত যত্ন ও চেষ্টার ত্রুটি করি নাই।"

দীননাথের যে সাহিত্য-রসজ্ঞতা মধুসূদনের নানা রচনার ব্যাখ্যায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহা তাঁহার 'কুমারসম্ভব' সম্বন্ধীয় আলোচনাতেও সপ্রকাশ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ১৩১৩ বঙ্গাব্দে তাঁহার 'মেঘনাদবধের' প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইহার "বিষয়-সূচনা" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। "উহা হইতে কাব্যের গল্পাংশ ও ঘটনা-পারম্পর্য্য অনায়াসেই বুঝা যাইবে।"

দশ বৎসর পরে তাঁহার "মেঘনাদবধ কাব্যের সীতা ও সরমা"—ব্যাখ্যা ও সমালোচনা প্রকাশিত হয়। সমালোচনাংশ পাবনা সাহিত্য-সভার প্রথম বাৎসরিক অধিবেশনে পঠিত ও 'নারায়ণ' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পুস্তকের উৎসর্গ এইরূপ :—

"কর্ষিত কাব্য-ভূমির অলৌকিক কন্যারত্ন, পবিত্রতার আদর্শ-স্বরূপিণী, রামৈকপ্রাণা সতীদেবীর নামে জয় উচ্চারণ করিয়া আমি মধুসূদনের সীতা ও সরমা চিত্রের এই ব্যাখ্যা ও সমালোচন বঙ্গের কুলনারীদিগের উদ্দেশে উৎসর্গ করিলাম।"

আর বৃদ্ধ-বয়সে বাল্মীকী রামায়ণের সংক্ষিপ্ত গদ্যানুবাদ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—"রামগুণগান গাহিয়াই সাহিত্যসেবা শেষ করিলাম।"

তখন তিনি বুঝিয়াছিলেন—

"গীত শেষ, অপরাহ্ন ; সন্ধ্যা আসিতেছে ধীরে,
বসি ধ্যানমগ্ন—এই জীবন-প্রভাসতীরে ;
সম্মুখে অনন্ত সিন্ধু—ভাসে কৃষ্ণ-পদতরি,
এই তীরে সন্ধ্যা—উষা অন্য কূলে মুগ্ধকরী।"

তিনি বাঙ্গালীকে মধুসূদনের অমর কাব্যগুলির রস আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হইবার সুযোগ দিয়া গিয়াছেন—তাঁহার সেই কার্য্যের জন্য যে তাঁহাকে—

"যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাণ্ডারে
রাখে যথা সুধামৃতে চন্দ্রের মণ্ডলে"

তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

আজ তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গবাণী এক জন একনিষ্ঠ সেবকে বঞ্চিতা হইলেন—বাঙ্গালা সাহিত্য এক জন সাহিত্যরসজ্ঞ সমালোচক ও লেখক হারাইল এবং বাঙ্গালী পাঠকগণ একজন পথি-প্রদর্শক হারাইলেন। আমরা তাঁহার শোকার্ত্ত পরিজনগণকে তাঁহাদিগের শোকে আমাদিগের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী—

সংপ্রতি ৮২ বৎসর বয়সে রায় সাহেব দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী বিদ্যাভূষণের মৃত্যু হইয়াছে। বাঙ্গালার বাহিরে যাইয়া যে সব বাঙ্গালী যশ অর্জ্জন করিয়াছেন, দুর্গাচরণ তাঁহাদিগের

অন্যতম। হুগলী জিলার বলাগড় থানার এলাকায় সোমড়া গ্রামে এক "ব্রাহ্মণ পণ্ডিত" পরিবারে দুর্গাচরণ জন্মগ্রহণ করেন। শুনা যায়, ইঁহার প্রপিতামহ সুচিকিৎসক ছিলেন। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হইয়া দুর্গাচরণ দরিদ্র পিতৃষসা কর্ত্তৃক পালিত হয়েন। বাল্যকাল হইতেই ইনি প্রবল বিদ্যার্জ্জন-স্পৃহার পরিচয় দেন। অর্থাভাবে অপরের নিকট হইতে পুস্তক লইয়া অপরের দীপালোকে ইঁহাকে বিদ্যাভ্যাস করিতে হইত। বিদ্যালয় গ্রাম হইতে ৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত থাকায় বালককে অনেক দিন অনাহারেই তথায় যাইতে হইত। এইরূপ প্রতিকূল অবস্থায় বিদ্যাভ্যাস করিয়াও

দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী

ইনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরিক্ষার্থীদিগের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন এবং লব্ধ ছাত্রবৃত্তি (১৫ টাকা) সম্বল করিয়া কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজের এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে পাঠারম্ভ করেন। তাঁহাকে ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য শিক্ষকের কায করিতে হইত এবং স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাইতে হইত। এইরূপ পরিশ্রম করিয়াও ইঁনি ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে এঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া ৫০ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। তৎপরে ইঁনি বিহারে পূর্ত্ত বিভাগে চাকরী লাভ করেন এবং ক্রমে তথায় অসাধারণ যশার্জ্জন করেন। সেচের ব্যবস্থাকর নানা কার্য্যের ভার ইঁহার উপর ন্যস্ত হয় এবং দামোদরের বন্যার প্রতীকার সম্বন্ধে উপায় নির্দ্ধারণ জন্য ইঁহাকে বর্দ্ধমানে আনা হয়। বর্দ্ধমানে আসিয়া দুর্গাচরণ ইডেন খালের কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে বিশেষ সাহায্য করেন। এই খাল ক্ষুদ্র হইলেও খাস বাঙ্গালায় ইংরাজের আমলে ইহাই খাল সম্বন্ধে প্রথম কার্য্য। চাকরীর শেষভাগে দুর্গাচরণ একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারের পদ লাভ করিয়াছিলেন।

সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া দুর্গাচরণ দর্শন শাস্ত্রের ও জ্যোতিষের চর্চ্চায় অবহিত হয়েন। বাঙ্গালা সাহিত্যে ইঁহার দানেরও বৈশিষ্ট্য আছে। এঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধীয় জটিল বিষয় বিশদভাবে দেশের লোককে বুঝাইবার চেষ্টায় ইঁনি কয়খানি পুস্তক রচনা করেন—(১) স্থপতি-বিজ্ঞান (২ খণ্ড), (২) জরিপ শিক্ষা।

এইগুলি ব্যতীত তিনি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি রচনা করিয়াছেন—গীতা ও তাহার যৌগিক ব্যাখ্যা, অলৌকিক রহস্য, ষষ্ঠেন্দ্রিয়, সপ্তমেন্দ্রিয়।

নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজ দুর্গাচরণকে "বিদ্যাভূষণ" উপাধিতে ভূষিত করেন।

বাল্যকালে স্বয়ং শিক্ষালাভের জন্য দুর্গাচরণকে কিরূপ শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ পূর্ব্বে করা হইয়াছে। তাহা স্মরণ করিয়া ইঁনি নিজ গ্রামে একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়া স্বয়ং ১০ হাজার টাকা ব্যয়ে তথায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরেও তাহার জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করেন। এই বিদ্যালয়ে এখন বহু ছাত্র শিক্ষালাভ করিতেছে।

দুর্গাচরণের স্বভাব অতি মধুর ছিল। ইঁনি ধর্ম্মপরায়ণ ও উদারস্বভাব লোক ছিলেন। ইঁহার একমাত্র সন্তান কন্যার পুত্রদিগকে ইনি স্বয়ং বিশেষ যত্নে সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। শিক্ষা সম্বন্ধে ইঁহার অনুরাগ অসাধারণই ছিল। সে অনুরাগকে তিনি মূর্ত্তিদানও করিয়া গিয়াছেন।

দুর্গাচরণের মত পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু, উদার ও ধর্ম্মনিষ্ঠ বাঙ্গালীর অভাব আমাদিগের সমাজে আজকাল পরিলক্ষিত হইতেছে। সেজন্যও তাঁহার আদর্শের আলোচনা ও অনুসরণ কর্ত্তব্য।

শ্যামাচরণ রায়—

গত ২২শে অগ্রহায়ণ ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব ও দেশসেবক রায় শ্যামাচরণ রায় বাহাদুর ৯১ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। ময়মনসিংহের বনগ্রাম নামক পল্লীগ্রামে দরিদ্র ধার্ম্মিক পরিবারে শ্যামাচরণের জন্ম হয়। প্রথমে বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া তিনি জিলা স্কুল হইতে প্রবেশিকা ও ঢাকা কলেজ হইতে এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। ইংরাজীতে তাঁহার বিশেষ অধিকার থাকিলেও গণিতে দৌর্ব্বল্যহেতু তিনি বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। কিন্তু তখনই তাঁহার ইংরাজীতে অধিকার অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিল। তিনি কটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে হেডমাষ্টার ও তাহার পর গোগোজ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে সহকারী হেডমাষ্টার নিযুক্ত হয়েন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে শ্যামাচরণ ওকালতী আরম্ভ করেন এবং শীঘ্রই তাঁহার পশার বিস্তার লাভ করে।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে শ্যামাচরণ প্রথম মিউনিসিপ্যাল কমিশনার হয়েন—লর্ড রিপণের আমলে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন আইন বিধিবদ্ধ হইলে তিনি ৪০ বৎসর নির্ব্বাচিত কমিশনার ও ১৮ বৎসর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান ছিলেন। এই সময়ে সহরের অনেক উন্নতিসাধন হয়। জলের কল সম্বন্ধে তাঁহাকে বিভাগীয় কমিশনারের মত খণ্ডন করিয়া কায করিতে হইয়াছিল।

মিউনিসিপ্যালিটীর মত জিলা বোর্ডেও তিনি দীর্ঘকাল সদস্য ছিলেন এবং তথায় তাঁহার কৃত কার্য্যও উল্লেখযোগ্য।

উকীল হইয়াও শ্যামাচরণ শিক্ষাদানে উৎসাহ হারান নাই। উকীল হইবার অল্পদিন পরে তিনি এক বন্ধুর সহযোগে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়া তাহার প্রথম শ্রেণীতে ইংরাজী শিক্ষা দিতেন। এই স্কুল পরে সিটী কলেজিয়েট স্কুলে পরিণত হইয়াছে। স্থানীয় আনন্দমোহন কলেজ স্থাপনের উদ্যোগীদিগের মধ্যেও তিনি ছিলেন এবং ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ইহার স্থাপনাবধি ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি ইহার সম্পাদক ছিলেন।

প্রধানতঃ তাঁহার উদ্যোগে বনগ্রামে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও বিদ্যাময়ী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি লিটন ডাক্তারী স্কুলের স্থাপন কমিটীর সভাপতিও ছিলেন।

রাজনীতি-চর্চ্চায় তাঁহার কার্য্য উল্লেখযোগ্য। তিনি মডারেট দলভুক্ত হইলেও সকল দলের কর্ম্মীরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। ময়মনসিংহে প্রাদেশিক সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে তিনি বলেন, দেশের রাজনীতিক কর্ম্মীরা দুই দলে বিভক্ত হইয়াছেন এবং উভয় দলকে একযোগে স্বায়ত্ত-শাসন লাভ-চেষ্টা করিতে বলেন। তিনি বলেন, দিল্লীতে কংগ্রেসের অধিবেশনে যে ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে, যাহাতে তাহাই পার্লামেণ্টে গৃহীত হয়, সে চেষ্টা করা সঙ্গত।

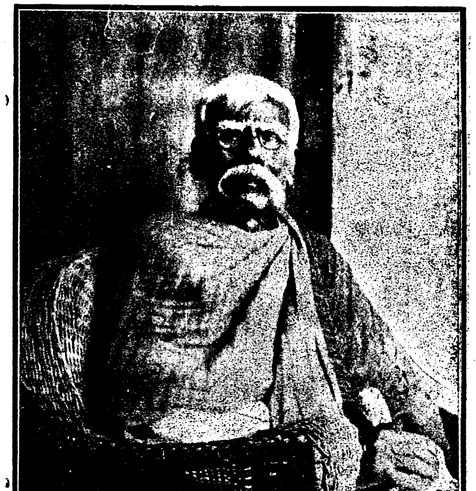

রায় বাহাদুর শ্যামাচরণ রায়

জনসাধারণের কার্য্যে তিনি উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদিগের সহিত বিরোধ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি কতকগুলি কাপড়ের দোকানের অধিকারীদিগকে নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে দোকান সরাইতে আদেশ করিলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহা স্বদেশী আন্দোলনের ফল মনে করিয়া তাঁহাকে মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যানের পদচ্যুত করিবেন, ভয় দেখাইয়া পত্র লিখিলে শ্যামাচরণ তাঁহার ব্যবহারে আপত্তি জ্ঞাপন করিয়া বলেন, তাঁহাকে পদচ্যুত

করা ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাতিরিক্ত। শেষে ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার অশিষ্ট পত্র প্রত্যাহার করেন।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে—যখন তাঁহার বয়স ৮৩ বৎসর তখনও, তিনি ঢাকা কলেজের পূর্ব্বতন ছাত্র-সম্মিলনে সভাপতিত্ব করিয়া বক্তৃতা করেন।

শ্যামাচরণের মৃত্যুতে কেবল ময়মনসিংহের নহে, পরন্তু সমগ্র বাঙ্গালার এক জন অসাধারণ ও শক্তিশালী কর্ম্মীর তিরোধান হইল। বাঙ্গালার মফঃস্বলে উপযুক্ত নেতার অভাব ঘটিলে সমগ্র প্রদেশে রাজনীতিক ও অন্যান্য জনগণ-প্রতিষ্ঠান দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। আমরা আশা করি, ময়মনসিংহের কর্ম্মীরা শ্যামাচরণের শূন্য স্থান পূর্ণ করিতে প্রয়াসী হইবেন।

—

বিশপ লেডবিটার—

যে সকল সাধক ভারতবর্ষে আসিয়া ভারতের আধ্যাত্মিক ভাবধারার সহিত পরিচয়ের পর প্রাচীন ঋষিদের আদর্শ অনুকরণে ধর্ম্মজীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, বিশপ সি, ডবলিউ, লেডবিটার তাঁহাদের অন্যতম। তিনি থিয়সফিকাল সোসাইটীর অন্যতম নেতা ম্যাডাম ব্লাভাস্কির সহিত ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ভারতে আসিয়া ত্রিশ বৎসর কাল মাদ্রাজের আদিয়ারে সোসাইটীর আশ্রমে বাস করিয়া গিয়াছেন। কিছুদিন তিনি সোসাইটীর প্রথম সভাপতি কর্ণেল অলকটের সহিত সিংহলে ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং তথায় কয়েকটি বৌদ্ধ স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ৪০ বৎসর ব্যাপী নিষ্ঠতার ফলে তিনি ডাক্তার এনি বেসাণ্টের নিকট ভারতীয় সভ্যতা ও হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ভারত ত্যাগ করিয়া বিশপ লেডবিটার সিডনীতে যাইয়া বাস করিয়াছিলেন, তথায় ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী ইংলণ্ডের অন্তর্গত নর্দাম্বারল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন—কাজেই মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৭ বৎসর হইয়াছিল। অক্সফোর্ডে শিক্ষা লাভ করিয়া ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৪ পর্য্যন্ত তিনি বিলাতেই পাদরীর কাজ করিয়াছিলেন।

বিশপ লেডবিটার (শিল্পী শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি)

সম্প্রতি মাদ্রাজ আদিয়ারে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতেছে; মাদ্রাজস্থ গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল খ্যাতনামা বাঙ্গালী শিল্পী শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী বিশপ লেডবিটারের যে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহার চিত্র আমরা এই সঙ্গে প্রকাশ করিলাম।

—

বিস্মৃত রাজনীতিক কর্ম্মী—

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে সভাপতি বদরুদ্দীন তায়াবজী কংগ্রেসের শোক-জ্ঞাপন প্রসঙ্গে গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায়ের উল্লেখ করিয়া সমবেত প্রতিনিধিবর্গকে বলেন—"তাঁহাকে আপনারা সকলেই জানিতেন এবং যাঁহারাই তাঁহাকে জানিতেন তাঁহারাই তাঁহাকে ভালবাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন। গত বৎসর কলিকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তিনি তাহার অন্যতম প্রধান কর্ম্মী ছিলেন।"

আজ প্রায় অর্দ্ধ-শতাব্দী পরে কংগ্রেসের বয়স অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ণ হওয়ায় যে উৎসব হইতেছে, তাহার মধ্যে এই বিস্মৃত কর্ম্মীর কর্ত্তব্যনিষ্ঠার ও ত্যাগের কথা স্মরণ করা বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় গিরিজাভূষণের জন্ম হয়। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, ও এম, এ, উভয় পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পাইয়া হাইকোর্টে ব্যবহারাজীবের ব্যবসা আরম্ভ করেন। তিনি যদি এই ব্যবসায়ে একনিষ্ঠভাবে নিযুক্ত থাকিতেন, তবে যে বিপুল অর্থ ও যশ অর্জ্জন করিতে পারিতেন, ইহা মনে করা যায়। কিন্তু তিনি দেশসেবার আগ্রহে নিজ স্বার্থ অনায়াসে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন।

লর্ড লিটনের শাসনকালে দেশীয় ভাষায় পরিচালিত সংবাদপত্রের অধিকার-সঙ্কোচক আইন বিধিবদ্ধ হইলে তাহার প্রতিবাদকল্পে যখন 'সোম-প্রকাশ' প্রচার বন্ধ করা হয়, তখন গিরিজা বাবু গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগে 'নব-বিভাকর' প্রকাশ করেন। এই পত্র অল্প দিনের মধ্যেই প্রভাবসম্পন্ন ও প্রতাপশালী হয়।

কিন্তু কেবল সংবাদপত্রের সাহায্যে দেশে দেশাত্মবোধ

উদ্বুদ্ধ করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। বেঙ্গল ন্যাশনাল লীগের সম্পাদকরূপে তিনি দীর্ঘ ৮ মাস কাল বাঙ্গালার নগরে নগরে ও বহু গ্রামে যাইয়া প্রচার কার্য্যের দ্বারা শিক্ষিত সমাজের আশা ও আকাঙ্ক্ষা কংগ্রেস-প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কারের অনুকূল করিবার চেষ্টায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। এই কার্য্যের বিপুল পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি ৬ দিনের জ্বরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। সে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের কথা। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ৩৮ বৎসর।

কিন্তু তাঁহার মৃত্যু কেবল তাঁহার বয়সের হিসাবেই অকাল মৃত্যু নহে, পরন্তু দেশের পক্ষেও তাহাই। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে বোম্বাই নগরে কংগ্রেসের যে প্রথম অধিবেশন হয়, তাহাতেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। সে অধিবেশনে বাঙ্গালা হইতে মাত্র ৩ জন প্রতিনিধি যোগ দিতে গিয়াছিলেন—সভাপতি, নরেন্দ্রনাথ সেন ও গিরিজাভূষণ।

তাঁহার অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ-প্রসঙ্গে নরেন্দ্রনাথ তাঁহার 'ইণ্ডিয়ান মিরার' পত্রে লিখিয়াছেন, "গত বৎসর (১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে) কলিকাতায় কংগ্রেসের যে (দ্বিতীয়) অধিবেশন হইয়াছিল, তাহার জন্য গিরিজাভূষণ বাবু অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এক কথায়, তাঁহার চেষ্টায় কংগ্রেসের অধিবেশন সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।"

বলা বাহুল্য, এই রাজনীতিক প্রচারকের কার্য্যে গিরিজা-ভূষণ বাবু ওকালতী প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

অসহযোগ আন্দোলনের জন্য যাঁহারা ওকালতী ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের প্রশংসা নানা দিকে ধ্বনিত হইয়াছে। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ আবার লাভজনক ব্যবসায়ে ফিরিয়াও গিয়াছেন। কিন্তু এই যে এক জন মনীষাসম্পন্ন বাঙ্গালী কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকালেই দেশ-মাতৃকার আহ্বানে দেশসেবার আগ্রহে ত্যাগের ব্রত আপনার জীবন দিয়া উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন, ইঁহার নাম আজ ইঁহার স্বপ্রদেশেও বিস্মৃত। আজ কংগ্রেসের বয়স যখন অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ণ হইল, তখন আমরা তাঁহার উদ্দেশে আমাদিগের শ্রদ্ধা অর্পণ করিতেছি।

—

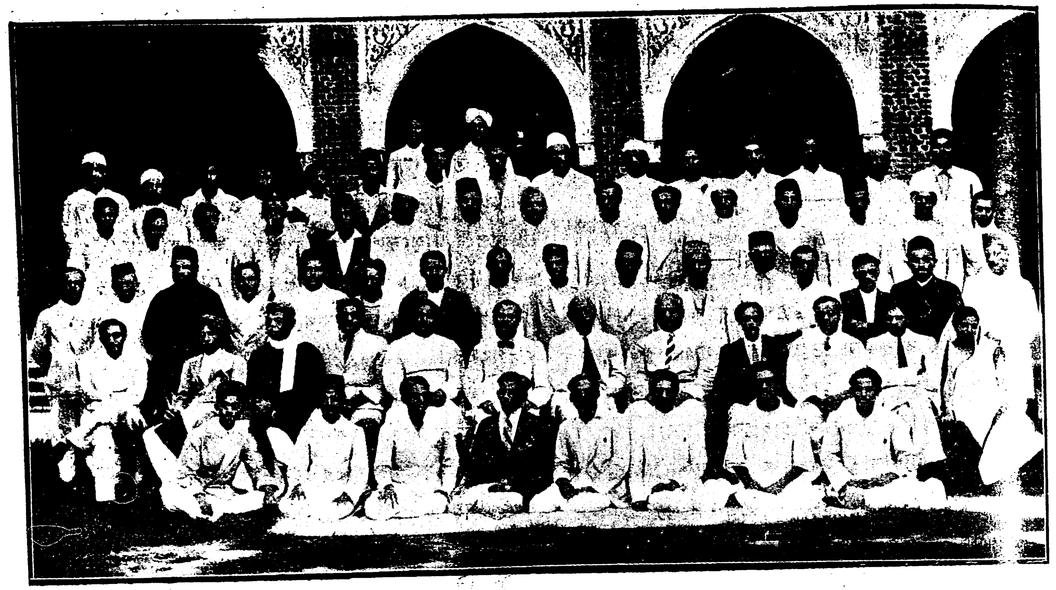

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য (মধ্যস্থলে উপবিষ্ট)

মোড়ে স্থাপিত পরলোকগত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মূর্ত্তি তাঁহারই নির্ম্মিত।

বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালী—

শ্রীযুক্ত গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। তিনি ঐ পদ হইতে অবসর গ্রহণ করার পরই বরোদা রাজ্যে মহারাজা গাইকোয়াড়ের নব-প্রতিষ্ঠিত সেকেণ্ডারী টিচার্স ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করিয়াছেন। তথায় ছাত্রগণ ও শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে যখন সম্বর্দ্ধনা করেন, সেই উপলক্ষে এই চিত্রখানি গৃহীত হইয়াছিল। চিত্রের মধ্যস্থলে ভট্টাচার্য্য মহাশয় বসিয়া আছেন। বাঙ্গালার বাহিরে একজন বাঙ্গালীর এই উচ্চ সম্মান লাভ বাঙ্গালী মাত্রেরই আনন্দের বিষয়।

লর্ড আর্সকিন—

খ্যাতনামা বাঙ্গালী শিল্পী শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী বর্ত্তমানে মাদ্রাজের গভর্ণমেণ্ট স্কুল অফ্ আর্টস্ ও ক্রাফ্টসের প্রিন্সিপাল। সম্প্রতি তিনি মাদ্রাজের গভর্ণর লর্ড আর্সকিনের যে প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার চিত্র এই সঙ্গে প্রদত্ত হইল। ভাস্কর হিসাবে ইতঃপূর্ব্বেই দেবীবাবু খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। কলিকাতা চৌরঙ্গীর

মাদ্রাজের গভর্ণর লর্ড আর্সকিন

সন্তরণপটু বাঙ্গালী বালিকা—

এ বৎসর নিখিল ভারতীয় মহিলাগণের সন্তরণ প্রতিযোগিতায় যে ত্রয়োদশবর্ষীয়া বাঙ্গালী বালিকাটি "অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নসিপ্" লাভ করিয়াছেন, তাঁহার নাম কুমারী বাণী ঘোষ। তিনি অতি অল্প বয়স হইতেই ছোরা ও লাঠি খেলা দেখাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিতেন এবং ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে প্রথম সন্তরণ প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। পর বৎসর হইতে তিনি মহিলাদের সকল সন্তরণ প্রতিযোগিতাতেই প্রথম স্থান অধিকার করিতেছেন এবং ইংরাজ ও এংলো-ইণ্ডিয়ান মহিলা সন্তরণকারিণীদিগকে অনায়াসে পরাজিত করিতেছেন। পুরুষ সন্তরণকারীদিগের সহিতও তিনি বহু প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণা হইয়াছেন এবং গঙ্গাবক্ষে সাত মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতায় ১৭জন বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষকে তিনি পশ্চাতে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। শুধু ক্রীড়া ক্ষেত্রে নহে, কুমারী বাণী বিদ্যালয়ের পরীক্ষা, সঙ্গীত, শিল্প, অভিনয় প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই অপূর্ব্ব সাফল্য দেখাইয়া বহু পুরস্কারাদি লাভ করিয়াছেন। জার্ম্মাণীর বার্লিনে আগামী বিশ্ব অলিম্পিক সন্তরণ প্রতিযোগিতায় যদি ভারতবর্ষ যোগদান করে, তবে কুমারী বাণীকেই ভারতের প্রতিনিধিরূপে তথায় গমন করিতে হইবে। তাঁহার পিতা খ্যাতনামা কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুত দেবেশচন্দ্র ঘোষ কলিকাতা আহিরীটোলার অধিকারী; তিনি নিজে তাঁহার কন্যাকে এই সকল ক্রীড়াদি শিক্ষা দান করিয়া থাকেন। আমরা আশা করি, এই বালিকার জীবন সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

কুমারী বাণী ঘোষ

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন—

নয়া দিল্লীতে এ বার প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের ত্রয়োদশ অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ

ঘোষ বিদ্যাভূষণ ইহার প্রধান সভাপতি ছিলেন। তিনি এই ক্রমোন্নতিশীল প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, সকলেই তাহার অনুমোদন করিবেন :—

"আজ প্রবাসী বাঙ্গালী সাহিত্যিক ও মাতৃভূমির সাহিত্য-সেবকদের পরস্পর মিলনের ক্ষেত্র হইয়াছে এই প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন। আশা করি, এই মিলনের ফলে বাঙ্গালী মাত্রের মধ্যে ঐক্য সংস্থাপিত হইবে এবং বাঙ্গালীর শক্তি সম্বন্ধে আত্মপ্রত্যয় বৃদ্ধি পাইবে। এই মিলনের অন্যতম উদ্দেশ্য—উপস্থিত প্রতিনিধিগণের সমবেত আলোচনায় বঙ্গ-সাহিত্যের, তথা বঙ্গভাষার, কার্য্য-সূচি ও কার্য্যপ্রণালী স্থির করিতে হইবে।"

তিনি বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধীয় বর্ত্তমান সমস্যাগুলির উল্লেখ করেন—(১) প্রাদেশিকতা—পূর্ব্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ এবং বাঙ্গালার বিভিন্ন জিলায় প্রচলিত বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার প্রয়োগ; (২) সাধু (অর্থাৎ লেখ্য) ও কথিত ভাষায় দ্বন্দ্ব; (৩) হিন্দী ও ইংরাজী ভাষার চাপ; (৪) মুসলমানের দাবী।

আজকাল যে সর্ব্ববিষয়ে বাঙ্গালাকে অবজ্ঞা করিবার চেষ্টায় হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করিবার চেষ্টা চলিতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সে সম্বন্ধে অমূল্য বাবু বলিয়াছেন :—

"এখন একটা প্রশ্ন উঠিয়াছে, ভারতের জন্য রাষ্ট্র-ভাষার প্রয়োজন, আর সেই রাষ্ট্রভাষা হইবার উপযোগিতা যখন একমাত্র হিন্দীরই রহিয়াছে, তখন তাহাই রাষ্ট্রভাষা হইবে না কেন? ইহা পক্ষপাতশূন্য বিচার নয়। ভারতে যদি কোন ভাষার রাষ্ট্রভাষা হওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে বঙ্গভাষার সহিত হিন্দীর তুলনা করিতে হইবে। * * হিন্দীর সাহায্যে সারা ভারত অনায়াসে পর্য্যটন করা যায় না। বিশেষতঃ বর্ত্তমান তথাকথিত হিন্দীতে আরবী, ফার্সীর শব্দসম্ভার এত বেশী এবং উত্তর ও মধ্য ভারতের বিভিন্ন স্থানের কথ্য ভাষার ভঙ্গী এত বহুমুখী যে, উত্তর ভারতের ভাষার সহিত ইহার যোগসূত্রের অবকাশ বঙ্গভাষা অপেক্ষা বহু অংশে অল্প। দক্ষিণ ভারতে তামিল, তুলু, মলয়লম, তেলুগু, কণ্নড় ও দক্ষিণী ভাষায় বাঙ্গালার বাক্‌ছন্দ, শব্দযোজন ভঙ্গী ও শব্দাবলী হিন্দী অপেক্ষা বহুগুণে উপযোগী। দক্ষিণ ভারতের লোকরা বাঙ্গালা বুঝিবে না; কিন্তু বুঝাইবার উপক্রম করিলে বাঙ্গালা যত সহজে বুঝিবে হিন্দী তত সহজে নহে।"

অভিভাষণের উপসংহারাংশে তিনি বলিয়াছেন :—

"আমরা চাই নূতন সংস্কৃতি। কিন্তু সেই সংস্কৃতির যোগ রাখিতে হইবে পুরাতন সনাতন ভারতের সংস্কৃতির সহিত। সংস্কৃতিই ছিল ভারতের অন্তরের বস্তু। অক্ষর-পরিচয়ে সাহিত্যজ্ঞান কোন দিন তাহার জ্ঞাপক ছিল না। এ দেশে বিদ্যা কোন দিন academic ব্যাপার বলিয়াও গৃহীত হয় নাই; দর্শনও কোন দিন বুদ্ধির পরিচয়-জ্ঞাপক মাত্র হয় নাই—ইহা ছিল ভারতবাসীদের প্রাণস্বরূপ। ধর্ম্ম ও দর্শন এ দেশে কোন কালে পৃথগ্‌ বস্তু বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। ভারতীয় ধর্ম্মের গোড়ার কথা হইয়াছে—সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্ব বস্তুর মধ্যে একটি অখণ্ড যোগ। সর্ব্ব বস্তু অখণ্ড পূর্ণের প্রকাশ মাত্র। সর্ব্ব বিদ্যাই ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। * * * ভারতের ধর্ম্ম বৈদিক ধারায় সুস্নাত হইয়া শত-পরীক্ষিত হইয়া আপনার ধারা অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। * * * ভারতের এই সংস্কৃতির সহিত বাঙ্গালার সম্বন্ধ কি তাহা আমাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। * * আমাদিগকে আত্মস্থ হইতে হইবে; নিজের ধাতু ও স্বরূপ চিনিতে হইবে; চিনিয়া বুঝিয়া কর্ত্তব্যে অগ্রসর হইতে হইবে। বৃহত্তর বঙ্গের সহিত—বৃহত্তর ভারতের সহিত যোগ রাখিয়া, অথচ নিজের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, আমাদের কায করিতে হইবে।"

স্থানাভাবে আমরা ভিন্ন ভিন্ন শাখার সভাপতিদিগের অভিভাষণের আলোচনা করিতে পারিলাম না।

কাশী সেবাশ্রমের নূতন গৃহ—

বাঁকুড়া জেলা নিবাসী শ্রীযুত রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে সম্প্রতি কাশীধামে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের যে "তিনকড়ি স্মৃতি লেবরেটরী" গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল, গত ১২ই ডিসেম্বর তাহার দ্বারোদ্‌ঘাটন উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। অখিল ভারত সন্ন্যাসী সঙ্ঘের সভাপতি ও কাশী দেবীমঠের মোহান্ত স্বামী রামানন্দ গিরি মহোদয়ের আহ্বানে যুক্তপ্রদেশের মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী সার জে, পি, শ্রীবাস্তব মহাশয় ঐ উৎসবে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন।

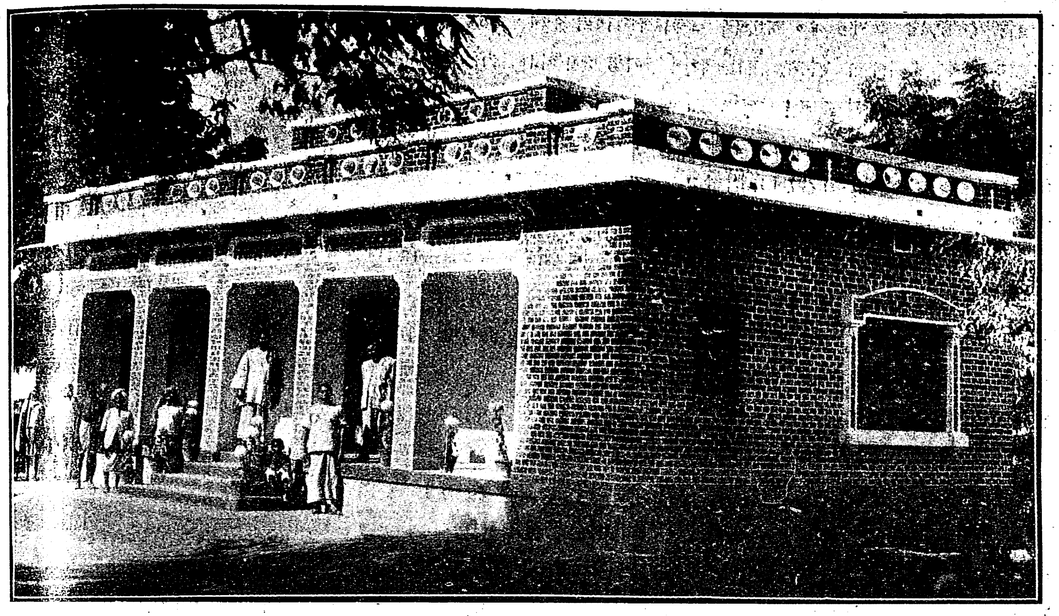

কাশী—রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, তিনকড়ি স্মৃতি লেবরেটারী

কাশীধামস্থ সেবাশ্রমটি সাধারণের বিশেষ উপকার করিয়া থাকে। বহু নিরাশ্রয় বাঙ্গালী পুরুষ ও নারী উক্ত সেবাশ্রমে আশ্রয় পাইয়া ধন্য হইয়া থাকেন। রাজেন্দ্রবাবুর এই দান চিরদিন লোক শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে; আরও আনন্দের বিষয় এই যে, রাজেন্দ্রবাবু নিজ ব্যয়ে সেবাশ্রমের মহিলা বিভাগের জন্য একটি স্বতন্ত্র পাক-গৃহও নির্ম্মাণ করাইয়া দিতেছেন। আমরা দাতার সৌভাগ্যপূর্ণ দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

শিক্ষা-সংস্কার—

অল্প দিনের মধ্যে ভারতবর্ষের নানা স্থানে নানা সভায় ও সম্মিলন প্রভৃতিতে শিক্ষা-সংস্কারের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। দেখা গিয়াছে, অধিকাংশ বক্তাই বর্ত্তমান বেকার-সমস্যা সম্মুখে রাখিয়া শিক্ষা-সংস্কারের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন এবং অনেকেই সেই সমস্যার সমাধানকল্পে কিরূপ সংস্কার প্রয়োজন সে সম্বন্ধে মত ব্যক্ত করিয়াছেন। পূর্ব্বে যেমন আমাদিগের দেশে ইংরাজ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত শিক্ষা চাকরীর ও ব্যবহারাজীবের ব্যবসা প্রভৃতি কতকগুলি ব্যবসাবলম্বনের সোপানরূপে কল্পিত হইয়াছিল, এখন সে শিক্ষাকে তেমনই বেকার-সমস্যার সমাধানোপায়রূপে কল্পনা করিবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু শিক্ষার প্রকৃত ও প্রধান উদ্দেশ্য কি—তাহা মনে না রাখিলে কোন সংস্কারই সফল হইবে না। বিশেষ এ দেশে বেকার-সমস্যা যে অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও বিস্তার ও প্রাবল্য লাভ করিয়াছে, তাহা ভুলিলে চলিবে না। এ দেশে শিক্ষা এখনও অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক না হওয়ায় দেশের অধিকাংশ লোক শিক্ষার আলোক পায় নাই—তাহাদিগের মধ্যেও যে বেকার-সমস্যা প্রবল হইয়াছে, তাহা কি বিশেষভাবে প্রতীকারযোগ্য নহে?

যাঁহারা বক্তৃতা করিয়াছেন—প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাও কি প্রকৃত অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করিয়া নিদানানুসারে বিধানের ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত? এই বাঙ্গালায়ই শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত বাঙ্গালী মন্ত্রী অল্প দিন পূর্ব্বে শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার জন্য যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, তিনি মনে করেন—তিনি যে সরকারের কর্ম্মচারী সে সরকারও, বোধ হয়, মনে করেন—মাসিক ১৫ টাকা বেতনেই উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যায়। কিন্তু মন্ত্রীর বেতন—মাসিক প্রায় ৫ হাজার ৪ শত টাকা; অর্থাৎ শিক্ষক (হয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার হিসাবে মন্ত্রীর সমকক্ষ হইয়াও)

তাঁহার বেতনের ৩ শত ৪০ অংশের একাংশ পাইয়া পরম সন্তোষ সহকারে শিক্ষা দানের দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারিবেন ও করিবেন! পৃথিবীর আর কোন দেশে মন্ত্রীর বেতন এই দরিদ্র দেশের মন্ত্রীর বেতনের মত অধিক নহে। তাহার কারণ, এ দেশে যাঁহারা মন্ত্রিত্ব লাভ করেন, তাঁহার দেশসেবার বা জনসেবার আগ্রহে তাহা করেন না—চাকরীতে অর্থার্জ্জনের জন্য করেন, বলা যায়। আর সেই জন্যই তাঁহারা বিজেতা শাসক-সম্প্রদায়ের চাকরীয়াদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট বেতনই অনায়াসে ও নির্লজ্জভাবে লইয়া থাকেন। বাস্তবিক যতদিন এ দেশে সরকারী চাকরীয়াদিগের বেতনের হার হ্রাস করা না হইবে, তত দিন—করভার বৃদ্ধি না করিয়া প্রাথমিক শিক্ষাও বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করা সম্ভব হইবে কি না, সন্দেহ।

তাহার পর বেকার-সমস্যার নানা কারণ বিবেচনা করিতে হয়। এ দেশের সেনাবলে, নৌসেনাবলে ও সেনাবলের বৈমানিক বিভাগে—যে বহু বিদেশী চাকরী পায় তাহাদিগের জন্য এ দেশের লোকের চাকরীর ক্ষেত্রের প্রসার সঙ্কুচিত হয়। কিন্তু বেকার-সমস্যা সমাধানের সর্ব্বপ্রধান উপায়—শিল্প সংস্থাপন। সে জন্য যে সব উপায় প্রয়োজন, সে সকলের মধ্যে মূলধন ও শিক্ষা-বিস্তার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাযেই বেকার-সমস্যা সমাধান যত সহজসাধ্য মনে হয়, তাহা নহে। যে শিক্ষার দ্বারা এই কার্য্যে সাহায্য হইবে, তাহা বর্ত্তমান পদ্ধতির শিক্ষা নহে; আর সে জন্য কারীগরী ও ব্যবসায়িক শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। সে জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তাহা সংগ্রহ করিতে হইবে।

য়ুরোপের নানা দেশ ও আমেরিকা বেকার-সমস্যার সমাধান কল্পে যে বিরাট আয়োজন করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। আর এ দেশে সে সম্বন্ধে কিছুই হয় নাই। সংপ্রতি—বিলাতে পার্লামেণ্টে নূতন সদস্য নির্ব্বাচনকালে ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী মিষ্টার লয়েড জর্জ্জ দেখাইয়াছিলেন—জার্ম্মাণ যুদ্ধের অবসান হইতে এ পর্য্যন্ত বিলাতের সরকার বেকারদিগকে সাহায্য দানে ১,৫০,০০০ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন! আর এ দেশের সরকার? সুতরাং বেকার-সমস্যার সমাধান কেবল শিক্ষার পদ্ধতি-পরিবর্ত্তন দ্বারা হইতে পারে না। সে জন্য আরও অনেক উপায় অবলম্বন করিতেই হইবে। সে জন্য আবশ্যক অর্থ-ব্যয়ও করিতে হইবে। হয়ত সে জন্য শাসন-পদ্ধতিরও পরিবর্ত্তন করা অবশ্যম্ভাবী হইবে।

আমরা আজকাল এ দিকে বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির নানা ত্রুটির কথা শুনিতে পাই, তাহার পরিবর্ত্তন-প্রয়োজন আলোচিত হইতে দেখি—আর এক দিকে বেকার-সমস্যার জন্য আংশিকরূপে দায়ী সেই শিক্ষা-পদ্ধতিই বালকদিগের মত বালিকাদিগেরও মধ্যে প্রবর্ত্তিত করি! সেদিন মহীশূর রাজ্যে যুবরাজ এ সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন—স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও যে বেকার-সমস্যা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহার কারণ—পুরুষরা যেমন সরকারী চাকরী লাভের জন্য শিক্ষালাভ করে, স্ত্রীলোকরাও আজকাল তাহাই করিতেছে। যখন পুরুষরাই আর চাকরী পাইতেছে না, তখন স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে চাকরীলাভ কি আর কষ্টসাধ্য নহে? তিনি বলিয়াছেন—গৃহই স্ত্রীলোকের কার্য্যের কেন্দ্র থাকিবে এবং এখন সংসারের কার্য্যে নানা বিষয়ে শিক্ষা-লাভের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত ও স্বীকৃত হইয়াছে। খাদ্যদ্রব্যের গুণ, সন্তান পালনের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি এখন সংসারের কার্য্যের সহায়রূপে শিক্ষা করিতে হয়। সেই জন্য তিনি বলেন—বিদ্যালয়ে ছাত্রীদিগকে সাংসারিক নানা বিষয়ে শিক্ষাদান করা প্রয়োজন।

যে মনোবৃত্তি লইয়া বর্ত্তমানে স্ত্রীলোকরা সর্ব্ববিষয়ে পুরুষের তুল্যাধিকার লাভের আগ্রহে পুরুষের সঙ্গে একই শিক্ষায় শিক্ষিতা হইতে চাহিতেছেন, তাহার নিন্দা সেদিন বরোদার পাইকবাড় করিয়াছেন। স্ত্রীলোকদিগকে স্বাধীনতা-প্রদানের পক্ষপাতী হইয়াও তিনি বলিয়াছেন, সে স্বাধীনতার স্বরূপ বিচার করিতে হইবে। যে স্বাধীনতায় স্ত্রীলোকের বৈশিষ্ট্য নষ্ট বা লুপ্ত হয়, সে স্বাধীনতা কখনই সমাদরের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

শিক্ষা-সংস্কারের বিষয় আলোচনা করিতে হইলে, এই সব বিষয় অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করিলে চলিতে পারে না।

তাহার পর ধর্ম্মের কথা। ইংরাজ এ দেশে যে শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহাকে ধর্ম্মের সহিত সম্পর্কশূন্য করিয়াই তাঁহারা সে জন্য গর্ব্বানুভব করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন—মনীষী ভল্‌টেয়ার অভিজ্ঞতার ফলে শেষে লিখিয়াছিলেন, যদি ঈশ্বর অসিদ্ধই হয়েন, তবে

সংসার শৃঙ্খলাসম্পন্ন রাখিতে হইলে স্বর্গ ও নরকের মত ঈশ্বরের কল্পনাকেও দৃঢ় করিতে হইবে; নহিলে বিশৃঙ্খলার বিকাশ অনিবার্য্য। সেদিন শ্রীযুক্ত চিরভুরী যজ্ঞেশ্বর চিন্তামণি মহীশূরে বক্তৃতায় বলিয়াছেন, পূর্ব্বে তিনি শিক্ষাকে ধর্ম্ম হইতে পৃথক রাখিবার পক্ষপাতী ছিলেন বটে, কিন্তু অভিজ্ঞতাফলে তিনি সে মত পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। কারণ, এখন আর গৃহে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করা হয় না। সুতরাং, এখন বিদ্যালয়েই তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সকল ধর্ম্মের মূলগত ঐক্য বিবেচনা করিলে—ধর্ম্মমত যে নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা স্মরণ করিলে—ভারতবর্ষে নানা ধর্ম্মমত প্রচলিত বলিয়া বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান অসম্ভব—ইহা আর বলা যায় না। বলা বাহুল্য, এ বিষয়ে অভিভাবকদিগেরও বিশেষ কর্ত্তব্য আছে এবং তাঁহারা যদি সে কর্ত্তব্য অবহেলা করেন, তবে তাঁহাদিগের ত্রুটিতেই সমাজে শৃঙ্খলা বিশেষ প্রবল হইবে। যাঁহারা শিক্ষা-সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কয় জন এ বিষয়ে মনোযোগ দেন?

আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহাতেই বুঝা যাইবে, এ দেশে শিক্ষা-সংস্কারের বিশেষ প্রয়োজন আছে। শত বর্ষ ধরিয়া ইংরাজ-প্রবর্ত্তিত যে শিক্ষা এ দেশে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, তাহার নানা ত্রুটি আজ লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছে। তাহা যে প্রবর্ত্তনকালেও আমাদিগের সমাজের সহিত সামঞ্জস্যসম্পন্ন এবং দেশের অবস্থার উপযোগী ছিল না, তাহা যেমন বুঝিতে পারা গিয়াছে, তাহা যে পৃথিবীর মানবসমাজের পরিবর্ত্তনের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে আপনার পরিবর্ত্তন সাধন করে নাই, তাহাও তেমনই অনুভূত হইতেছে। শত বর্ষেও যে দেশে অজ্ঞতার অন্ধকার দূর হয় নাই, ইহা ও লজ্জার ও ক্ষোভের বিষয় সন্দেহ নাই।

কিন্তু আজ চারিদিকে শিক্ষা-সংস্কার সম্বন্ধে যে কলরব উত্থিত হইয়াছে, তাহার উগ্রতায় ও ব্যগ্রতায় চঞ্চল ও ব্যস্ত হইয়া আমরা যেন প্রকৃত পথভ্রষ্ট না হই; আবার ভুল না করি। যে শিক্ষা-পদ্ধতির ফলে জাতির আদর্শ-পরিবর্ত্তনে অনেক দুঃখের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা আমাদিগের সংস্কৃতির ধাতুগত নহে—সেই পদ্ধতির পরিবর্ত্তন সাধিত করিয়া আমরা যেন আবার আমাদিগের অনুপযোগী পদ্ধতির প্রবর্ত্তন না করি।

এ বিষয়ে একটি কথা আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে স্মরণ করিতে হইবে—কোন্ শিক্ষা-পদ্ধতি দেশকালপাত্রোপযোগী হইবে, তাহা স্থির করা ব্যবহারাজীব মন্ত্রীর বা সিভিলিয়ান সেক্রেটারীর পক্ষে দুঃসাধ্য—সে জন্য বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন। দেশের অবস্থা, সমাজের প্রকৃতি, অর্থনীতির ও পৃথিবীর সভ্যদেশসমূহের অভিজ্ঞতা—এই সকল উপকরণ লইয়া বিশেষজ্ঞগণকে কায করিতে হইবে। তাহা হইলেই তাঁহাদিগের পক্ষে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব হইবে।

মানপত্র—

গত ৩রা পৌষ কলিকাতায় দর্শন সমিতির রজত-জয়ন্তী অনুষ্ঠানের সময় আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের ত্রিসপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করা হইয়াছিল।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আচার্য্য শীলকে অভিনন্দন করিয়া নিম্নলিখিত কবিতাটি প্রেরণ করিয়াছিলেন—

আচার্য্য শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, সুহৃদ্বরেষু—

জ্ঞানের দুর্গম ঊর্দ্ধে উঠেছ সমুচ্চ মহিমায়
যাত্রী তুমি, যেথা প্রসারিত তব দৃষ্টির সীমায়
সাধনা-শিখর-শ্রেণী; যেথায় গহন গুহা হোতে
সমুদ্র বাহিনী বার্ত্তা চলেছে প্রান্তর ভেদী স্রোতে
নব নব তীর্থ সৃষ্টি করি' যেথা মায়া কুহেলিকা
ভেদি' উঠে মুক্তদৃষ্টি তুঙ্গশৃঙ্গ, পড়ে তাহা লিখা
প্রভাতের তামাক্ষরে লিপি, যেথায় নক্ষত্রলোকে
দেখা দেয় মহাকাল আবর্ত্তিয়া আলোকে আলোকে
বহ্নি মণ্ডলের জপমালা, যেথায় উদয়াচলে
আদিত্যবরণ যিনি, মর্ত্তধরণীর দিগঞ্চলে
অনাবৃত করি দেন অমর্ত্ত্য রাজ্যের জাগরণ,
তপস্বীর কণ্ঠে কণ্ঠে উচ্ছ্বসিয়া—শোন বিশ্বজন,
শুভ্র অমৃতের পুত্র, হেরিলাম মহান্ত পুরুষ—
তমিস্রের পার হোতে তেজোময়, যেথায় মানুষ—
শুনে দেববাণী। সহসা পায় সে দৃষ্টি দীপ্তিমান,
দিক্ সীমা প্রান্তে পায় অসীমের নূতন সন্ধান।
বরেণ্য অতিথি তুমি বিশ্ব মাঝারের তপোবনে
সত্য-দ্রষ্টা, যেথা যুগ যুগান্তরে ধ্যানের গগনে

গূঢ় হতে উদ্ধারিত জ্যোতিষ্কের সম্মিলন ঘটে,
যেথায় অঙ্কিত হয় বর্ণে বর্ণে কল্পনার পটে—
নিত্য সুন্দরের আমন্ত্রণ! সেথাকার শুভ্র আলো
বরমাল্য রূপে তব সমুদার ললাটে বুলালো
বাণীর দক্ষিণ পাণি।
মোরে তুমি মানো বন্ধু বলি'
আমি কবি আনিলাম ভরি মোর ছন্দের অঞ্জলি
স্বদেশের আশীর্ব্বাদ, বিদায় কালের অর্ঘ্য মোর
বাহুতে বাঁধিনু তব সপ্রেম শ্রদ্ধার রাখীডোর।

ভারতবর্ষের যে দার্শনিকের নামের খ্যাতি সমগ্র সভ্যজগতে ব্যাপ্ত হইয়াছে তিনি তাঁহার জীবনের সায়াহ্নে—হয়ত তাঁহার পক্ষে সভায় শেষ উপস্থিতিতে—যাহা বলিয়াছেন, আশা করি, তাঁহার স্বদেশবাসী সকলেই তাহা শ্রদ্ধা সহকারে বিবেচনা করিয়া উপকৃত হইবেন। তিনি বলিয়াছেন—জীবনের সায়াহ্নে এক চিন্তা তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি পীড়িত করিতেছে—একই দেশ-মাতৃকার সন্তান হিসাবে যাঁহাদিগের মধ্যে সৌভ্রাত্র ও সৌহার্দ্দ্য বন্ধনে বদ্ধ হওয়াই কর্ত্তব্য, আজ দেশে তাঁহারাই দ্বন্দ্বে রত। আমাদিগের স্মরণ রাখা প্রয়োজন, ভারতবাসী হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান—যে ধর্ম্মমতাবলম্বীই কেন হউন না, দান প্রতিদানের মনোবৃত্তির দ্বারাই আপনাদিগের সমৃদ্ধ রত্নভাণ্ডার হইতে অপরকে দান এবং সদিচ্ছা ও বন্ধুত্বের সহিত অপরের দান গ্রহণ করিয়াই নিজ নিজ ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতম অনুশাসনের অনুসরণ করিতে পারেন। যাহা সাম্প্রদায়িক ও শ্রেণীগত তাহাই অক্ষত জাতীয়তাবোধের নিকট বিসর্জ্জন দিতে হইবে এবং দেশাত্মবোধ বিশ্ব-মানবের ভ্রাতৃত্ববোধে পরিপূর্ণতা লাভ করিবে।

ভারতবর্ষের এই পুণ্যভূমি আর্য্য, অনার্য্য, সেমিটিক ও ইরাণীয় সভ্যতার মিলনক্ষেত্র। এই দেশে আজ যে সাম্প্রদায়িকতা জাতীয়তার স্থান অধিকারের দুরাশায় জাতির স্বার্থনাশে সমুদ্যত হইয়াছে, ইহা একান্তই পরিতাপের বিষয়। আরও পরিতাপের বিষয় এই যে, যত দিন যাইতেছে, তত সাম্প্রদায়িকতার বহ্নি নির্ব্বাপিত না হইয়া যেন বৃদ্ধি পাইতেছে। সকলের—বিশেষ সকল সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের সমবেত চেষ্টা ব্যতীত এই অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন সম্ভব হইবে না।

গুণনাথ সেন—

গত ১৯শে ডিসেম্বর কলিকাতায় প্রবীণ চিকিৎসক গুণনাথ সেন পরলোকগত হইয়াছেন। ঢাকা (বিক্রমপুর) সোণারংগ্রামে ৮১ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার জন্ম হয়। চিকিৎসা বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া ইতি নানা স্থানে এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জেনের কায করিয়া শেষে দ্বাদশবর্ষ উত্তরপাড়ায় হাসপাতালের

গুণনাথ সেন

প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। তথায় তিনি জনপ্রিয় হয়েন। তিনি শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মেডিক্যাল অফিসারের কায়ও ১০ বৎসর সম্পন্ন করিয়া কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি মৃত্যুকালে ৭ পুত্র, ৬ কন্যা ও বহু পৌত্রাদি রাখিয়া গিয়াছেন।

—

প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ—

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ পদ ত পরের কথা; অধ্যাপকের পদও পূর্ব্বে বহু ভারতবাসীর পক্ষে অনধিগম্য ছিল। সুখের বিষয় এখন সেই অসঙ্গত ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সংপ্রতি এই কলেজের অধ্যক্ষ মিষ্টার বি, এম, সেন অসুস্থ হইয়া ছুটী লওয়ায় আমাদিগের পরম স্নেহভাজন শ্রীমান প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ তাঁহার স্থানে কায

মিঃ বি, এম, সেন

মিঃ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

করিয়াছেন। প্রশান্তচন্দ্রের জ্যেষ্ঠতাত অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র বহুদিন এই কলেজে কৃতিত্বের সহিত অধ্যাপকের কায করিয়া এখন অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। প্রশান্তচন্দ্র কলিকাতায় আবহ গবেষণাগারের ভার লইয়া কিছু দিন সে কার্য্যও প্রশংসার সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন।

—

লর্ড রেডিং—

ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড রেডিংএর মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৫ বৎসর হইয়াছিল। তিনি বিলাতে ব্যবহারাজীব ও রাজনীতিকরূপে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ইহুদী প্রকৃতি তাঁহাকে অর্থার্জ্জনে কত আগ্রহশীল করিয়াছিল তাহা "মার্কোণী মামলায়" দেখা গিয়াছিল। তাঁহার পূর্ব্বে কোন ইহুদী বিলাতে মন্ত্রীর পদ লাভ করেন নাই। জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় তিনি আমেরিকায় যাইয়া বিলাতের বিশেষ সুবিধাজনক ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছিলেন।

ভারত-সচিব মিষ্টার মণ্টেগু স্বয়ং ইহুদী ছিলেন এবং বোধ হয়, সেই জন্য আশা করিয়াছিলেন, প্রাচীর ইহুদী জাতির লোককে ভারতের বড়লাট নিযুক্ত করিলে ভারতবাসী তাহাদিগের আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিশীল শাসক লাভ করিবে। কিন্তু বিলাতে তিনি ন্যায়-বিচারের ভক্ত থাকিলেও লর্ড রেডিং এদেশে, কর্ম্মকালে, আইনের স্থানে অর্ডিনান্স প্রবর্ত্তনে কিছুমাত্র দ্বিধা বা সঙ্কোচ-বোধ করেন নাই। তিনি সংবাদপত্র সম্বন্ধীয় অর্ডিনান্স জারি করেন, ব্যবস্থা-পরিষদ কর্ত্তৃক ত্যক্ত রাজদ্রোহ-রক্ষা-আইন প্রভৃতি কয়খানি আইন বড়লাটের অতিরিক্ত ক্ষমতা-বলে বিধিবদ্ধ করেন এবং রাজনীতিকদিগের প্রতিবাদ দলিত করিবার জন্য সংশোধিত ফৌজদারী আইনের প্রয়োগে বিশেষ উৎসাহ দেখান। এদেশে আসিয়া তিনি বলিয়াছিলেন বটে, কালা-ধলা-ঘটিত মামলায় এদেশে বিচার-বিভ্রাট ঘটে—লোকের এই বিশ্বাসের বিষয় তিনি অবগত আছেন এবং তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিবেন; কিন্তু তাঁহারই শাসনকালে একাধিক মামলার বিচারফলে লোকের মনে সেই বিশ্বাস দৃঢ় হয়।

বড়লাট হইয়া আসিয়া প্রথমে তিনি সংবাদপত্র বিষয়ক

আইন প্রভৃতি কয়েকখানি চণ্ডনীতি-দ্যোতক আইন বর্জ্জনে ব্যবস্থা-পরিষদের নির্দ্ধারণে আপত্তি করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী কার্য্য সে মনোভাবের পরিচয় প্রদান করিতে পারে নাই। এদেশে দায়িত্বশীল শাসন প্রবর্ত্তনের যে প্রতিশ্রুতি বিলাতের সরকার ভারতে ইংরাজ শাসনের উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তিনি তাহার কার্য্য অগ্রসর করিবার কোন চেষ্টাই করেন নাই। যদিও তিনি কিছু দূর পর্য্যন্ত লর্ড মর্লির নীতি অনুসরণ করিয়া মডারেট-দিগের সহযোগ লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পর হইতেও তিনি আপনার কার্য্য দ্বারা বুঝাইয়াছেন, তিনি স্বেচ্ছায় কায করিবেন—কাহারও পরামর্শে চালিত হইবেন না। বহু মডারেট নেতা যখন পরামর্শ দেন, বড়লাট গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাজনীতিক বিক্ষোভের সমস্যা সমাধান করুন, তিনি তখন স্পষ্ট বুঝাইয়া দেন অসহযোগীরা আইন অমান্য বন্ধ না করিলে তিনি কিছুই করিবেন না। তাহার পর গান্ধীজীর প্রভাব সময়ের সঙ্গে ও মডারেট প্রভৃতির চেষ্টায় ক্ষুণ্ণ হইলেই তিনি —অবসর বুঝিয়া—গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের ও আদালতে বিচারের ব্যবস্থা করেন। গান্ধীজী কারাগারে আটক হওয়ার পর হইতে মডারেট বন্ধুদিগের প্রতি বড়লাট ব্যবহার-পরিবর্ত্তনের প্রমাণ দেন—এমন কি সার ম্যালকম হেলী যে হাস্যোদ্দীপক মত প্রকাশ করেন—ভারতের পক্ষে বিলাতের পার্লামেণ্ট-প্রতিশ্রুত দায়িত্বশীল শাসন ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন নহে—তাহাও বড়লাটের সম্মতি-অনুসারে বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে।

গোলটেবিল বৈঠকে তিনি ভারতে রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠনের প্রস্তাবের সমর্থন করেন এবং রাজওয়াড়া ভারতকে সঙ্ঘে স্থান দান করিয়া ভারতবাসীর প্রকৃত স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার লাভে বিলম্ব ঘটাইবার ব্যবস্থাই তাঁহার মনোমত ছিল।

ভারতবাসীর রাজনীতিক অধিকার বৃদ্ধির দিক হইতে দেখিলে তাঁহার শাসনকালে উন্নতির কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মিলন—

গত ১৩ই, ১৪ই ও ১৫ই পৌষ কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট গৃহে নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মিলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে এলবার্ট হলে যে নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতা হয় তাহাতে প্রায় ৬ শত ছাত্রছাত্রী যোগ দিয়াছিলেন। সভায় সঙ্গীতানুরাগী দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ও নাড়াজোলের কুমার বিজয়কৃষ্ণ খানের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয় এবং একাধিক বক্তা মত প্রকাশ করেন যে, সঙ্গীতকে সাধারণ শিক্ষার বিষয় করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাহা শিক্ষার বিষয়-তালিকাভুক্ত করুন। বাঙ্গালার ও ভারতের অন্যান্য স্থান হইতে আগত বহুগুণী সঙ্গীতালাপে কয়দিন লোককে আনন্দ দান করিয়াছিলেন।

উপাধি প্রাপ্তি—

এবার ইংরাজী নববর্ষে যাঁহারা নূতন উপাধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে বাঙ্গালায় সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, নবাব সার কে, জি, এম্, ফরুকী, মহারাজা সার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী ও সার জ্যোৎস্না ঘোষালের নাম যেমন উল্লেখযোগ্য—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রীর শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় উপাধি লাভও তেমনই। সার নৃপেন্দ্রনাথ নবাব সাহেব ও মহারাজা মন্মথনাথ পূর্ব্বেও উপাধিভূষিত ছিলেন—সুতরাং তাঁহাদিগের উপাধিলাভ উচ্চতর সরকারী সম্মান লাভ। সার জ্যোৎস্না ঘোষাল বোম্বাই প্রদেশে সিভিলিয়ান ছিলেন, বর্ত্তমানে রাষ্ট্রীয় পরিষদের মনোনীত সদস্য ও সরকারের "হুইপ।" এবার সরকার সরকারী চাকরীয়াদিগকে যেরূপ উদারভাবে উপাধি দান করিয়াছেন, নানা বিভাগে বে-সরকারী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে তাহা করেন নাই।

লিলুয়ায় সঙ্গীত প্রতিযোগিতা—

আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে হাওড়া লিলুয়ায় ই, আই, রেল ইণ্ডিয়ান ইনিষ্টিউটের দ্বিতীয় বার্ষিক সঙ্গীত প্রতিযোগিতা হইবে। কণ্ঠসঙ্গীত বিভাগে ধ্রুপদ, খেয়াল ঠুংরী ও টপ্পা—উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গীত, ও কীর্ত্তন—যন্ত্র সঙ্গীত বিভাগে এস্‌রাজ, সেতার, সুরবাহার, সেহালা ও তবলা সঙ্গত প্রতিযোগিবৃন্দের বয়সানুপাতে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রতিযোগিতার আয়োজন ও ব্যবস্থা হইয়াছে। উক্ত ইনিষ্টিটিউটের সঙ্গীত প্রতিযোগিতা সেক্রেটারীর নিকট পাঁচ পয়সার টিকিট সহ আবেদন করিলে বিস্তৃত বিবরণ জানা যাইবে।

নরেন্দ্রনাথ বসু

কলিকাতার ও বাঙ্গালার বিখ্যাত ধাত্রীবিদ্যাবিদ্ ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ বসু অকালে পরলোকগত হইয়াছেন। সচরাচর দৃষ্ট হয় না। তিনি ডাক্তার হিসাবে সর্ব্বদাই লোককে সাহায্য দিতে আগ্রহসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার বৃদ্ধা মাতা, বিধবা ও একমাত্র সন্তান—কন্যাকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা আমাদিগের নাই—তাঁহাদিগের শোক ও সান্ত্বনার

ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ বসু

স্থানান্তরে তাঁহার পরিচয়-প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। নরেন্দ্র অতীত। নরেন্দ্রবাবুর মৃত্যুতে আমরা স্বজনবিয়োগবেদনা বাবুর মত মধুর-স্বভাব, উদার-হৃদয় ও বন্ধুবৎসল লোক অনুভব করিতেছি।

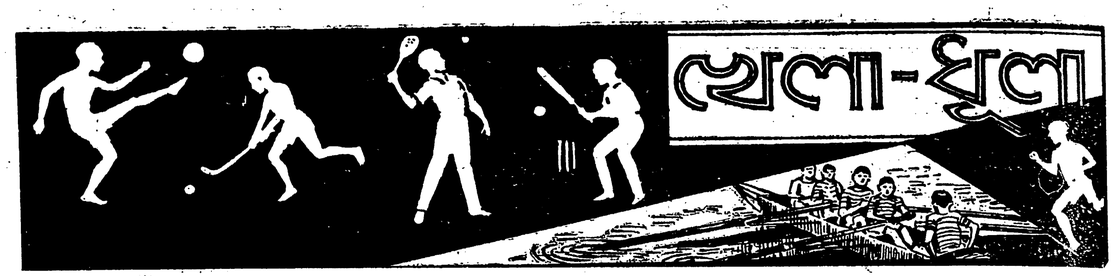

অষ্ট্রেলিয়া বনাম ভারত ঃ

দ্বিতীয় টেষ্ট—

অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতের চারদিনের দ্বিতীয় (unofficial) টেষ্ট খেলা গত ৩১শে ডিসেম্বর ও ১লা জানুয়ারী তারিখে মাত্র দু'দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। ৩০শে ডিসেম্বরে হঠাৎ বারিপাতের ফলে মাঠ খারাপ হয়। রাইডার টসে জিতে ভারতীয় দলকে ব্যাট করতে পাঠালেন। ভিজা বিশ্বাসঘাতক মাঠের সুবিধা পেয়ে ম্যাকার্টনে ও অক্সেনহামে মিলে ভারতীয়দের অবস্থা শোচনীয় করে তুললে। ম্যাকার্টনের চতুরতাপূর্ণ বলের অলস মন্থরগতি ভারতীয় ব্যাটস্‌ম্যানদের ভীতিপ্রদ হয়ে উঠলো। কেহ বা প্রলোভনে পড়ে এগিয়ে পিটতে গিয়ে ষ্টাম্পড হলেন, কেহ বা ক্যাচ তুলে কারু হাতে আটকালেন। লাঞ্চের আগেই মোট ৪৮ রানে সব ক'টা উইকেট পড়ে গেলো। ওয়াজির আলির ২০ রানই সর্ব্বোচ্চ হয়ে রইল, পাঁচজন শূন্য করেই গেলেন।

জে এস রাইডার
(ক্যাপ্‌টেন—অষ্ট্রেলিয়া)
ছবি—ভক্তকুমার

অষ্ট্রেলিয়ারাও ঐ ভিজা মাঠে বিশেষ রান তুলতে পারলে না। তাদের প্রথম ইনিংসও সেই দিনেই বেলা শেষ হবার আগেই মোট ৯৯ রানে শেষ হয়ে গেলো। ঐদিন বোলারদের দিন হ'লো। নিশার ও বাকাজিলানির বলে অষ্ট্রেলিয়ার সুদক্ষ ব্যাটস্‌ম্যানরাও আউট হতে লাগলো। বাকার বলে রাইডার ক্যাচ তুললে সি কে নাইডু পড়ে গিয়েও এক হাতে ক্যাচ ধরলে, দর্শকরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লো। আবার ৮৩ রানের মাথায় ম্যাকার্টনে বাকার বলে ক্যাচ তুললে সি এস নাইডু তাকে সুন্দর ভাবে লুফ্‌লে জনতার উল্লাস চরমে উঠ্‌লো। ওয়েণ্ডেল বিলের ২৯ রানই সর্ব্বোচ্চ ; বিখ্যাত ব্যাটস্‌ম্যান 'গভর্ণর জেনারেল' ম্যাকার্টনেও ১১ রানের বেশী তুলতে পারলেন না।

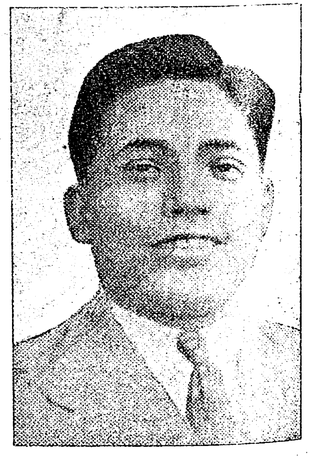

অমরনাথ

এস ব্যানার্জ্জি

পরের দিন মাঠের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল কিন্তু ভারতীয়দের খেলার অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হলো না। ওয়াজির আলি দুই করে আউট হলেন। অমরনাথ ৩ করে লেদারের বলে আহত হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন। ক্যাপ্‌টেন নাইডু এসে অতি সতর্কতার সঙ্গে খেলতে লাগলেন। রান মোটেই উঠলো না। নাইডু মাত্র ৫ করে এবারও আউট হয়ে গেলেন। পাতিয়ালার যুবরাজ এসে খেলার মোড় ফেরালেন। যুবরাজ ৫৮ মিনিটে ৩২ রান তার মধ্যে ৫ বার বাউণ্ডারী করেছেন।

অমরনাথ হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে যুবরাজ পাতিয়ালার সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। সাহাবুদ্দিন এলেন। সাহাবুদ্দিনের উইকেট রাখতে অমরনাথকে প্রাণপণ করে খেলতে হচ্ছে।

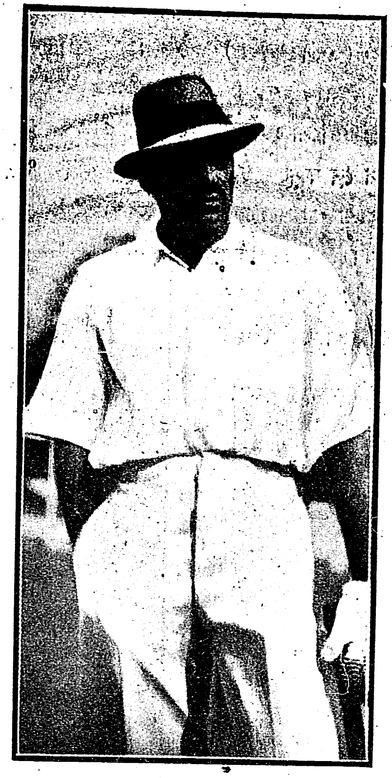

সি কে নাইডু
(ক্যাপটেন—ভারতবর্ষ)
ছবি—ভক্তকুমার

অনেক রান ছেড়ে দিতেও হচ্ছে, আবার একটা রান করতে রান-আউটের বিপদ নিতে হচ্ছিল। দর্শকদের উত্তেজনার সীমা নেই, হার খেলায় প্রাণ এসেছে। অমরনাথের খেলা দেখে সকলে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। অমরনাথ কিছুতে ম্যাকার্টনের বলের মুখে সাহাবুদ্দিনকে যেতে দিচ্ছে না, নিজে ম্যাকার্টনের বল পেটাতে লাগলো। সর্ব্বোচ্চ ৩৯ রান করে ১২৭ রানের মাথায় লেদাবের বলে দুর্ভাগ্যবশতঃ অমরনাথ বোলড হয়ে গেলো, সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়দের সকল আশা ফুরালো। নিসার এলো ও শূন্যতে গেলো।

অষ্ট্রেলিয়াদের দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ হলো। মাত্র ৭৭ রান করলেই তারা জয়ী হবে। ওয়েণ্ডেলবিল ও ব্রায়াণ্ট খুব সতর্কতার সঙ্গে খেলা সুরু করলে, যাতে না একটা ও উইকেট খোয়া যায়। কিন্তু ৪৬ রানে ব্রায়াণ্ট ও ৫৫ রানে মরিসবীর উইকেট গেলো। রাইডার এসে

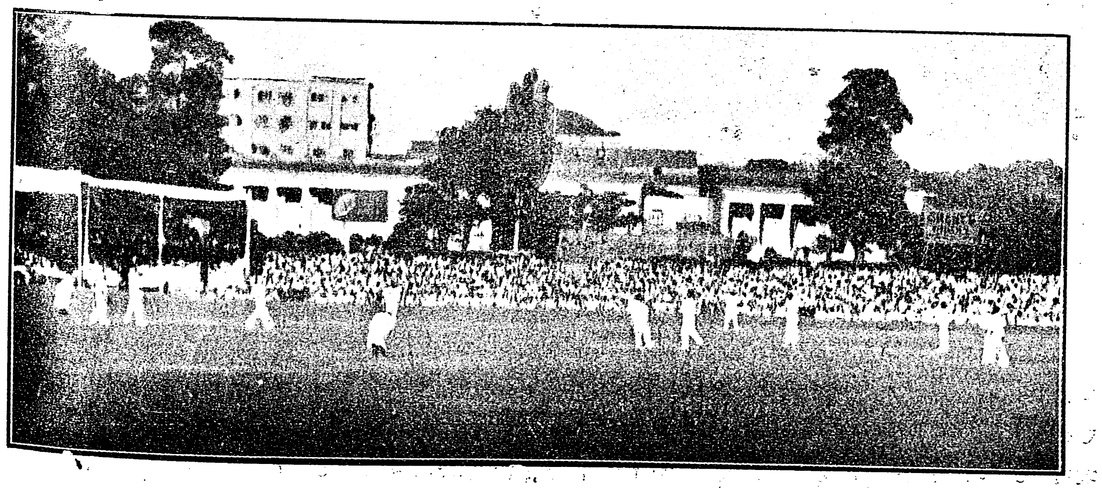

ইডেন গার্ডেনের ক্রিকেট খেলার মাঠের দৃশ্য। অষ্ট্রেলিয়ারা ব্যাট করছে ছবি—ভক্তকুমার

যোগ দিলেন। মোট রান হলো ৮০, দুই উইকেট গেছে। অষ্ট্রেলিয়ারা ৮ উইকেটে দ্বিতীয় টেষ্ট (বেসরকারী) খেলায় জয়ী হলো। চারদিনের খেলা দু'দিনেই সাঙ্গ হলো।

আজিজের উইকেট কিপিং একেবারে ভালো হয়নি। 'বাই' অনেক হয়েছে; কয়েকটি সহজ ষ্টাম্প সে ফস্‌কেছে। খেলোয়াড় নির্ব্বাচন ভালো হয়নি। মহম্মদ হোসেনের নির্ব্বাচন অনুমোদন করা যায় না। সাহাবুদ্দিন এলাহাবাদের খেলায় কয়েকটি উইকেট পেয়েছিলেন বলেই বোধ হয় স্থান পেয়েছেন, কিন্তু এখানে কিছুই

ওয়াজির আলি ও মুস্তাক আলি ব্যাট করতে যাচ্ছেন ছবি—ভক্তকুমার

করতে পারেন নি। ব্যাটিংএ এম এম নাইডু অষ্ট্রেলিয়াদের বিপক্ষে শতাধিক রান করেছিলেন, তথাপি তাঁকে মনোনীত করা হয় নি। জয় অবশ্য মনোনীত হয়েছিলেন কিন্তু আসতে পারেন নি। ওয়াজির আলিকে এখন প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলা থেকে বাদ দেওয়াই উচিত। সি কে নাইডুর সেদিন আর নেই। নির্ব্বাচনের দিকে উচিত দৃষ্টি না দিলে খেলার ফল উন্নত হবে না। এম সি সির বিরুদ্ধে ভারতীয়রা যেটুকু কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছিল, দু'বছর পরে উন্নতি করা দূরে থাক্, অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে তার চেয়ে তারা খারাপই ফল দেখাচ্ছে।

ওয়েণ্ডেল বিল ও ব্রায়াণ্ট ব্যাট করতে যাচ্ছেন ছবি—ভক্তকুমার

ভারতে চারটি টেষ্ট খেলার দু'টিতেই ভারতীয়রা অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে হারলে। বাকী দুটিতে ফল যাতে ভাল হয় সে জন্যে নির্ব্বাচনের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া নির্ব্বাচন কমিটির কর্ত্তব্য।

ভারতীয়দলের খেলার ষ্টাণ্ডার্ড যদি এই হয় তবে

এ বছরে তারা ইংলণ্ডে টেষ্ট খেলতে গেলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা ভাবতেও মনে ভয় হয়। বাঙ্গলা ও আসাম যেটুকু কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছিল সমগ্র ভারত তাও দেখাতে পারলে না। অষ্ট্রেলিয়াদের একজন ছাড়া বাঙ্গলার সঙ্গে যে খেলোয়াড়রা খেলেছিল তারাই ভারতীয়দের সঙ্গে খেলেছে।

লাহোরে যে তৃতীয় টেষ্ট খেলা হবে তার খেলোয়াড় মনোনয়ন হয়ে গেছে। তালিকা দেখে আমরা নিরাশই হয়েছি। লেফ্‌টেনেণ্ট ওয়াজির আলি ক্যাপ্‌টেন হয়েছেন। মেজর সি কে নাইডু খেলতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন।

সি কে নাইডু ভারতীয় দলসহ ফিল্ড করতে মাঠে নামছেন ছবি—ভক্তকুমার

অমর সিং অসুস্থতার অজুহাতে খেলছেন না। অতদূর থেকে কলিকাতায় এসে চিকিৎসকরা খেলবার উপযুক্ত বলে ঘোষণা করলেও তাঁর অসুস্থতা ঘুচলো না, বসে বসে দেখলেন কেমন করে ভারতীয়রা হারে। অমরনাথ সম্ভবতঃ আঘাতের জন্য খেলতে পারবেন না। ওয়াজির আলি ভাগ্যবান পুরুষ। দেখা যাক, তাঁর অধিনায়কত্বে ভারতীয় দল খেলায় অধিকতর উৎকর্ষতা দেখাতে পারেন কি না। এপর্য্যন্ত ওয়াজির আলি খেলোয়াড় হিসাবে অষ্ট্রেলিয়ানদের বিপক্ষে কোন খেলাতেই উল্লেখযোগ্য রান করতে পারেন নি। অধিনায়ক হিসাবে তাঁর যোগ্যতা দেখবার জন্য আমরা উৎসুক রইলাম। মেহেরমজী জামনগরে দক্ষতার সঙ্গে উইকেট রক্ষা করেছিলেন। দেখা যাক, তিনি এবার ঐ বিষয়ে কি রকম পারদর্শিতা দেখান। নাইডুর স্থলে মহম্মদ সৈয়দকে খেলতে নির্ব্বাচন কমিটি জানিয়েছেন। ইনি অমৃতসরে অষ্ট্রেলিয়ানদের বিরুদ্ধে ৮০ রান করেছিলেন।

মুস্তাক আলি, সি এস নাইডু, হোসেন্স ও সাহাবুদ্দিন আগামী খেলা থেকে বাদ গেলেন। আজ ১০ই তারিখ থেকে লাহোরে তৃতীয় ষ্টেট খেলা আরম্ভ হলো। তাতে নিম্নলিখিত খেলোয়াড়রা খেল্‌বেন;

ওয়াজির আলি (ক্যাপ্‌টেন), যুবরাজ পাতিয়ালা, নাজির আলি, এল অমরনাথ, নিসার, বাকাজিলানী, আমীর ইলাহী, এস ব্যানার্জ্জি, আর পি মেহেরমজী, জে এন ভায়া, মহম্মদ সৈয়দ। রিজার্ভ:—লাল সিং, মাসুদ সালাউদ্দীন, ডি আর পুরী ও রোসান লাল।

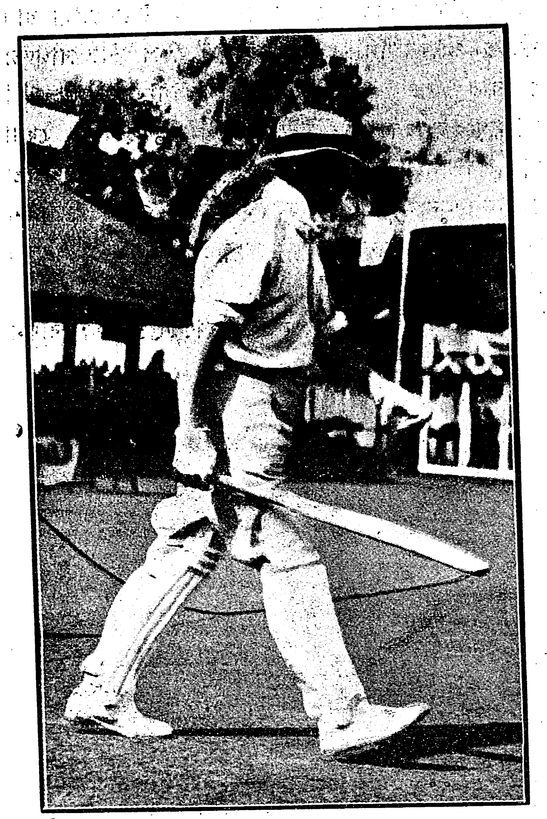

জে এস রাইডার ব্যাট করতে যাচ্ছেন
ছবি—ভক্তকুমার

ভারতবর্ষে এ পর্য্যন্ত খেলায় মধ্যভারত দলই কেবল অষ্ট্রেলিয়াকে হারাতে হারাতে সময়াভাবে খেলা 'ড্র' হয়েছে। মধ্যভারত প্রথম ইনিংসে ৩৮০ রান করে। জে ভায়া ক্রটীহীন ১০৬ রান করে রান-আউট হন। অষ্ট্রেলিয়ারা প্রথম ইনিংসে মাত্র ২২৩ রান করলে, তাঁদের ফলো-অন্ করতে হয়। দ্বিতীয় ইনিংসে ২৭২ রান হয়। মধ্যভারত দ্বিতীয় ইনিংসে ১ উইকেটে ৫৫ রান করলে সময় উত্তীর্ণ হওয়ায় খেলা 'ড্র' হয়।

এলাহাবাদে বৃষ্টির জন্য খেলা আরম্ভ হয় বেলা ১২॥০টায়। দু'দিনে উভয়পক্ষের এক এক ইনিংস সমাপ্ত হয়। ইউ পি —১৩৭ ও অষ্ট্রেলিয়া—৮৯। মহারাজকুমার ভিজিয়ানাগ্রাম সর্ব্বোচ্চ রান ৪০ করেছেন, তার মধ্যে ৬টা ছিল বাউণ্ডারী।

সমগ্র ভারত ঃ

প্রথম ইনিংস

ওয়াজির আলি···কট্ এলিস, বো ম্যাকার্টনে	২০
মুস্তাক আলি···ষ্ট্যাম্পড এলিস, বো ম্যাকার্টনে	১৩
অমরনাথ···কট্ রাইডার, বো ম্যাকার্টনে	০
সি কে নাইডু···কট্ ম্যাকার্টনে, বো অক্সেনহ্যাম	৫
মহম্মদ হোসেন···ষ্ট্যাম্পড এলিস, বো ম্যাকার্টনে	০
যুবরাজ পাতিয়ালা কট্ মেয়ার, বো ম্যাকার্টনে	১
সি এস নাইডু কট্ হেনড্রি, বো অক্সেনহ্যাম	০
বাকাজিলানী···কট্ রাইডার, বো অক্সেনহ্যাম	৩
এ আজিজ··· নট্-আউট	০
মহম্মদ নিসার···কট্ ও বো অক্সেনহ্যাম	০
সাহাবুদ্দিন···কট্ রাইডার, বো অক্সেনহ্যাম	০
অতিরিক্ত	৬
মোট	৪৭

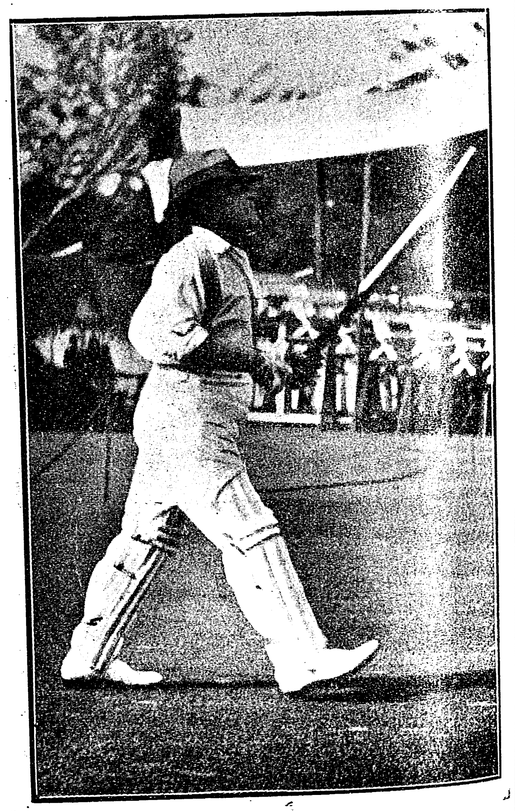

'গভর্ণর জেনারেল' ম্যাকার্টনে ব্যাট করতে নামছেন
ছবি—ভক্তকুমার

রাইডার তাঁর দলকে ফিল্ড করতে মাঠে নিয়ে যাচ্ছেন ছবি—ভক্তকুমার ঘোষ

উইকেট পতন ঃ—

৩০ রানে ১ম (ওয়াজির আলি), ৩৪ রানে ২য় (অমরনাথ), ৩৭ রানে ৩য় (মুস্তাক আলি), ৩৯ রানে ৪র্থ (সি কে নাইডু), ৩৯ রানে ৫ম (মহম্মদ হোসেন), ৪০ রানে ৬ষ্ঠ (সি এস নাইডু) ৪০ রানে ৭ম (যুবরাজ পাতিয়ালা), ৪৮ রানে ৮ম (বাকাজিলানী,), ৪৮ রানে ৯ম (নিসার) এবং ৪৮ রানে ১০ম (সাহাবুদ্দিন)

বোলিং ঃ—

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
লেদার	৫	০	২	০
ন্যাগেল	৬	৩	৭	০
ম্যাকার্টনে	১২	৫	১১	৫
অক্সেনহ্যাম	৭·৫	৩	৭	৫

অষ্ট্রেলিয়ান ঃ

দ্বিতীয় ইনিংস

ওয়েণ্ডেল বিল···বো নিসার	১৬
এফ ব্রায়ান্ট···কট্ আজিজ, বো নিসার	২৯
আর মরিসবী · কট্ সি এস নাইডু, বো নিসার	০
জে রাইডার···কট্ সি কে নাইডু, বো বাকাজিলানী	৭
এইচ্ হেনড্রি···বো নিসার	৪
সি জি ম্যাকার্টনে···কট্ সি এস নাইডু,বো বাকাজিলানী	১১
এফ ন্যাগেল··· রান-আউট	০
আর অক্সেনহ্যাম···বো নিসার	২
জে এলিস ·· নট-আউট	৯
এফ মেয়ার···এল্ বি ডবলিউ, বো বাকাজিলানী	৬
টি লেদার···বো নিসার	০
অতিরিক্ত	১৫
মোট	৯৯

উইকেট পতন ঃ—

২২ রানে ১ম (ওয়েণ্ডেল বিল), ২৮ রানে ২য় (মরিস্‌বী), ৬২ রানে ৩য় (রাইডার), ৬৮ রানে ৪র্থ (ব্রায়ান্ট), ৭৩ রানে ৫ম (হেনড্রি), ৮০ রানে ৬ষ্ঠ (ন্যাগেল), ৮৩ রানে ৭ম (ম্যাকার্টনে), ৮৭ রানে ৮ম (অক্সেনহ্যাম), ৯৪ রাত্রে ৯ম (এফ মেয়ার), ৯৯ রানে ১০ম (লেদার)।

বোলিং ঃ—

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
নিসার	১৭	৫	৩৫	৬
সাহাবুদ্দিন	৩	১	৪	০
সি কে নাইডু	৫	১	১০	০
বাকাজিলানী	১৬	৮	২৩	৩
সি এস নাইডু	৫	১	১২	০
অমরনাথ	২	২	০	০

সমগ্র ভারত ঃ

দ্বিতীয় ইনিংস

ওয়াজির আলি ··কট্ ওয়েণ্ডেল বিল, বো লেদার		২
আব্দুল আজিজ···এল্ বি ডব্লিউ, বো ম্যাকার্টনে		১২
সি কে নাইডু···এল বি ডব্লিউ, বো অক্সেনহাম		৫
মহম্মদ হোসেন···বো অক্সেনহাম		১০
যুবরাজ পাতিয়ালা···কট্ মেয়ার, বো ম্যাকার্টনে		৩২
সি এস নাইডু···বো ম্যাকার্টনে		৮
মুস্তাক আলি···এল্ বি ডব্লিউ, বো লেদার		৪
বাকাজিলানী··বো লেদার		০
এস সাহাবুদ্দিন···	নট-আউট	৪
অমরনাথ···বো লেদার		৩৯
এম নিসার···বো লেদার		০
	অতিরিক্ত	১১
	মোট	১২৭

উইকেট পতন ঃ—

৪ রানে ১ম (ওয়াজির আলি), ২৪ রানে ২য় (সি কে নাইডু), ২৪ রানে ৩য় (আব্দুল আজিজ), ৪৮ রানে ৪র্থ (মহম্মদ হোসেন), ৭৩ রানে ৫ম (সি এস নাইডু), ৯০ রানে ৬ষ্ঠ (যুবরাজ পাতিয়ালা), ৯৪ রানে ৭ম (মুস্তাক আলি), ৯৪ রানে ৮ম (বাকাজিলানী), ১২৭ রানে ৯ম (অমরনাথ), ১২৭ রানে ১০ম (মহম্মদ নিসার)।

বোলিং ঃ—

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
লেদার	১৩·২	৫	২৯	৫
ন্যাগেল	৮	২	১৫	০
ম্যাকার্টনে	১৭	৫	৪২	৩
অক্সেনহাম	১২	৩	৩০	২

অষ্ট্রেলিয়ান ঃ

দ্বিতীয় ইনিংস্

ওয়েণ্ডেল বিল···	নট্ আউট	৪৫
এফ ব্রায়াণ্ট...কট্ নিসার, বো সি এস নাইডু		১২
আর মরিসবী···কট্ আজিজ, বো নিসার		১
জে এস রাইডার···	নট্-আউট	১০
	অতিরিক্ত	১২
	(২ উইকেট) মোট	৮০

উইকেট পতন ঃ—

৪৬ রানে ১ম (ব্রায়াণ্ট), ৫৫ রানে ২য় (মরিসবী)।

উড্ল্যাণ্ডে ফ্রাঙ্ক টেরাণ্ট বাঙ্গলার লাট মহোদয়কে অষ্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচয় করে দিচ্ছেন, পাশে মহারাজা কুচবিহার দাঁড়িয়ে ছবি—ভক্তকুমার ঘোষ

বোলিং ঃ—

নিসার	৮·৩	১	২৫	১
বাকাজিলানী	৬	২	৯	০
সাহাবুদ্দিন	৩	১	৪	০
সি কে নাইডু	৬	১	১৮	০
সি এস নাইডু	৬	৪	১২	১

অষ্ট্রেলিয়ান বনাম বাঙ্গলা ও আসাম ঃ

তিনদিন ব্যাপী খেলায় অষ্ট্রেলিয়ানরা ৯ উইকেটে বাঙ্গলা ও আসামকে পরাজিত করেছে। বাঙ্গলা ও আসাম —প্রথম ইনিংস ১৩৬, দ্বিতীয় ইনিংস—১৮৪; অষ্ট্রেলিয়া— প্রথম ইনিংস—৩০৬, দ্বিতীয় ইনিংস—১৩ (১ উইকেট)।

বেলা ১১টার সময় খেলা আরম্ভ হয়ে ৩·২০ মিনিটের মধ্যে বাঙ্গলা ও আসামের প্রথম ইনিংস শেষ হলো মাত্র ১৩৬ রানে।

১৭ রানের মধ্যে বাঙ্গলার দু'জন ভাল ব্যাট পড়ে গেলো, ক্যাপ্টেন হোসী মাত্র ৯ রান করে গেলেন ২৮ রানের মাথায়। লংফিল্ড ৬, খাম্বাটা ৩, ভ্যাণ্ডারগাচ ১৯, গিলবার্ট ৩ রানে আউট হয়ে গেলেন যখন রান সংখ্যা মাত্র ৯৪। রানের শত সংখ্যা পূর্ণ হ'লো ১৬০ মিনিটে। সুশীল বোস বাউণ্ডারী করলে, এস ব্যানার্জ্জি আউট হবার পর থেকেই কমল ভট্টাচার্য্য ব্যাট করছেন। তিনি ও সুশীল বোসের খেলার জন্যই বাঙ্গলার রান সংখ্যা ১৫৬এ উঠেছিল। কমল ভট্টাচার্য্য ৪৮ রান করে অক্সেনহামের বলে এল্-বি হয়ে আউট হয়ে গেলেন। কমল খুব কৃতিত্বের সঙ্গে খেলে তার উইকেট রক্ষা করেছে যখন অন্যদিকের বড় বড় রথীদের উইকেট তাড়াতাড়ি পড়ে যাচ্ছিল।

৩·৫০ মিনিটে অষ্ট্রেলিয়ান পক্ষে ব্যাট করতে নামলে ওয়েণ্ডেল বিল ও ব্রায়াণ্ট। বেলা শেষে এক উইকেট খুইয়ে অষ্ট্রেলিয়াদের রান হলো সত্তোর।

দ্বিতীয় দিনে ম্যাকার্টনে ও মরিসবীর খেলা অতি চমৎকার হয়েছিল। ম্যাকার্টনের ষ্ট্রোকগুলি অতি উঁচুদরের, প্রত্যেকটি ষ্ট্রোকই ফিল্ডসম্যানের সতর্কতা এড়িয়ে চলে যাচ্ছিল। এক রকমেরই বল তিনি বিভিন্ন রকমে পেটাচ্ছিলেন। এ ধরণের খেলা কলিকাতায় একেবারেই নূতন। ২৮৫ মিনিট খেলার পরে ৩·৪৫ মিনিটে অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ হলো মোট ৩০৬ রানে। এস ব্যানার্জ্জি গোড়ার দিকে বোলিংএ সুবিধা করতে পারেননি, কিন্তু লাঞ্চের পর থেকে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়ে ৫জনকে আউট করেছেন।

১৭২ রান পশ্চাতে থেকে বাঙ্গলা ও আসাম দল দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করলে, এরাটুন ও কমল ভট্টাচার্য্যকে দিয়ে। কমল দু'টি চান্স দিয়ে ১২ রানে আউট হলো। শ'ও এল-বি হয়ে গেলো। হোসী এলো ও এরাটুনের সঙ্গে খেলে

জি এরাটুন ও এস ব্যানার্জ্জি বাঙ্গলা ও আসামের খেলায় প্রথম ব্যাট করতে নামছেন ছবি—ভক্তকুমার

সে দিনটা কাটালে। রান উঠলো মাত্র ৩৬, কিন্তু দু' উইকেট গেছে।

এরাটুন এবার প্রশংসনীয় খেলা খেলেছে। লংফিল্ড, গিলবার্ট ও এস ব্যানার্জ্জির খেলাও ভালো হয়েছে। এস

ব্যানার্জ্জি অক্সেনহ্যামের বলে ওভার বাউণ্ডারী করে ইনিংস পরাজয় কাটালে। বাঙ্গলা ও আসাম মোট রান ১৮৪ করে সকলে আউট হলেন বেলা ৩টার সময়।

৩-১৫এ অষ্ট্রেলিয়া ব্যাট করতে নামলে, কিন্তু আবশ্যকীয় ১৩ রান করতে তাদের একটা উইকেট খোয়া গেল। ওয়েণ্ডেল বিল ৮ করে ভ্যাণ্ডারগাচের হাতে ধরা পড়লেন তখন মোট রান ১১ হয়েছে। ২ রান করতে অনেকক্ষণ লাগলো। মরিসবী ও ব্রায়াণ্ট অত্যন্ত সাবধান হয়ে খেলছেন, যেন তাঁরা পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য রান তুলছেন। স্থানীয় বোলাররাই প্রভুত্ব করছে, উপর্য্যুপরি তিনটি ওভার মেডেন পাওয়াই তার সাক্ষ্য। শেষে দুই 'বাই' পেয়ে খেলা শেষ হলো বেলা ৩৷৷০টায়। অষ্ট্রেলিয়ানরা ৯ উইকেটে জয়ী হলো।

এ এল্ হোসী·· ষ্টাম্পড্ এলিস্, বো মেয়ার ৯
টি সি লংফিল্ড···কট্ মরিসবী, বো মেয়ার ৬
কে খাম্বাটা···এল্-বি ডবলিউ, বো মেয়ার ৩
পি ভ্যাণ্ডারগাচ···এল-বি, বো অক্সেনহ্যাম ১৯
এল্ গিলবার্ট·· বো মেয়ার ৩
সুশীল বোস্...কট্ লেদার, বো মেয়ার ২৫
এ স'···ষ্টাম্পড এলিস, বো ম্যাকার্টনে ০
জে এন ব্যানার্জ্জি··· নট-আউট ০
অতিরিক্ত ২১
মোট ১৩৬

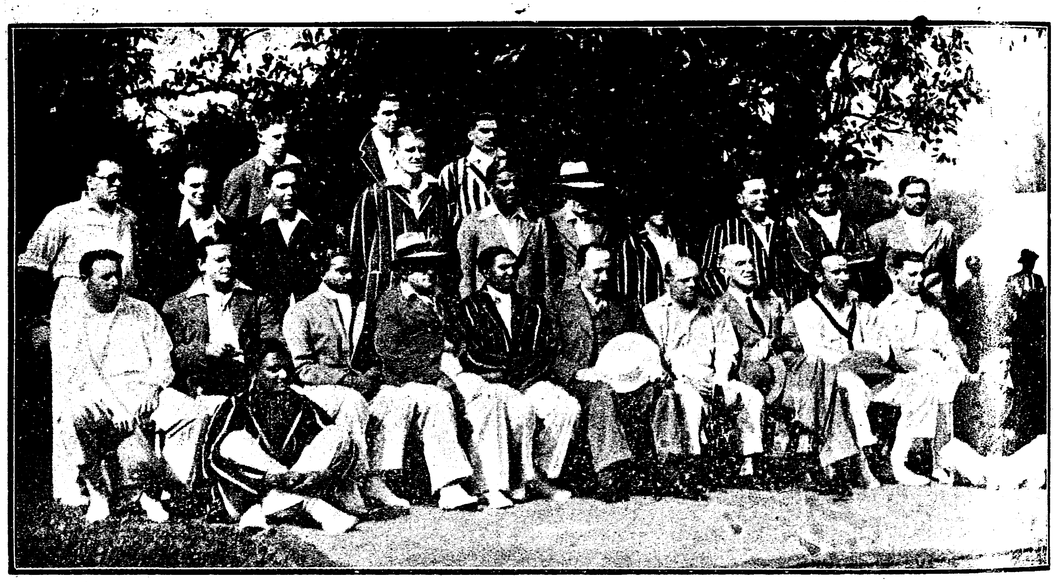

অষ্ট্রেলিয়া ও কুচবিহার মহারাজার খেলোয়াড়গণ। মধ্যস্থলে বাঙ্গলার লাট মহোদয় ছবি—ভক্তকুমার ঘোষ

বাঙ্গলা ও আসাম—প্রথম ইনিংস

এস ব্যানার্জ্জি ··কট্ অক্সেনহ্যাম, বো লেদার	০	
জি এরাটুন···কট্ এলিস, বো লেদার	২	
কে ভট্টাচার্য্য···এল-বি ডবলিউ, বো অক্সেনহ্যাম	৪৮	

বোলিং ঃ—

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
লেদার	১০	৩	১৭	২
আলেকজাণ্ডার	৯	২	১২	০
মেয়ার	১৯	৫	৪৪	৫
অক্সেনহ্যাম	১৯	১৩	২২	২
ম্যাকার্টনে	৭·১	৩	২০	১

উইকেট পতন ঃ—

০ রানে ১ম (এস্ ব্যানার্জ্জি), ১৭ রানে ২য় (এরাটুন), ২৮ রানে ৩য় (হোসী), ৪২ রানে ৪র্থ (লংফিল্ড), ৪৮ রানে ৫ম (খাম্বাটা), ৮৪ রানে ৬ষ্ঠ (ভ্যাণ্ডারগাচ্), ৯৪ রানে ৭ম (গিলবার্ট), ১২২ রানে ৮ম (কে ভট্টাচার্য্য), ১৩৬ রানে ৯ম (সুশীল বোস), ১৩৬ রানে ১০ম (স')।

এইচ্ আলেকজণ্ডার···বো এস্ ব্যানার্জ্জি ১
অতিরিক্ত ১১
মোট ৩০৮

উইকেট পতন ঃ—

৫৭ রানে ১ম (ওয়েণ্ডেল বিল), ১১৬ রানে ২য়, (ব্রায়াণ্ট) ১৬৭ রানে ৩য় (রাইডার), ১৭২ রানে ৪র্থ (হেনড্রি), ২৫২ রানে ৫ম (মরিসবী), ২৬৭ রানে ৬ষ্ঠ (অক্সেনহ্যাম), ২৯৮ রানে ৭ম (ম্যাকার্টনে), ৩০২ রানে ৮ম (মেয়ার), ৩০২ রানে ৯ম (লেদার), ৩০৮ রানে ১০ম (আলেকজাণ্ডার)।

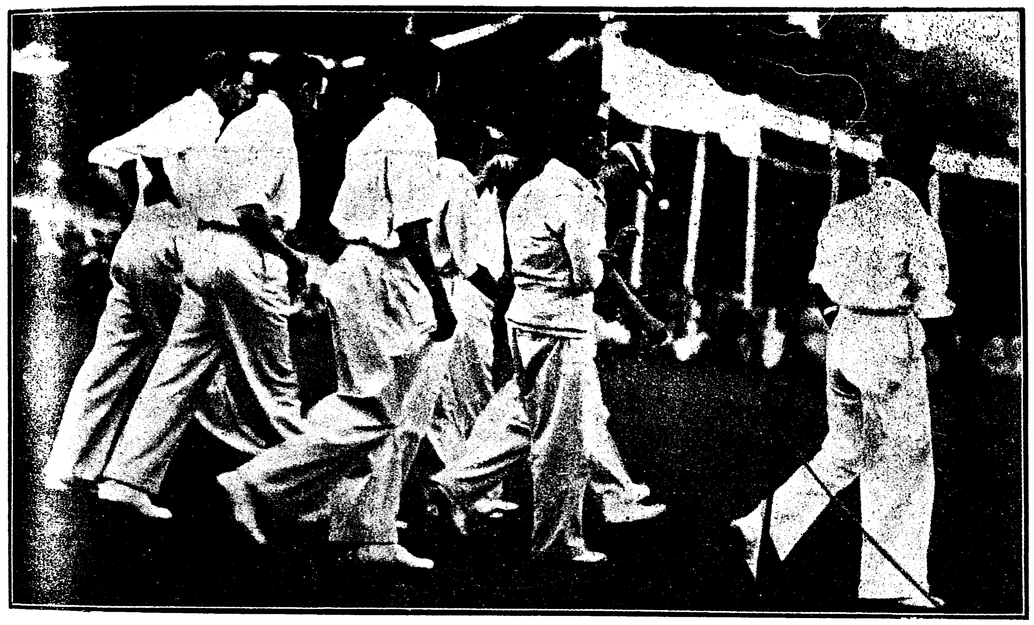

এ এল হোসী বাঙ্গলা ও আসামদলকে নিয়ে ফিল্ড করতে মাঠে যাচ্ছেন ছবি—ভক্তকুমার

অষ্ট্রেলিয়ান—প্রথম ইনিংস

ওয়েণ্ডেল বিল...কট্ হোসী, বো এল এইচ গিলবার্ট	৩৫	
এফ ব্রায়াণ্ট··· রান আউট	৫০	
আর ও মরিসবী···কট্ ও বো লংফিল্ড	৭৬	
জে এস্ রাইডার···বো খাম্বাটা	২৫	
এইচ এল হেনড্রি···বো গিলবার্ট	৪	
সি জি ম্যাকার্টনে···কট্ গিলবার্ট, বো ব্যানার্জ্জি	৮৫	
আর অক্সেনহ্যাম···বো এস ব্যানার্জ্জি	৫	
জে ই এলিস··· নট্-আউট	১৪	
এফ মেয়ার···বো এস্ ব্যানার্জ্জি	২	
টি লেদার...বো এস ব্যানার্জ্জি	০	
	৪১	

বোলিং ঃ—

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
টি সি লং ফিল্ড	২৬	৩	৮২	১
এস ব্যানার্জ্জি	১৮·৩	৩	৫৩	৫
এল এইচ গিলবার্ট	১২	১	৯৪	২
জে এন ব্যানার্জ্জি	৯	০	২৬	০
কে খাম্বাটা	৬	০	২২	১
কে ভট্টাচার্য্য	৪	০	১০	০
জি এরাটুন	৩	০	১০	০

বাঙ্গলা ও আসাম—দ্বিতীয় ইনিংস

কে ভট্টাচার্য্য···বো লেদার	১২
জি এরাটুন···বো লেদার	৫৬
এ এ 'শ'···এল্ বি ডব্লিউ, বো অক্সেনহ্যাম	১
এ এল হোসী · কট্ এলিস, বো লেদার	৪
টি সি লংফিল্ড···কট্ এলিস, বো লেদার	৩৩
সুশীল বোস···বো মেয়ার	০
পি আই ভ্যাণ্ডারগাচ্···বো অক্সেনহ্যাম	১২
এস ব্যানার্জ্জি···বো অক্সেনহ্যাম	১৯

১১৬ রানে ৫ম (সুশীল বোস), ১১৬ রানে ৬ষ্ঠ (লংফিল্ড), ১৩৬ রানে ৭ম (ভ্যাণ্ডারগাচ্), ১৬৮ রানে ৮ম (গিলবার্ট), ১৮৪ রানে ৯ম (এস্ ব্যানার্জ্জি), ১৮৪ রানে ১০ম (জে এন ব্যানার্জ্জি)।

বোলিং :—

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
লেদার	১৮	২	৩১	৪
আলেকজাণ্ডার	৭	০	১৬	০
অক্সেনহ্যাম	২৭·২	১২	৪০	৪
মেয়ার	২২	৩	৭৯	২

অষ্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়গণ ছবি—কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়

এল্ এইচ্ গিলবার্ট···কট্ মরিসবী, বো মেয়ার		২৫
কে খাম্বাটা···	নট্-আউট	৪
জে এন ব্যানার্জ্জি···বো অক্সেনহ্যাম		০
	অতিরিক্ত	১৮
	মোট	১৮৪

উইকেট পতন :—

২০ রানে ১ম (কে ভট্টাচার্য্য), ২৫ রানে ২য় (শ'), ৩৮ রানে ৩য় (হোসী), ১১৩ রানে ৪র্থ (এরাটুন),

অষ্ট্রেলিয়ান—দ্বিতীয় ইনিংস

ওয়েণ্ডেল বিল···কট্ ভ্যাণ্ডারগাচ, বো জে এন ব্যানার্জ্জি···		৮
এফ ব্রায়াণ্ট···	নট্-আউট	৩
আর মরিসবী	নট্-আউট	০
	অতিরিক্ত	২
	মোট (১ উইকেট)	১৩

বোলিং :—

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
কে ভট্টাচার্য্য	৪	২	৫	০
জে এন ব্যানার্জ্জি	৩·১	১	৬	১

প্রীতি-সম্মিলন ঃ

অষ্ট্রেলিয়ান দল কলিকাতায় এসে প্রথম ম্যাচ খেলেন উড্ল্যাণ্ডসে কুচবিহার মহারাজার একাদশের সঙ্গে। পিচ খারাপ থাকায় ম্যাটিং পেতে খেলা হয়। অষ্ট্রেলিয়ানরা ৬ উইকেটে (ডিক্লেয়ার্ড) মোট ২১১ রান করেন। 'গভর্ণর জেনারেল' ম্যাকার্টনে ক্যাপ্টেন হয়েছিলেন। ম্যাক্ এসেই দত্তের বল দু'বার লেগ বাউণ্ডারীতে পাঠিয়ে, পরে পালিয়াকে সোজা পরদার পারে চালিয়ে প্রবীণ যাদুকরের যাদুবিদ্যার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়ে দর্শকদের আনন্দিত করলেন। খেলা আরম্ভের ৪০ মিনিটের মধ্যে ৭০ রানে চারটি উইকেট পড়ে যায়। তখন ম্যাকার্টনে মরিসবীর সঙ্গে এসে যোগ দিয়ে রান সংখ্যা তুললেন ১৭৫এর কোটায়। নিজের ৬১ রান হ'লে কুচবিহার মহারাজার বলে জগদ্দলের হাতে আটকে গেলেন।

মহারাজার দল ব্যাট করে দুই উইকেটে ১০১ রান হ'লে বেলা শেষ হওয়ায় খেলা ড্র হয়। এস ব্যানার্জ্জি ১৪, পালিয়া (নট্-আউট্) ৫৭ ও মহারাজা কুচবিহার (নট্-আউট্) ১৮ রান করেন।

কে ভট্টাচার্য্য (এরিয়ান)

অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতের খেলা দু'দিনে শেষ হওয়ায় ভিজিয়ানাগ্রাম ও টেরাণ্ট একাদশের দু'দিনের প্রীতি-সম্মিলনের আয়োজন হয়। খেলা ড্র হয়েছে।

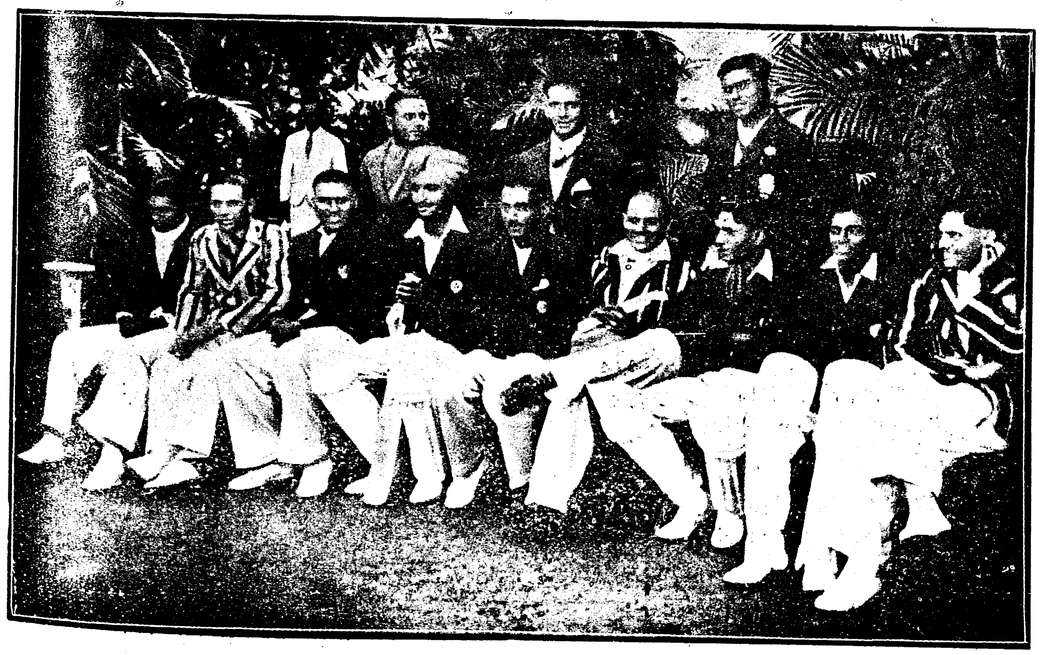

তৃতীয় টেষ্টের ভারতীয় খেলোয়াড়গণ ছবি—কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়

ভিজিয়ানাগ্রাম প্রথমে ব্যাট করে ২৩৫ রান করেন, টেরাণ্টের দল ২১৮ করে।

দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করে ভিজিয়ানাগ্রাম ৫০ মিনিট খেলে ৪ উইকেটে মাত্র ৬৩ করলে খেলা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

ভিজিয়ানাগ্রাম দল—প্রথম ইনিংস—আব্দুল আজিজ ১৪, এস ব্যানার্জ্জি ৪৯, পালিয়া ৩৬, সি কে নাইডু ৩৯, হোসী ২, লাল সিং ৩, লংফিল্ড ৩২, সি এস নাইডু ৩৬, সুশীল বোস ২, বাকাজিলানী ১৩, সাহাবুদ্দিন ০।

দ্বিতীয় ইনিংস—সি কে নাইডু ১১, আজিজ ০, এস বোস ১৩, লাল সিং (নট-আউট) ৩০, সাহাবুদ্দিন ০, এস ব্যানার্জ্জি (নট-আউট) ৮।

টেরাণ্ট দল—ওয়েগুল বিল ৯১, ব্রায়াণ্ট ১৬, মরিসবী ১৯, গোপাল দাস ১০, হেনড্রি ১৪, ওয়ার্ণ ২, লাভ ০, টেরাণ্ট (নট-আউট) ৩৭, আমির ইলাহী ৭, ডেভিস ০, আলেকজাণ্ডার ১০।

তৃতীয় বেসরকারী টেষ্ট ঃ

লাহোরে তৃতীয় টেষ্টের প্রথম দিনের খেলায় সমগ্র ভারত প্রথম ইনিংসে মোট ১৪৯ রান করেছে। ক্যাপ্টেন ওয়াজির আলি প্রশংসনীয় ব্যাট করে ৭৬ রান করেছেন, মেহেরমজী ২৬, যুবরাজ পাতিয়ালা ১৪ রান করেছেন। নাজির আলি ও অমরনাথ খেলছেন না, সালাউদ্দীন ও ডি আর পুরী খেলছেন।

অষ্ট্রেলিয়ারা ৩ উইকেট খুইয়ে মোট ৭১ রান করেছেন। রাইডার ও ব্রায়াণ্ট নট-আউট আছেন।

অষ্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ঃ

অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার **প্রথম টেষ্ট** খেলায় অষ্ট্রেলিয়া ৯ উইকেটে জয়ী হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকা—২৪৮ ও ২৮২ (নোর্স ৯১),

অষ্ট্রেলিয়া—৪২৯ (ম্যা ক্ ক্যা ব্ ১৪৯, চিপারফিল্ড ১০৯) ও ১০২ (এক উইকেট)

দ্বিতীয় টেষ্ট খেলা বৃষ্টির জন্য বন্ধ হওয়ায় 'ড্র' হয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকা—১৫৭ ও ৪৯১ (নোর্স ২৩১)

অষ্ট্রেলিয়া—২৫০ ও ২৭৪ (দুই উইকেট) (ম্যাক্ক্যাব্ ১৮৯)

তৃতীয় টেষ্ট খেলায় অষ্ট্রেলিয়া এক ইনিংস ও ৭৮ রানে জয়ী হয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকা—১০২ ও ১৮২।

অষ্ট্রেলিয়া—৩৬২ (ব্রাউন ১২১, ফিন্‌গেলটন ১১২)।

বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নসিপ্ ঃ

পুরুষদের সিঙ্গল ফাইনাল—

ডি এ হজেস্ ৬-৪, ৮-১০, ১১-৯, ৬-৩ গেমে ডব্লিউ মিচেলমোরকে এ বৎসরও পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।

মেয়েদের সিঙ্গল ফাইনাল—

মিস্ ওল্‌গা ওয়েব ৬-২, ৬-৩ গেমে মিসেস্ বোলাণ্ডকে পরাজিত করে বিজয়িনী হয়েছেন।

গত দশ বৎসরের মধ্যে এবার নিয়ে মিসেস্ বোলাণ্ড (মিস্ জেনি স্যাণ্ডিসন) টেনিস খেলায় মাত্র ৩বার পরাজিত হলেন।

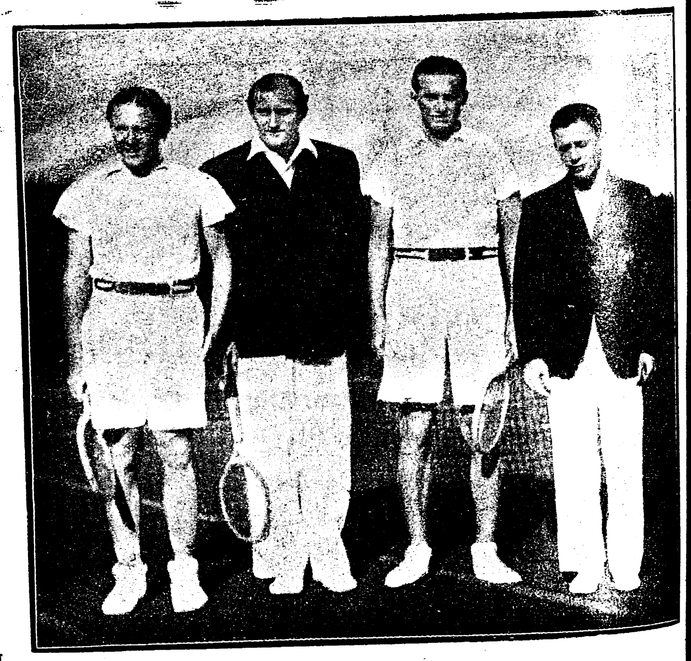

পুরুষদের ডবল ফাইনালের খেলোয়াড়গণ।
বরোস্কি, মেঞ্জেল, মেটাক্সা ও হেক্‌ট ছবি—ভক্তকুমার

প্রথম ও দ্বিতীয়বার ইটালিয়ান খেলোয়াড় সিনর ভ্যালেরিওর নিকট কলিকাতায় ও এলাহাবাদে এবং এই তৃতীয়বার মিস্ ওল্‌গা ওয়েবের নিকট। মিস্ ওয়েব ব্যাকহ্যাণ্ড ড্রাইভে মিসেস্ বোলাণ্ডকে কাবু করেন। মিস্ ওয়েব আর জি ম্যাক্‌ইন্‌সের বাগ্‌দত্তা, শীঘ্রই পরিণীতা হবেন।

পুরুষদের ডবল ফাইনাল—

ডি এ হজেস্ ও আর জি ম্যাক্‌ইন্‌স্ ৬-৪, ৯-৭, ৬-৪ গেমে ব্রুক এডওয়ার্ডস্ ও মিচেলমোরকে হারিয়েছেন। গত বৎসর বিজিতদের কাছে বিজয়ীরা হেরেছিলেন।

মিক্সড ডবল ফাইনাল—

ডি এ হজেস ও মিস্ হারভে জনষ্টন ৬-৪, ৬-২ গেমে আর জি ম্যাক্‌ইন্‌স্ ও মিস্ ওল্‌গা ওয়েবকে পরাজিত করেছেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়নসিপ্ টেনিস ঃ

সাউথ ক্লাবের ক্যালকাটা চ্যাম্পিয়নসিপের নাম বদলে এবার থেকে নাম হ'লো ইষ্ট ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়নসিপ্। এই প্রতিযোগিতার ফলাফল নিম্নরূপ হয়েছে—

পুরুষদের সিঙ্গল ফাইনাল—

এল্ হেক্‌ট ৩-৬, ২-৬, ৬-৩, ৬-১, ৭-৫ গেমে রড্‌রিক্ মেঞ্জলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।

মেয়েদের সিঙ্গল ফাইনাল—

মিসেস বোলাণ্ড ৬-১, ৩-৬, ৬-২ গেমে মিস্ ওল্‌গা ওয়েবকে পরাজিত করে বিজয়িনী হয়েছেন।

মিসেস বোলাণ্ড বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নসিপের খেলায় মিস্ ওল্‌গা ওয়েবের নিকট এবার পরাজিত হয়েছিলেন।

মেয়েদের ডবল ফাইনাল—

মিস্ ও ওয়েব এবং মিসেস্ গ্রাহাম ৬-৩, ৩-৬, ৬-৪ গেমে মিসেস বোলাণ্ড ও মিসেস্ ম্যাক্‌কেনাবেকারকে হারিয়ে জয়ী হয়েছেন।

মিক্সড ডবল ফাইনালের খেলোয়াড়গণ ; বিজয়ী—কৃষ্ণস্বামী ও মিসেস্ বোলাণ্ড ; বিজিত—মিস্ ওয়েব ও ম্যাক্‌ইনস ছবি—ভক্তকুমার

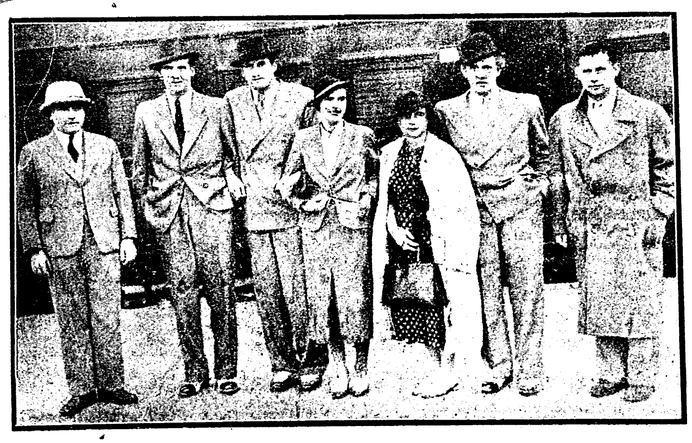

সাউথ ক্লাবের সেণ্ট্রাল ইউরোপীয়ান খেলোয়াড়গণ
ছবি—কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়

পুরুষদের ডবল ফাইনাল—

আর মেঞ্জেল ও এল হেক্ট্ ৮-৬, ৪-৬, ৬-৪, ৬-৮, ৬-৪ গেমে জি ভন্ মেটাক্সা ও কাউণ্ট বরোস্কিকে পরাজিত করে বিজয়ী হয়েছেন।

ভেটারন্স্ সিঙ্গল ফাইনাল—

এন এস আয়ার ৮-৬, ৬-৩ গেমে এস্ ডবলিউ বব্‌কে হারিয়েছেন।

ক্রীড়ারত জি ভন্ মেটাক্সা

ছবি—ভক্তকুমার

মিক্সড ডবল ফাইনাল—

কৃষ্ণস্বামী ও মিসেস বোলাণ্ড ৬-৪, ৭-৫ গেমে ম্যাক্‌ইন্‌স্ ও মিস ওল্‌গা ওয়েবকে হারিয়েছেন।

আন্তর্জ্জাতিক প্রতিযোগিতা—

আগন্তুক ও ভারতের মধ্যে ৬টি আন্তর্জ্জাতিক খেলা হয়। তার ৩টি সিঙ্গল খেলাতে বিদেশীরা জয়ী হন। আর ১টি সিঙ্গল ও ২টি ডবল খেলায় ভারতবর্ষ জয়ী হওয়ায় সম্মান সমান হয়েছে।

জি ভন্ মেটাক্সা (অষ্ট্রিয়া) ৬-৪, ৬-১ গেমে জে কে কাউলকে (ভারত) পরাজিত করেছেন।

ডি এন্ কাপুর (ভারত) ৪-৬, ৬-৪, ৬-৩ গেমে কাউণ্ট বরোস্কিকে (অষ্ট্রিয়া) হারিয়েছেন।

ক্রীড়ারত আর মেঞ্জেল

ছবি—ভক্তকুমার

আর মেঞ্জেল (চেকোশ্লেভ) ১০-৮, ৬-৩ গেমে মদন-মোহন (ভারত) পরাজিত করেছেন।

এল হেক্ট (চেকোশ্লেভ) ৬-২, ৬-৩ গেমে শোহন লালকে (ভারত) হারিয়েছেন।

ক্রীড়ারত এল্ হেক্ট (ইষ্ট ইণ্ডিয়ান চ্যাম্পিয়ন)

ছবি—ভক্তকুমার

এইচ ডি সোনি ও ডবলিউ মিচেলমোর ১-৬, ৬-২, ৬-৩ গেমে জি ভন্ মেটাক্সা ও কাউণ্ট বরোস্কিকে পরাজিত করেছেন।

এন্ কৃষ্ণস্বামী ও এস এল আর সোহানে ৬-২, ৩-৬, ৬-২ গেমে আর মেঞ্জেল ও এল হেক্টকে হারিয়েছেন।

সাত মাইল দৌড় প্রতিযোগিতায় বিজয়ীত্রয়ী। আগরপাড়া থেকে শ্যামবাজার পর্য্যন্ত দৌড় হয়। ১ম, ফণী চন্দ্র (১২) ; ২য়, কে কে নন্দী ; ৩য়, এস বোস

ছবি—তারক দাস

বাংলার প্রাচীন শব্দ-সম্ভার

শ্রীকালীপদ চক্রবর্ত্তী বি, এ

জাতির মধ্যে রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা সম্ভব হইলেও ভাষার মধ্যে ঐরূপ বিশুদ্ধতা রক্ষা করা নিতান্ত কঠিন। কোনও ভাষাতত্ত্ব নির্ণয় করিতে হইলে কোন্ ভাষার ভিতর আদি ভাষা কতখানি প্রবেশ করিয়াছে তাহাই নির্ণয় করিতে হয়। আধুনিককালে আমরা দেখিতে পাই, ইংরাজগণ ভারতে আসিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত আমাদিগকে অনেক পাশ্চাত্য শব্দ দিয়াছে, আবার ইংরাজ প্রবল পরাক্রান্ত জাতি হইয়াও সে যে কেবল দিতেছে, কিছুই গ্রহণ করিতেছে না এরূপ মনে করাও ভুল। আমাদের Bazar, Bunglow, Ghee, Loot, Badmas, Golmal এবং Gunda ইংরাজী ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে। মুসলমানদের সময়ও এইরূপ আদান প্রদান সমানভাবে চলিয়াছিল।

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতে নানা জাতির আগমন হইয়াছে এবং প্রত্যেক জাতিই ভাষার উপর কিছু না কিছু চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। আর্য্যগণ একদিন ভারতে বিদেশীয়ের মতই ছিলেন। অনার্য্যদিগকে আর্য্যেরা ঘৃণার চক্ষে দেখিলেও তাহারা যে অনেকাংশে আর্য্য সভ্যতার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই সুদূর অতীতে যে কত অনার্য্য শব্দ বেদ ও ব্রাহ্মণগুলির মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। অনার্য্য শব্দগুলিকে সংস্কৃত-ভাষী আর্য্যগণ বহুদিন যাবৎ ঘৃণার চক্ষে দেখিলেও অনেক শব্দ বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। যেরূপ ইংরাজেরা তাহাদের নিজের উচ্চারণের অনুরূপ করিয়া আমাদের অনেক শব্দ গ্রহণ করিয়াছে সেইরূপ অনেক অনার্য্য শব্দ সংস্কৃতে পরিবর্ত্তিত করিয়া আর্য্যগণ ব্যবহার করিতেন। অনেকগুলি সংস্কৃত

শব্দের প্রাকৃত আকার পুনর্ব্বার সংস্কৃত হইয়া এক নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। অধ্যাপক বিজয়চন্দ্র মজুমদার দেখাইয়াছেন, "দর্ভ" শব্দ প্রাকৃত "দুব্ব" বা "দুব্বো" হইয়াছিল, তাহা হইতে "দূর্ব্বা" নূতন সংস্কৃত শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। এরূপ স্থলে অবশ্য দূর্ব্বা বেদে বা প্রাচীন সংস্কৃতে ব্যবহৃত হয় নাই তাহা প্রমাণ করা আবশ্যক। ছান্দসের অনেক শব্দ দেশী শব্দরূপে ব্যবহৃত হইতেছে ইহাও উক্ত অধ্যাপক মহাশয় দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন, "কামার" শব্দটি ছান্দস্ "কর্ম্মার" শব্দের অপভ্রংশ, সংস্কৃত পণ্ডিতগণ পরবর্ত্তীযুগে ইহাকে দেশী শব্দ মনে করিয়া কুম্ভকার ইত্যাদি শব্দের অনুকরণে "কর্ম্মকার" শব্দটি গঠন করিয়াছেন। এইরূপ ছান্দস্ শব্দগুলি যে অনার্য্যগণের নিকট হইতে গৃহীত হয় নাই তাহা কে বলিতে পারে? প্রকৃতও ঘটিয়াছে তাহাই। বিজয়বাবু দেখাইয়াছেন আমাদের দেশী শব্দ "আঁকশী", আশা (দিক) ভেবড়ে, বাঁশ—(ছুতোরের অস্ত্র), 'কে বট হে' শব্দগুলি যথাক্রমে ছান্দস্ অঙ্কুশী, আশা, ভর্ভরা (ভাবের গণ্ডগোল), বাঁশী, বট (সত্য) ইত্যাদির সমতুল্য। ক্রমে সংস্কৃতের মধ্যে উক্ত প্রাকৃত রূপগুলির সংস্কৃত সংস্করণ প্রবেশ লাভ করিয়াছে। অবশ্য এমনও হইতে পারে যে ছান্দস্ যে সময়ে কথিত ভাষা ছিল তখন অনার্য্যগণ ঐ শব্দগুলি গ্রহণ করিয়াছিল। তবে ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, আর্য্যগণই অনার্য্যদের কাছ হইতে ঐ শব্দ সকল গ্রহণ করিয়াছেন। ভাষাতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও দেখাইয়াছেন আর্য্যগণের অনেক দেবতার নাম অনার্য্যদিগের ভাষা হইতে গৃহীত। তিনি ও অন্যান্য অনেক ভাষাতত্ত্ববিদ্ অনুমান করেন, অনার্য্যদিগের এক রক্তবর্ণ দেবতা আর্য্যগণ কর্ত্তৃক "রুদ্র" নামে অভিহিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী "শিব" ও "শম্ভু" নাম দুইটিও দ্রাবিড় ভাষার "সিবন্" (লাল) সেম্বু (তাম্র) শব্দ হইতে গৃহীত। দ্রাবিড়গণের এক দেবতা ছিল বানর, ইহাকে আর্য্যেরা "বৃষা কপি" বলিতেন; ইহার পরবর্ত্তী নাম হনুমান ও অনার্য্য শব্দ অন্+মান্দি (পুং বানর) শব্দদ্বয় হইতে গৃহীত বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। বিষ্ণু নামটিও নাকি অনার্য্যদের—দ্রাবিড় ভাষার বিন্ অর্থে আকাশ, বিষ্ণু কিনা আকাশের দেবতা।

দেবতাদের নাম ভিন্ন আরও অনেক অনার্য্য শব্দ বেদে ও পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণগুলিতে দেখা যায়। ঋগ্‌বেদের অম্বু, অরণি, কটুকা, কপি, কলা (অংশ), কাল, কিতব, কূট (কুটীর), কুনারু (ক্ষীনবাহু), কুণ্ড, গণ, নানা, নীল, নীহার, পুষ্কর (পদ্ম), পুষ্প, পূজন, ফল, চিল, বীজ, ময়ূর, রাত্রি, রূপ, সায়ং, বল্গু (সুন্দর) এবং ব্রাহ্মণের মধ্যে—অটবী, অলর্ক, আড়ম্বর, কম্বল, কুলাল, খড়্গ, তণ্ডুল, তিল, মর্কট, বলক্ষ, বল্লী, ব্রীহি, শব ইত্যাদি শব্দ অনার্য্যদের নিকট হইতে আর্য্যগণ গ্রহণ করিয়াছেন।

এত গেল বৈদিক শব্দের কথা। কথিত ভাষায় মিশ্রণ-কার্য্য যে কতদূর চলিয়াছিল, তাহার লিখিত প্রমাণ না পাইলেও সহজেই ধরা পড়ে। ভারতে আসিয়া অনার্য্যদের কাছ হইতে আর্য্যদের ঝাঁটা, কুলা, টোকা, বটি, খড়, দড়ি সবই লইতে হইয়াছিল; অনেক ফল-মূলেরও নাম তাহাদের কাছে শিখিতে হইয়াছিল। উচ্চ শ্রেণীর আর্য্যেরা ঐ শব্দগুলিকে অনুস্বার বিসর্গের ফোঁটা দিয়া শুদ্ধ করিয়া লইতে ছাড়েন নাই। কিন্তু এই শব্দগুলি দেশী নামে অতি প্রাচীনকাল হইতেই অভিহিত হইয়া আসিতেছে। তৎভব ও দেশী শব্দের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় অনেক সময় দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। কোনও একটি শব্দ সংস্কৃতের অপভ্রংশ, না তাহাই মার্জ্জিত হইয়া সংস্কৃতের আকার ধারণ করিয়াছে—তাহা বিচার করিতে হইলে বেদ ও সংস্কৃত প্রাচীন-সাহিত্যে বিশেষ অধিকার থাকা প্রয়োজন। মনে করুন "ঘাম" শব্দটির মূল নির্ণয় করিতে হইবে; আমার দৃষ্টিতে মনে হয়, ইহার মূল নির্ণয় করা অতি সহজ,—সংস্কৃত "ঘর্ম্ম" হইতে প্রাকৃত "ঘম্ম", তাহা হইতে ঘাম হইয়াছে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। "ঘর্ম্ম" হইতে "ঘম্ম" হয় নাই, বরং উল্টা "ঘম্ম" হইতে "ঘর্ম্ম" হইয়াছে। ধর্ম্ম ও কর্ম্ম হইতে ধম্ম ও কম্ম হইয়াছে দেখিয়া উহাদের সাদৃশ্য বশতঃ ঘর্ম্ম শব্দটি ঘম্ম হইতে সংস্কৃত করা হইয়াছে। "ঘম্ম" ঘর্ম্মের পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছিল। অধ্যাপক বিজয়বাবু বলেন—গ্রীষ্ম—গিমহ্—ঘম্ম; তাহা হইলেও দেখা যায় "ঘাম" শব্দটির মূল গ্রীষ্ম, ঘর্ম্ম নহে। কাজেই প্রাকৃত রূপ হইতে সংস্কৃত রূপটি গঠিত কিনা এ সন্দেহ অনেক সময়ই উঠিতে পারে। এ সন্দেহ দূর করিবার উপায় একমাত্র শব্দটির ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া রাখা।

সাহিত্য-সংবাদ

নব প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত উপন্যাস "মধুচক্র"—১৲
শ্রীহেমমালা বসু প্রণীত উপন্যাস "ব্রতচারিণী"—২৲
শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ প্রণীত ছেলেদের বই "সমুদ্রের রহস্য"—৷৶০
হিমালয়, হৃষীকেশের স্বামী অমলানন্দ গিরি প্রণীত ধর্ম্মপুস্তক "জীবন জ্যোতিঃ"—১৲
শ্রীঅখিল নিয়োগী প্রণীত গল্পপুস্তক "ফুল ফোটে, ফুল ঝরে"—১৲
মন্মথ রায় এম, এ প্রণীত মেয়েদের অভিনয়ের জন্য নাটক "কাজল রেখা"—।৹
শ্রীরাধানাথ কাবাসী সঙ্কলিত ধর্ম্মপুস্তক "শ্রীশ্রীভক্তিরত্নহার"—৷৹
শ্রীমতী শান্তি ঘোষাল প্রণীত উপন্যাস "নীচের সমাজ"—১৷৹

শ্রীনির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত সামাজিক নাটক "মুখচোরা"—১৲
শ্রীবিভূতিশেখর মজুমদার প্রণীত মহিলাদিগের কথা "জীবনী সংগ্রহ, দ্বিতীয় ভাগ"—১৷৹
প্রভাময়ী মিত্র প্রণীত নাটক "দেউল"—১৲
লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আই, এম, এস (অবসর প্রাপ্ত) প্রণীত "মহাভারতের রহস্য" প্রথম ভাগ—১৷
শ্রীমনুজচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী প্রণীত "পুরুষ ও নারী"—৶০
অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার প্রণীত "পরাজিত জার্ম্মাণী"—৬৲
শ্রীরাজলক্ষ্মী দেব্যা প্রণীত "কেদার বদ্‌রী ভ্রমণ কাহিনী"—৸০
শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত উপন্যাস "কো-এডুকেশন"—১৷০

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs Gurudas Chatterjea & Sons, at the Bharatvarsha Printing Works, 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta

বাড়ীর পথে

শিল্পী—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সিংহ

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

COLOURED ILLUSTRATION